প্রথম লেখা

প্রথম খণ্ড

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত →

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলিকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ

আশ্বিন ঃ ১৩৭০

প্রকাশক ঃ

প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট ঃ

গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক ঃ

সি. বি. এইচ. প্রসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২

ফটো ঃ

প্রদীপ দাস

মুদ্রাকর ঃ

রামচন্দ্র দাস
কলকাতা-১৪

ছোট গল্পের অনুরাগী সমস্ত পাঠক-পাঠিকাদের

করকমলে—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৯০৩ সালে নোয়াখালি 'শহরে' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম। নীহারিকা দেবী ছদ্মনাম নিয়ে অচিন্ত্যকুমার মূলতঃ সাহিত্য তীর্থে প্রবেশ করিলেন। ১৩২৮ সালে প্রবাসী পত্রিকায় তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। এরপর স্বনামে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

একটা চমৎকার গল্পের প্লট পাওয়া গেছে। দিশেহারা হয়ে গল্পের নায়ক-নায়িকার নাম খুঁজছি, কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে একটা আনকোরা একেবারে নূতন কবিত্বময় নাম কিছুতেই আসচে না।

রাত এখন বারোটা প্রায় হয়ে এল, কেবল ভাবচি, মনোমত নাম, কিছুতেই মিলচে না, এ যেন তীর্থ-কাকের মতন ধর্ণা দিয়ে প'ড়ে থাকা।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল আমার খোলা জানালার সুমুখে কে একটা কালো বলিষ্ঠ লোক অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে পুরুষ কণ্ঠে বললে,—আমাকে তোমার গল্পের নায়ক করো!

আমি আঁৎকে উঠলাম—তোমাকে নায়ক করব? কি তোমার নাম?

লোকটা দৃঢ় কণ্ঠে বলল—বামাচরণ।

—বামাচরণ? আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম।

লোকটা কঠিনভাবে জানলার শিকটা ধ'রে বললে—কেন? আমার নাম তোমার পছন্দ হচ্ছে না? তোমার উপন্যাসের নায়ক হবার যোগ্যতা কি আমার একটুও নেই? চিরকালই তুমি আমাকে কেবল চাকর দরোয়ান, বাজার-সরকার আর দেওয়ান করবে? কেন, আমাকে নায়ক করলে তোমার উপন্যাসের কাটৃতি কি অনেক ক'মে যায়?

আমি লোকটার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলুম।

লোকটা বললে—আমার জন্যে কেবল রেখেছ হুঁকো তার গাঁজা। কেন, আমি কি ভালোবাসতে পারি না? আমার প্রেমের উপাখ্যান কি তোমার গল্পের খাতায় লেখা যায় না, না, আমার প্রেমটা এতই খেলো আর বাজে, যে তার মূল্য একটুও নেই? আমি বি. এ. এম. এ. পাশ করি না, প্যাসনে চশমা পরি না, সিগারেট খাই না, টেড়ী কাটি না, বাঁশী বাজাই না, মার্কেটে ঘুরি না—তাই কি আমি নায়ক হবার যোগ্য নই? আমার নাম বামাচরণ। এই কি আমার চরম অপরাধ?

আমি হাসি চেপে বললুম—কিন্তু তোমার সঙ্গে নায়িকা হবে কে?

লোকটা হাতছানি দিয়ে কাকে যেন ডাকতে লাগল। খানিকবাদে একটি অদ্ভুত স্থূলতনু কালো রমণী তার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথার চুলগুলি টেনে ক'ষে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা, কপাল ও চুলগুলি দুর্গন্ধ তেলে চপ্‌চপ্ করচে, নাকে সুদর্শন-চক্রের মতো একটা নথ, দু-কানে প্রায় গোটা কুড়ি মাকড়ি, দাঁতে অমাবস্যা-রাতের মতন মিশি মাখানো, গলায় একটা লোহার হাঁসুলি, পরনে একটা লাল পাছা-পেড়ে শাড়ী তাতে চ্যাপমা হলুদের দাগ লাগানো, দু-পায়ে দুটো রুপোর মল—বয়স এই ত্রিশ বত্রিশ হবে।

রমণী স্থির কণ্ঠে বললে—আমি তোমার গল্পের নায়িকা হব।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললুম—তোমার নাম কি?

মেয়েটি বললে—আমার নাম? আমার নাম…। হাসতে হাসতে পেটে খিল পড়ল। জগদম্বা। তাহলেই হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ।

রমণী বিরক্ত হয়ে বললে—আমার এই চেহারায় ও নামে কিছুতেই তোমার উপন্যাসের নায়িকা হতে পারব না? লেখা, পাপড়ি, যুথিকা, হাস্নাহানা—এমনি ঢং করা বিবিয়ানার নামই তোমার পছন্দ হয়, এমন ঠাকুর-দেবতারা নাম মনে ধরে না? আমি আনারসী-বেনারসী শাড়ি পড়ি না, এলানো চুলে ফাঁসগেরো দিয়ে কান ঢেকে চুল বাঁধি না, উচু হীল-ওয়ালা জুতো প'রে দুলতে-দুলতে চ.ল না ও আছাড় খাই না, পুডিং কাটলেট্ রাঁধতে পারি না, তাই কি আমি তোমার নায়িকা হবার অযোগ্য? আমার এ কালো বুকে তোমার গল্পের সুন্দরী শিক্ষিতা নারীর মতনই প্রেম জাগে না, কবিতা উথলে ওঠে না?

আমার হাসির মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

দেখি বামাচরণ আর জগদম্বা খোলা জানালাটা পেরিয়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল। কি করবে রে বাব্বা! ঐ শক্ত কালো দু-হাতে দু-গালে দু-চাঁটি বসিয়ে দেবে না তো? না না ওগো, তোমাদেরই আমি গল্পের নায়ক-নায়িকা করব।…

আমার ঘরের দেওয়ালের এক নিরালা কোণে রাধা-কৃষ্ণের যামিনী-মিলনের একটি বর্ণ-বহুল সুন্দর ছবি ছিল। কিন্তু তার ওপর আমার কোনো মোহ বা আকর্ষণ ছিল না, হয়ত আমার আধুনিক রুচির সঙ্গে এই ছবিটা একটুও খাপ খেত না ব'লে। দেখি, বামাচরণ আর জগদম্বা বেশী কিছু নামসুলভ উপদ্রব না ক'রে ধীরে ধীরে সেই ছবিটার মধ্যে লীন হয়ে গেল।·

যাঃ!, কি এতক্ষণ বাজে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছিলাম! মনে-মনে খানিকক্ষণ হাসলুম। গল্পলেখা আর এগোলই না। আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

মাঝরাতে মনে হ'ল সেই ছবির কৃষ্ণ সেই কদমশয়ন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাধাকে বললে—চল, এই কারাগার থেকে মুক্তি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। এই তরুণ কবি দিনান্তেও আমাদের মুখের পানে চোখ তুলে চায় না, আমরা যে গোপনে এখানে ভালবাসার অভিনয় করচি তার একটুও মর্ম গ্রহণ করতে পারে না, তার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার নাম খুঁজে মরে, আর, আমরা যে তার বুকের আগারে বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্চি, এত নিকটে থাকি, আমাদের কথা সে একটুও ভাবে না, অতি পুরানো ব'লে সে আমাদের অবহেলা করে ফেলে দ্যায়। চল, আমরা এই ভণ্ড পূজারীর মন্দির থেকে বেরিয়ে যাই।··

ব'লে কৃষ্ণ তার বাঁশী তুলে নিলে, আর রাধিকা তার অগোছাল কেশ-বাস বিন্যস্ত ক'রে কৃষ্ণের পাশে পাশে চলতে লাগল পথে-পথে চাঁদনী আলোর স্নিগ্ধ রূপার দেশে।

কৃষ্ণ ঘাড় হেলিয়ে বাঁশী বাজাচ্চে আকুল করা সুরে, আর রাধিকা তার বাঁ হাতের ভঙ্গিমাটিকে বেঁকিয়ে কৃষ্ণের গ্রীবাটি বেষ্টন ক'রে চলেচে ভাষাহীন আনন্দছন্দে।

কতদূর এগিয়ে গেলে মনে হ'ল—ওরা যেন সেই গোকুলের কৃষ্ণ-রাধা নয় আমাদেরই পাড়ার পচা বস্তির বামাচরণ আর জগদম্বা, অনন্ত অভিসারের পথে নূতন রূপ নিয়ে সত্যিকারের প্রণয়ী-প্রণয়িণী, চিরযুগের কবির কল্পনার নায়ক-নায়িকার যুগল মূর্তি

অন্নদাশঙ্কর রায়

নিজের গল্প প্রসঙ্গে / অন্নদাশঙ্কর রায়

ইংল্যাণ্ড থেকে ১৯২৯ সালে ফিরে আসার আগে আমি লণ্ডনের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত একটা গ্রাম অঞ্চলে বেড়াতে যাই।

সময়টা ইংল্যাণ্ডের মধুরতম সময়। বসন্তকাল। মাসটা May বোধ হয়। এটা আসলে একটা ভ্রমণ কাহিনী। এবং সত্য ঘটনা মূলক। গল্পের অনুরোধে কিছু অদল-বদল করতে হয়েছে। কিন্তু আমার নিজের মতে এটা গল্প হিসেবে আমার মনের মত হয়নি। সেইজন্য আমার প্রথম দু'টি গল্প সংগ্রহ থেকে বাদ দিয়েছিলাম। তৃতীয় সংগ্রহ 'যৌবন জ্বালা'য় এটাকে স্থান দিই।

এটাকে আমার প্রথম গল্প হিসেবে ধরে নিতে পারা যায়। প্রথমে এটি বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের কোন এক সংখ্যায়।

সেদিনও এমনি একলাটি বসেছিলুম, পড়ার বইখানি কোলের উপর পড়েছিল, কিন্তু
াব উপব চোখ পড়ছিল না। ভাবছিলুম আব একজনের কথা, আজ যেমন ভাবছি।
নে হচ্ছে, মিলনের পূর্বাহ্ণ আব অপরাহ্ণ দুইই সমান ব্যাকুলতায় ছলছল।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। সকালবেলা তার চিঠিও পাইনি, ফোনও শুনিনি।
কালের আলো দুপুরে ঝিমিয়ে পড়েছে। কে জানে কার ফোন! গা তুললুম না।
সেস ফিশার বুড়ীকে তার কসাই কিংবা মুদি স্মরণ করছিল ভেবেছিলুম। কিন্তু বুড়ী
ডকে বললে, "মিষ্টার চৌধুরী, তোমার সেই বন্ধুনী।"

"সেই বন্ধুনীটি"র জন্যে মিষ্টার চৌধুরীর কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। কেন
য তিনি এ হতভাগ্যকে মাঝে মাঝে আপ্যায়ন করেন তিনিই জানেন। কম্প্র
াদে নম্র নেত্রপাতে ফোনের রিসিভার কানে তুলে নিলুম। কানটাকে ঝাঁঝিয়ে নিয়ে
ক যে কথা বলে গেল, বুঝলুম। অর্থাৎ কে তা বুঝলুম, কী তা বুঝলুম না। বাঁচা
গল যে, "সেই বন্ধুনী" নন। ইনি ফিস্ ফিস করে কথা বলেন না। ইনি কথা দিয়ে
যন কান মলে দেন।

যাকে দেখবার জন্যে এত ব্যগ্র ছিলুম, সে যে কী বললে, তা শোনবার ধৈর্য ছিল না।
প্রতি প্রশ্নের উত্তরে একটা করে "হুঁা" দিয়ে গেলুম। বললুম, "হুঁা, আজ বিকেলে
তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব।" গেলুম যখন তখন তার পরনে ছিল
টনিসের পোশাক। আর হাতে একখানা "ফ্রানসিস্ টমসন্"। সাড়ে চারটের
ময় অমুক জায়গায় দেখা করবার কথা। অমুক জায়গায় পায়চারি করতে লাগলুম।
স আর আসেই না। আশে-পাশের রাস্তাগুলোয় খানিকটে করে গিয়ে দেখতে
লাগলুম, যদি তাকে দূর থেকে দেখতে পাই। মনে মনে বকুনির ভাষায় শান দিতে
থাকলুম।

আধ মাইল দূর থেকে অবশেষে দেখা গেল কে একজন শুক্লভূষণা আসছেন। এত
জোরে জোরে পা ফেলছেন, যেন ধান ভানছেন, আর এত দূরে দূরে, যেন প্রতি বারেই
লঙ্কা ডিঙোচ্ছেন। খানিকটে কাছে যখন এলেন তখন দেখি হাতে একটা বেতের ব্যাগ
রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে ছিনিয়ে নিলুম। বললুম, "কত দেরি করেছ, জানো?"

সে একটা কৈফিয়ৎ দিলে। দু'জনে মিলে ট্রেনের অভিমুখে ছুটলুম। পথে যেতে
যেতে বললে, "তোমার সঙ্গে কিছুই আনোনি কেন?"

আমি বললুম, "এর বেশী কী আনতুম?"

সে বললে, "তোমাকে বোধ হয় অন্য একটা বাড়িতে রাত কাটাতে হবে। এক
বাড়িতে দুটো ঘর পাওয়া যাবে না।"

আমি বললুম, "ব্যাপার কী! রাত্রে ফিরে আসব মিসেস ফিশারকে বলে এসেছি যে।"

"এ কেমন কথা ? তখন না বললে আমার সঙ্গে সোমবার অবধি উইকেণ্ডে আসছ ?"

"ঠিক শুনতে পাইনি বোধ হয়। ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করব।"

"এখন—"

"এখন এই বেশেই যেতে রাজি আছি। কেবল একটা ফোন করে বুড়ীকে বলে দিতে হবে আজ রাত্রে ফিরব না।"

"সঙ্গে কিছুই যে নাওনি। অন্তত একটা টুথব্রাশও তো দরকার।"

"তোমার টুথ পেস্টের খানিকটা দিয়ো।"

"এক বাড়ীতে থাকলে তো। তার চেয়ে বরং রাস্তায় কিনে নিয়ো একটা।"

রাতের পোশাকের নাম মুখে আনলুম না। বললুম, "একখানা ক্ষুর কিন্তু ভয়ানক দরকার কাল সকালে। বাড়ির কেউ ধার দেবে না ? কিংবা কাছে কোথাও নাপিত পাব না ?"

"পাগল! চাষার বাড়ি যাচ্ছ খেয়াল নেই। আর গ্রাম কিংবা শহর সেখানে কোথায়! ফার্ম হাউস।"

আমি বললুম, "তবে দেখা যাক কী হয়।" এই বলে "ফ্রানসিস টমসন্" খুলে বসলুম। এতক্ষণে আমরা ট্রেনে উঠে বসেছি। বললুম, "বেশ মজা, না ? কতকটা ইলোপমেন্টের মতো লাগছে।"

সে বললে, "দূর।"

ওয়াটারলু স্টেশনে মিসেস ফিশারকে ফোন করতে করতে ট্রেন ছেড়ে দিল। আগামী ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করবার ফাঁকে সে বললে, "টাকাও তো আনোনি। নাও এই যা দিচ্ছি। কী কিনতে চাও কিনে ফেল।"

একখানা রাইটিং প্যাড কিনলুম। "ফ্রানসিস টমসনের" সাথী। ট্রেনের খালি কামরা দেখে উঠলুম। কখন একটি যুবক উঠে পড়েছে। অতএব মামুলি কথাবার্তা। যুবকটি নেমে গেলে দুটি প্রৌঢ়া আরোহণ করলেন। তারা নামতে নামতেই জনকয়েক গ্রাম্য ভদ্রলোক। অবশেষে আমরাই চেঞ্জের জন্যে নামলুম।

সে বললে, "এবার কিছু ফ্রানসিস টমসন্ পড়ে শোনাও।"

আমাদের ট্রেন এসে পড়ল। বই ও ব্যাগ নিয়ে আমরা যে কামরাটায় উঠলু সেটাতে কে একজন বার্ণার্ড শ'র মতো টেরি ও দাড়িওয়ালা প্রবীণ বসেছিলেন। অন্য লোক ভিড় করে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, "ওই দেখ বক্স্ হিল্। পাহাড় চক খড়ির। যেখানে সেখানে ঘাস উঠে গেছে। চক দেখতে পাচ্ছ না ?"

"পাচ্ছি"।

"ওই শোনো একটা কুকু ডাকছে। শুনতে পাচ্ছ ?"

"না।"

"থেমে গেছে।"

ডরকিং এ নেমে আমরা বাস ধরলুম। তার পাস'টা ততক্ষণে আমার হয়েছিল।
টন হ্যাচের টিকিট। তখন সাতটা বেজে গেছে, কিন্তু রোদ যেন দুপুর বেলার রোদ।
থিহিলের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবার পথ ঘন বনের মধ্যে। তার চোখ কান ঘ্রাণ
উদগ্র আগ্রহে গাছ পাখি ফুলের সঙ্গে তন্ময় হয়ে গেল। "উড পিজনের ডাক শুনেছ?
তামাদের ভারতবর্ষের কুকু বুঝি অমন ডাকে?"

"না, ভারতবর্ষের কুকু ডাকে কুউউ। একটানা মেলডি। তোমাদের কুকু বলে
কু-উ। দুটো নোট। আর তোমাদের উড পিজন ডাকে কতকটা আমাদের ঘুঘুর
তো।"

"দেখ দেখ, ব্লু বেল ফুল দিয়ে ছাওয়া জমিটুকু যেন একখানি গালিচা।"

"জলের ঝর ঝর শুনছ?"

"তা আর শুনছিনে?"

"বনের শেষে যেখানে পৌঁছলুম সেটার নাম ফ্রাই-ডে স্পট, কিন্তু শহর নেই,
গ্রামও নেই। জলার ধারে একটা সরাই, নাম স্টীফান ল্যাঙ্‌টন। দেখা গেল সরাইতে
সে গ্রামের লোক মান করছে। কাছাকাছি এক জায়গায় বসে আমার কিছু শুকনো
প্রুন (prunes) খেলুম, আর কিছু কিসমিস। গোটাকয়েক ওয়াটার ফাউল ডানা ঝাপটে
জল সরগরম রেখেছিল। তবু যে দু'একটা মাছ সাহস করে মাথা তুলছিল না তা নয়।
অবশিষ্ট প্রুনটা তাকে দিয়ে বললুম, "জানো তো, শেষের রুটিখানা বা ফলটা যে খায়
দ বছরে হাজার পাউণ্ড বা সুন্দর স্বামী যেটা হোক একটা পায়।" সে মিষ্টি হাসল।

জিনিসপত্তর হাতে ধরে ও ঝুলিয়ে আমরা উঠলুম। অনেক চড়াই উৎরাইয়ের
রে আমাদের ফার্ম হাউসে পৌঁছানো। পথে একদল গ্রাম্য ছেলেমেয়ে টেনিস বল
দয়ে ক্রিকেট খেলছিল। ফার্মহাউসে যখন পৌঁছই তখন সূর্য ডোবে। কিন্তু গোধূলির
আভায় দিগঙ্গনার মুখ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে যেন আমার সঙ্গিনীর মুখ।

॥ ২ ॥

দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল। মহিলাটির চলনে বলনে
চাহনিতে কেমন এক দুঃখের স্থিরতা। যেন বুকের উপর পাষাণ চেপে রয়েছে।
আমার সঙ্গিনী বললে, "আমার বান্ধবী মিস লায়নের আজ এখানে আসার কথা ছিল।
তার অসুখ। তাঁর বদলে আমি এসেছি। আমার এই বন্ধুটিকে একখানি ঘর দিতে
পারেন কি?"

মহিলাটি ভেবে বললেন, "বোধ হয় পারব।"

মহিলাটি ঘর তৈরি করতে চলে গেলে পর আমি পা ছড়িয়ে দিয়ে আরাম করে
বসলুম। বললুম, "ঘর পাওয়া গেছে ভালোই, নইলে পাহাড়ে ওঠা নামা করে আর
কোথাও ঘরের খোঁজে বেরোনো আমার সামর্থ্যে কুলোত না। হাঁ, যেতুম বটে বাড়ি
খুঁজতে যদি একখানা ট্যাক্সি করে আমাকে পাহাড় থেকে নামাতে। কিংবা একখানা

এরোপ্লেন করে।"

"দুঃখের বিষয় দশ মাইল না হাঁটলে কোনোখানাই পাওয়া যায় না।"

"অগত্যা তোমাকেই গোলাঘরে পাঠিয়ে তোমার ঘর আমি দখল করতুম।"

এবার আমরা হাত মুখ ধুতে গেলুম। মহিলাটি আমাদের জন্যে ডিম রুটির বেশ আর কিছু যোগাড করতে পারলেন না। সে ডিম খায় না বলে মুশকিলেই পডত য না কৌটাবদ্ধ সারডিন বাডিতে থাকত। সে বলল, "তোমার জন্যে কোকো কর বলেছি।"

আমি বললুম, "খালি দুধই সব চেয়ে পছন্দ।"

"তোমাকে না মিসেস নরউড্ রোজ রাত্রে কোকো খাইয়ে ঘুম পাডাত?"

"ও বদ অভ্যাসটা মিসেস ফিশার ছাডিয়েছে। এবার খালি দুধ ধরেছি।"

"সেই ভালো। ফার্ম হাউসে খাঁটি দুধ পাবে, আর তাজা।"

সত্যই দুধটা ছিল সুন্দর। সে কিন্তু দুধ খায় না।

সাপারের শেষে খানিকটা বাইরে বেডানো গেল। অাঁধার হয়ে আসছে দে সে বলল, "তবে উপরেই যাওয়া যাক আমার ঘরে।"

তার ঘর থেকে পশ্চিম আকাশের তখনো কিছু আভা দেখা যাচ্ছিল। যত দূর চো যায় গাছপালা। ফার্ম হাউসের মাঠে একটা ঘোডা চরতে চরতে স্থির হয়ে দাঁডিয়ে রই ঘুমের ঘোরে। কুকু তখনো ডাকছিল।

সে বললে, "দুটো কুকু।"

আমি বললুম, "একটা।"

ব্ল্যাকবার্ডের কণ্ঠে শ্রান্তির সুর। বাতাস বয়ে আনছিল গর্স (Gorse) এর সুগন্ধ ঘোড়াটা বসল। তার পরে গডাগডি দিতে দিতে মডার মতো শুলো। আমরা এ উপলক্ষে কিছু পশুতত্ত্ব আলোচনা করলুম। একটা ব্যাঙ ডাকছিল কতক দূরে। এক ঝিঁ ঝিঁ পোকা কিছু কাছে।

অন্ধকার যখন সবাইকে ঘুম পাডালো তখন সে বললে, "এবার তোমার ঘুমোব সময় হয়েছে।"

আমি ঠিক করে ফেললুম আর মায়া বাডাব না। এই পর্যন্ত আমরা আমরা। এ পর থেকে সে সে, আমি আমি। বোধকরি একটু ক্ষিপ্র গতিতে তার ঘর থে নিষ্ক্রান্ত হলুম। তাকে কোনো কিছুর অবকাশ না দিয়েই বললুম, "গুড-নাইট।"

সে প্রায় ছুটে এলো, আমার মাথাটিকে দু'হাতে ধরে, দুই গালে দুটি চুমু খেলো আমি কৃতজ্ঞতার ভারে তার বাহুতে ভেঙ্গে পডলুম। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে বললু "আজ সারা সকাল দুপুর কী ভেবেছি জানো?"

"কী ভেবেছো?"

"ভেবেছি, আজ যদি তাকে না দেখি তো বাঁচব না। দুটি দিন দেখিনি। ম হচ্ছিল দুটি বছর।" সে চুপ করে রইল। বললুম, "কোনো প্রার্থনা নিষ্ফল হয় ন এক মনে ডাকলেই সাডা মেলে।"

বিদায় নিতেই হলো। তবু মনটা ভরে রইল। গাছ পাখি ফুল থেকে তার

প্রাণ ফিরিয়ে এনে সে আমার গালে ধরে দিল। আমার ঘরে যখন গেলুম তখন খোলা জানালা দিয়ে গর্সে'র সুবাস এসে আমার বিছানায় মিলিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লুম। তন্দ্রার শেষের দিকে বোধ হচ্ছিল কত কাছাকাছি আমরা এসেছি। মাঝখানকার দেয়ালটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিলে আমরা একই ঘরে পাশাপাশি শয্যায়।

সকালে উঠে প্রথম ভাবনা, দাঁত মাজি কেমন করে? মুখ ধোবার জায়গায় যে সাবানখানা ছিল তাই দিয়ে কাজ চালানো গেল। চুল আঁচড়াই কেমন করে? মোমবাতির সঙ্গে যে দেশলাইটা ছিল তার গোটা পাঁচেক কাঠি মিলিয়ে চিরুনির মতো করলুম। কিন্তু দাড়ি কামানোর উপায় কিছুতেই খুঁজে পাইনে। সসংকোচে নিচে নামলুম। পোড়ো জমিটাতে দু'তিন ডজন মুরগীর ছানা কিলবিল করে চরে বেড়াচ্ছিল। যিনি যত সদ্য ডিম থেকে বেরিয়েছেন তাঁরই ব্যগ্রতা তত বেশি। ঘোড়াটা অনেকক্ষণ উঠেছে। পাখিরা এতক্ষণে অর্ধেক কাজ বা অকাজ করে রেখেছে। ন'টা বাদে। তারা উঠেছে চারটের আগে। গোধূলির সঙ্গে।

সে নিচে নেমেই বললে, "তোমাকে একটা নতুন পাখির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। Yellow Hammer."

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন ঘুমুলে?"

"একেবারেই ঘুমুতে পারিনি। নতুন জায়গা বলেই বোধ হয় কেমন কেমন লাগল। এ বাড়িতে একটা খোকা আছে দেখছ?"

"না। পুরুষ মানুষ এক আমি ছাড়া আর কেউ আছে বলে তো মনে হয়নি।" কালকের সেই মহিলাটি আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেলেন। পাফ্ড্ রাইস যা ছিল তা একজনের মতো। বললুম, "তুমি যখন ডিম খাবে না এবং বেকন যখন দু'জনেই খাব তখন ওটা তোমারই ভাগে পড়ে। তা ছাড়া অমন নরম মুড়ি ভারতবর্ষের লোকের মুখে রোচে না। আমাদের মুড়ি মুড মুড করে।"

সে আমাকে চা ঢেলে দিলে। আমি তাকে রুটি কেটে দিলুম। জোর করে একটু খানি বেকন দিতে গেলুম। উল্টে আমারই পাতে ফেলে দিলে। বললুম, "বেকন আমার ভালো লাগে না।"

"ওঃ, জানতুম না। আরেক পেয়ালা চা?"

"নাঃ। তুমিই নাও।" সে আরো দু' পেয়ালা ক্রমান্বয়ে নিলে।

বললুম, "একটা কমলালেবু খাবে? চমৎকার কমলালেবু এগুলি।"

"না। ফল আমি আলাদা খেতে ভালোবাসি। রাত দশটায়।"

অগত্যা আমিই খেলুম একলা।

ব্রেকফাস্টের পরে তার ঘরে যাওয়া গেল ব্যাগ নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে। আচমকা আমার মাথাটা টেনে নিয়ে ব্যাগ থেকে একটা চিরুনি বার করে আঁচড়াতে সুরু করে দিলে। "দেখি দেখি কেমন সুন্দর দেখায় তোমাকে ক্রীম না মাখলে। কেন ক্রীম মাখো?"

বললুম, "ক্রীম না মাখলে চুল ওড়ে। তোমার চুলের মতো শক্ত চুল নয় তো

আমার। সিংহের কেশর তো নয়।" তার চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। "আচ্ছা, আরেকটু লম্বা চুল রাখো না কেন?"

"বব্ করতে বলছ?"

"জানিনে বব্ করা কাকে বলে। আমি ভেবেছিলুম এই বব্।"

"না। এ হলো শিংল্। ঘাড়ের দিকে আরেকটু লম্বা হলে বব্।"

ভেবে বললুম, "এই ভালো। শিংল্ ছাড়া আর কিছুতে তোমাকে মানাবে না। অর্থাৎ আর কিছুতে তোমার ক্যারেকটার ব্যক্ত হবে না।"

"তা নয়। আমার চুলগুলো কোনো মতেই বাগ মানবে না। লোহার শিকের মতো সোজা ও খাড়া থাকবে, সেই জন্যেই বাধ্য হয়ে এমন করা।"

গোয়ালঘর দেখতে গেলুম। গোটা পাঁচেক পুষ্টকায় গোরু। একটা নাদুস নুদুস শুয়োর। একটা ছেলে যন্ত্র চালিয়ে টারনিপ কুচি কুচি করছিল। অনেকগুলো বেড়া টপকিয়ে মাঠ পেরিয়ে ঝরা পাতা মাড়িয়ে আমরা বনের ভিতর দিয়ে চলেছি। শহর থেকে উইকেণ্ড কাটাতে এসে কারা সব মাঠের কোণে Caravan এ বাস করছে। গাড়ির ভিতরেই তাদের শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্না ঘর, কিন্তু দিন ভালো থাকলে তারা বাইরে টেবল পেতে খায়, খেলা করে। আমি বললুম, "ক্যারাভানেই যদি থাকতে হয় তবে জিপসাদের মতো সমস্ত ইংলণ্ড ঘুরে বেড়ানো উচিত। যেমন সেদিন সিনক্লিয়ার লুইস বেরিয়েছিলেন।"

সে বললে, "এরাও ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু এক বছরে সবটা নয়। প্রতি বছর একটা করে জায়গা। আগামী বছর এদের ক্যারাভান আর এখানে থাকবে না।"

আমরা বনের ভিতর এক জায়গায় বসে পড়লুম। বসতে বসতে অর্ধশয়ান, পাইন গাছের তলায়। তার মানে ছায়া যার সামান্যই। রোদ যার ভিতর দিয়ে পড়ে, এমন গাছের তলায়। ঘাসের উপর নয়। পাইনের ছুঁচের উপর বসতে তার ভালো লাগে। বললে, "ফ্রানসিস টমসন্ পড়ে শোনাও।"

বললুম, "তোমার গলায় স্বর মিষ্টি, তুমিই পড়ো। আমি বেছে দিই। হাউণ্ড অফ হেভ্‌ন।"

বললে, "বিষম বড়। ছোট নেই?"

বললুম, "আচ্ছা, ডেজী।"

সে পড়ে চলল। যখন শেষ করল তখন আমি বললুম, "কয়েকটা লাইন ভারী সুন্দর। না? ঐ যেখানে বলছেন, 'The rose's scent is bitterness to him that loved the rose, আর 'we are born in others' pain and perish in our own.

"কাছেই ফ্রানসিস টমসন্ বাস করতেন। Meynell রা তাঁকে যত্নে রেখেছিলেন। বেচারার প্রথম জীবন কিন্তু বড় কষ্টে কেটেছিল। লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাতেন। রাত্রে নদীর বাঁধের উপর পড়ে ঘুমোতেন। কিন্তু সব অবস্থাতেই কবিতা লিখতেন।"

"তবু ভাগ্য ভালো বেঁচে থাকতেই যশ পেলেন, এখন তো যশ বাড়তে লেগেছে।

যেখানে যাও সেখানে তাঁর সুখ্যাতি।"

"বড় আন্‌প্র্যাকটিকল মানুষ ছিলেন। ভোলা মন। কখন কী পড়তেন কী করতেন—একেবারে ছেলেমানুষ।"

"ওটা কবিপ্রকৃতি। ব্যতিক্রম ঘটেছিল কেবল শেক্‌স্‌পীয়র বা ভিকটর হুগোর মতো মহাকবিদের বেলা। ওঁদের ব্যবসায় বুদ্ধিটা ছিল কবিপ্রকৃতির মতোই জোরালো।"

"এবার দেখ ক'টা বেজেছে। উঠতে হবে।"

সাড়ে এগারটা, ওঠা গেল। চলতে চলতে চলতে কত কথা। একটা টাওয়ার। সেকালে যারা মাশুল এড়িয়ে জাহাজের জিনিস বাজারে চালান দিত তাদেরই গড়া কিংবা তাদের ধরবার জন্যে গড়া। গোটাকয়েক কমলালেবু কিনতে পেয়ে কিনলুম। মাটিতে বসে বহু দূরস্থিত সমুদ্রের দিকে তাকালুম। সে বললে, "সমুদ্র ত্রিশ মাইল দূরে।"

আমি বললুম, "অত না।"

প্রথম লেবুটা প্রায় পচা। সে বললে, "আর একটা খাও।" তাকে আর একটা খেতে বলায় সে কিছুতেই খেলো না। তখন সেটাকে বিতরণ করার জন্যে তুলে রাখলুম।

সে বললে, "কবি ট্রিভেলিয়ানের নাম জানো নিশ্চয়, সেই যিনি গ্রীসের বিষয়ে লেখেন। তাঁর বংশের সবাই ডিপ্লোমাট বা পলিটিসিয়ান. তিনি কিন্তু দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, কেবল কবি নয়. গ্রীসের কবি, বিয়ে করেছেন এক ডাচ চিত্রকরকে। সুখী দম্পতী। এই পাহাড়ের তলায় তাঁদের বাড়ি।"

রবিবার। লণ্ডন থেকে বহু লোক বেড়াতে এসেছে। গাছতলায় বসে একদল স্ত্রী পুরুষ বনভোজন করছে। দূরবীণ চোখে দিয়ে কেউ কেউ সমুদ্র দেখছে। কেবল যে মেয়েটি চকোলেট ও কমলালেবু বিক্রি করছিল তার ছুটি নেই। বনের খানিকটা কাটা গেছে জার্মান যুদ্ধের বন্দীদের দিয়ে। যুদ্ধের সময় নরওয়ে থেকে কাঠ আসা বন্ধ ছিল তাতে মনের সৌন্দর্য হ্রাস। সে করুণ নয়নে চেয়ে রইল। যেন বনের ব্যথা তারও ব্যথা। যারা সব বনভোজন করে রাবিশ ছড়িয়ে গেছে দেখে তার যা রাগ। কেন ওরা নিজেদের রাবিশ নিজেরা বাড়ি নিয়ে যায় না? ওদের গ্রেপ্তার করা উচিত।

আমরা পথ হারিয়েছিলুম. বাঁকা পথে ঘুরে ফিরে এক জায়গায় দেখি কতগুলি ছেলেমেয়ে গাছে চড়ছে ও গাছের তলায় খেলা করছে। আমার হাতের সেই কমলালেবটাকে বিতরণ করার সময় এলো। তিনটি খুকীর সামনে গিয়ে বললুম, "কাকে এই কমলালেবুটা দিই বল তো?" একটি খুকী একটুও দ্বিধা না করে বলল, "আমাকে।" তাকেই দিলুম, সঙ্গিনী তাকে অনুরোধ করলে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে। মজা এই যে খুকীর দাঁত বলতে গুটি চার পাঁচ। তবু তার দাবি বলতে গোটা কমলালেবুটা।

খুকীদের কাছ থেকে পথের যোগাড় করে আবার সেই ক্যারাভানওয়ালাদের মাঠ বেয়ে বাসায় ফেরা গেল। দুটো ঘোড়াকে দুটি খুকী কী যেন খাওয়াচ্ছিল, ঘোড়া দুটি অখণ্ড মনোযোগ সহকারে খাচ্ছিল।

আমরা ফিরতেই গৃহকর্ত্রী ডিনারে দিয়ে গেলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা আরম্ভ করতে পারলুম না।

॥ ৩ ॥

রোস্ট বীফ, ভাজা আলু, সিদ্ধ শাক, 'ডিম কাস্টার্ড', 'গুজবেরী', রুবার্ব। সে খুব আস্তে আস্তে খায়। বকবক করবার অবসর আমারই বেশী।

আমি বললুম, "রেবেকা ওয়েস্ট এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ছেলেরা বড বেশী ব্যক্তি-বিশেষ হয়ে উঠেছে মেয়েরাও না হয়ে পারে না। ভাইয়ের পক্ষে এক নিয়ম ও বোনের পক্ষে আরেক নিয়ম খাটে না। এইজন্যে খাটে না যে ওরা একই মালমশলা দিয়ে তৈরী। বোনের মধ্যেও খানিকটা পুরুষ আছে, ভাইয়ের মধ্যে খানিকটা নারী।"

সে হেসে বললে, "তাই বোধ হয় কেউ কেউ বলে থাকে রেডমণ্ড যদি পুরুষ না হয়ে মেয়ে হতো আর রোজালিণ্ড হতো মেয়ে না হয়ে পুরুষ তবেই তাদের ঠিক মানাত।"

"প্রকৃতি তো এগারো ঘণ্টা ধরে সেই চেষ্টাই করে এসেছিল। এগারোটার সময় হঠাৎ তার হাত বেঁকে গেল, সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। তোমার উপর ভুল করে খানিকটা নারীত্বের আরক ঢেলে দিয়ে দেখে, সর্বনাশ। এ যে পুরুষালি মেয়ে।"

"আচ্ছা, তুমি কি সত্যি মনে করো যে নারী হয়ে বা পুরুষ হয়ে জন্মানোটাই একটা আকস্মিক ঘটনা? এর পিছনে বিধাতার অভিপ্রায় বা নিজের মনস্কামনা নেই?"

"একশোবার আছে। আমি ঠাট্টা করছিলুম না। নিছক ঠাট্টাও নয়। আসল কথা, আমাদের মধ্যে যেটি ব্যক্তি সেটি গভীরতর। যেটি নারী বা পুরুষ সেটি ভাসাভাসা। আমি যে আমি এইটে আমার চরম পরিচয়। আমি যে পুরুষ এটা আমার গুণ।"

সে এবার আর একটু রুবার্বের রস ঢেলে দিলে। যত বললুম, "আজ একটু কাস্টার্ড খাও।" খেলো না। ছ'ঘণ্টা পরে জানলুম আমার কথা না রেখে আমাকে বাঁচিয়েছে। কাস্টার্ডের ডিম তার মাথা ধরার কারণ।

খাওয়া শেষ হলে সে বললে, "আমি যাচ্ছি। একটু রোদ পোয়াতে পোয়াতে ঘুমোব। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি।" এই বলে একটা বালিশ চেয়ে আনল। যেখানে গর্সের কাঁটা পড়ে ঘাস থেকে নরমত্ব চলে গেছে, যেখানে মাটি আবড়া খাবড়া ও আগাছা পরগাছা গায়ে ও পায়ে খোঁচার মতো বিঁধছে সেইখানেই তার শোবার ইচ্ছা। আমি কিন্তু অমন জায়গার ত্রিসীমানায় বসতে পারব না, তাই অনেক ঘুরে তার ও আমার উভয়ের রুচি মিলিয়ে অনেক কষ্টে এক অর্ধেক কাঁটাবন ও অর্ধেক নরম জমি আবিষ্কার করা গেল।

আমার রাইটিং প্যাডখানাকে উল্টেপাল্টে দেখলে। দেখে বললে, "একটাও কবিতা লেখোনি যে। এই বেলা লেখো বসে।" এই বলে বালিশ পেতে মাথা রাখলে। ভাবলুম সে আর কথা বলবে না, ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু কেবল করে কী জানি তর্ক উঠল

আমাদের ইহকালের অভিজ্ঞতাগুলো আমরা পরকালে নিয়ে যাব কিনা। আমি বললুম, "কখনো না। অভিজ্ঞতার বোঝা বয়ে নিয়ে গেলে সেই বোঝার ভারে নুয়ে পড়ব, নতুন অভিজ্ঞতা কুড়োব কেমন করে?"

সে বললে "এত কষ্ট করে যা কিছু শিখলুম তার কিছুই যদি সঙ্গে না নিলুম তবে শিখলুম কেন?"

আমি বললুম, "শিখলুম শেখানোর জন্যে, নিলুম দেবার জন্যে। জন্মের পরে যা কিছু হয়েছি মরণের আগে সব হওয়াটি জগৎকে ধরে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা খালাস। দেহ বলো, মন বলো, স্মৃতি বলো, শিক্ষা বলো, ইহকালের কোনো ধারই পরকালে ধারব না।"

সে ভীষণ অবাক হয়ে রইল। তার চিরন্তন হাসি মুখ থেকে নিবল না বটে, তার চিরন্তন শিশুচোখ রহস্যের পাতালপুরীতে মুক্তা খুঁজতে নেমে গেল।

"কী ভাবছ?"

"ভাবছি তুমি যা বললে তা কি সত্যি?"

"কেন সত্যি নয়? মনুষ্যত্বের বোঝা বয়ে কাঁহাতক আমরা অনন্তকাল চলব? এখনো কত হওয়াই বাকী। ফুল হতে হবে, গাছ হতে হবে, তারা হতে হবে, সূর্য হতে হবে। কত কী যে হতে হবে কে জানে। জানবার জন্যেই মরা দরকার। মানুষ হওয়াটাই যে শেষ হওয়া বা সেরা হওয়া এ কুসংস্কারটা তোমারো আছে নাকি?"

এবার সে চোখ বুজে বললে, "থামো। ঘুমোতে দাও। কাব্য লেখ।"

কাব্য লেখার ইচ্ছা আমার আদপেই ছিল না কাব্য ভোগ করবার এই যে সুযোগ একে আমি যেতে দেব না আজ। তার মুদিত মুখখানির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইলুম। কোনো ভাস্কর যেন শাদা পাথর কুঁদে গড়েছে। নিটোল সুষম শুভ্র। চোখ দুটি পদ্মকোরকের মতো। বড় নম্র, বড় নিরীহ। তার চরিত্রের দৃঢ়তা তা হলে কি দিয়ে ব্যঞ্জিত হবে? ওষ্ঠ দিয়ে। শোবার আগে সে পা থেকে জুতো ও মোজা খুলে ফেলেছিল। তার খালি পা দেখে মনে হচ্ছিল তার ঐ অঙ্গুলি যেন সবচেয়ে কচি।

তার ঘুম আসেনি বুঝতে পারছিলুম। আবেদন জানালুম, "আমারও ঘুম পাচ্ছে।"

সে বললে, "তবে জুতো খুলে ফেল তুমিও।"

আমার মাথার জন্যেই ভাবনা, জুতোর জন্যে নয়। এ কথা তন্দ্রাময়ীকে বুঝিয়ে বললুম। তখন বালিশের আধখানা ছেড়ে দিলে। সে বোধ হয় মিনিট দশেক ঘুমুতে পারলে। আমার ঘুম এলো না। মুক্ত আকাশ, মেঘহীন, দীপ্ত নীল। বাতাসে ফুলের গন্ধ। চোখ মেললে কত শত যোজন দেখা যায়। ঘুমুতে আমার মায়া করছিল। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করছিল তার চোখের উপর চোখ রেখে দেখি সে কি সত্যি ঘুমিয়েছে? তার ঘুমন্ত শ্রী দেখতে দেখতে আমার এই কথাটি মনে হচ্ছিল যে সে সমস্ত সত্তার সঙ্গে ঘুমোয় না। সে ঘুমোয়, কিন্তু তার ওষ্ঠে মৃদু হাসি জেগে থাকে।

আবছায়ার মতো মনে হচ্ছিল আমি তার কত কাছে এসেছি। এক বালিশে মাথা

রেখে মুখের কাছে মুখ আনা। সে যদি আমারই মতো মানুষ হয়ে থাকত তার বিপদ ঘটত। কিন্তু সে মিরাণ্ডা, সে প্রকৃতি সরল।

কেমন করে সে বুঝতে পারলে আমার ঘুম আসছে না, তাই তারও ঘুম এলো না। বোধ হয় তার অস্বস্তি বোধ হলো। .খন দেখি বালিশের উপর দুটি হাত রেখে হাতের উপর মুখ রেখে আমাকে দেখছে। বললে, "তোমার চুলগুলি যদি এই রকম থাকে তো আমার দেখতে ভালো লাগে।"

আমি খুশি হয়ে বললুম, "যে আজ্ঞে। ক্রীম কিনতে আমার যে খরচ সেটা তা হলে বাঁচবে।"

চায়ের সময় হলো দেখে আমরা উঠলুম। সে কিছু স্কোনের গায়ে মাখন মাখিয়ে খেলো। আমি গোটাকয়েক কেক। ক্ষিদে ছিল না। আটটার সময় লণ্ডনে ফিরব, টাইমটেবল দেখে ঠিক করা গেল। সঙ্গে কিছু খাবার নেওয়া যাবে গৃহকর্ত্রীকে বলে। ডরকিং-এ ট্রেন ধরে ট্রেনে সাপার খাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণের জন্যে আমি উপরে গেছলুম। নিচে হতে দেখি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে পার্সটা পড়ে আছে। পার্সটা সে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল গৃহকর্ত্রীর প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার জন্যে। পার্সটা আমি পকেটে পুরলুম দুষ্টুমির মতলবে।

আটটার সময় আমরা রওনা হব এটা স্থির করে বেড়াতে বেরোলুম। রবিবার ব'টাতে লণ্ডন থেকে অনেকে এসেছে। কেউ মোটরে, কেউ মোটর-সাইকেলে, কারা সব পায়ে হেঁটে। এক ঝোপের আড়ালে শখের অপেরা অভিনয় চলেছে। একটি তরুণী উঁচু মাটির উপর দাঁড়িয়ে সুর করে কী একটা প্রেমের গান গাইছে, তার উত্তরে একটি যুবক নিচের মাটিতে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনের জন্যে তার হাত বাড়াচ্ছে ও গান গাইছে। দলের লোক হাততালি দিচ্ছে।

একটি তরুণ পিঠে রুকসাক বেঁধে পথ চলেছে, তার গলায় হাত জড়িয়ে তার সাথী হয়েছে একটি তরুণী।

আমরা অনেক দলের কাছ দিয়ে অনেকের ভিতর দিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে আবার এক কাঁটাবন বেছে অর্ধশয়ান হলুম। আমার আপত্তিটা প্রথমে সে না-মঞ্জুর করল, কেননা কাঁটাবনের চেয়ে সুখকর আর কী থাকতে পারে! পরে যখন বললুম, "তোমার মতো আমার পোশাক তো পশমী খদ্দর নয়, আমার এটা পাৎলা টুইড। পোশাক নষ্ট হলে তুমি সাত গিনি দেবে?"

তখন সে বললে, "তবে ওঠ।"

তখন আমি এত হাসতে লাগলুম যে কারণ বুঝতে না পেরে সে মহা বিব্রত হয়। "ব্যাপার কী? আমার মধ্যে এমন কী দেখলে যেটা হাস্যকর?"

"তোমার মধ্যে নাও হতে পারে।"

"তবে আমার জিনিসপত্রের মধ্যে?"

"বলব না। বলব যদি এক পাউণ্ড দিতে রাজি হও।"

"এক পয়সাও না।"

"দশ শিলিং।"

"এক কানাকড়িও না।"

"আচ্ছা, আধ ক্রাউন দিলেই চলবে।"

"না।"

"তবে হো হো হো হো –"

আমার হাসির বানে তার মুখের অবস্থাটা বিপন্ন বোধ হলো দেখে আমি কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললুম, "তোমার মতো সৃষ্টিছাড়া মানুষ পৃথিবীতে ক'জন আছে। যত রাজ্যের কাঁটাবনে বেছে বেছে বসো কেন?"

তখন সে যেন একটা কিনারা পেলে তার মুখে হাসির রেখা দেখা দিলে। সে বললে, "এর পর তুমি উইকেণ্ডে এলে মিসেস নবউডকে এনো, আমাকে না।"

আমি জুড়ে দিলুম, "এবং ট্যাকাস করে তাকে হাওয়া খাইয়ো এবং সিনেমায় নিয়ে গিয়ে সিগারেট খাইয়ো।"

একবার সে বলেছিল, "আমার সবচেয়ে কী ভালো লাগে জানো? পাহাড় পর্বত পাথর। তার পরে গাছপালা কাঁটাবন। পশু আমার তেমন ভালো লাগে না, মানুষও না।"

আমি বলেছিলুম, "মানুষই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, তার পরে পশু পাখি।"

এইবার সেকথা উঠল। সে বললে, "পাহাড়ের চূড়ায় যখন উঠি তখন সে যে কী আনন্দ বোঝাতে পারব না। এমন একটা Sense of Space আর কোথাও বোধ করিনে। যেন পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবী থেকে মুক্তিলাভ করেছি।'

"আর কাঁটাবনে বসে কী রকম Sense বোধ করো?"

"প্রাণের রোমাঞ্চন। অহরহ যে প্রাণ সঞ্চারিত পল্লবিত হচ্ছে কাঁটার খোঁচা যেন তারই সত্যতাকে জাহির করতে থাকে, ভুলতে দেয় না।"

বাসার ফিরে চললুম, পথ হারালুম। পথ খুঁজে পেয়ে আশ্চর্য হলুম। এও সোজা পথ হারিয়েছিলুম কী করে? ফার্মহাউসে ফিরে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলুম কিছু খাবে কি না সে বললে, "ভীষণ মাথা ধরেছে।" যকৃৎজনিত মাথাব্যথা। ওষুধ না খেলে সারবে না। ওষুধ কোথায় পাব। অগত্যা লণ্ডনে না পৌঁছানো পর্যন্ত মাথাব্যথা সইতে হবে। উৎসবের সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে দগ্ধ হয়ে গেল

তাকে খুশি করলে যদি বেদনার কিছু লাঘব হয় এই ভেবে হাসি তামাশা চালালুম, চুরি করে ব্লু বেল তুলব পরের বাগান থেকে। পুলিশ এসে চুরি জনাবে ধরে চালান দেবে। ও পথ দিয়ে সোজা যেয়ো না গো। ঐ প্রণয়ী প্রণয়িণীর প্রমালাপে ব্যাঘাত হলে ওরা অভিশাপ দেবে—দেখ, দেখ, পাচটি বাঁচ গাছ কেমন পাঁচ ভাইয়ের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। আঁকবার মতো।

বাস যেখানে দাঁড়ায় সেখানে আমরা আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়েও বাস পেলুম না। এতক্ষণে তার মনে পড়ল পার্সটার কথা। "তোমাকে দিয়েছি?"

অতিকষ্টে হাসি চাপতে লাগলুম।

আমার একটা পকেট টিপে দেখলে। তার মুখ শুকিয়ে গেল। ঝুলিটাকে উজাড় করে ঝাড়ল। তার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। "তবে কি ঐ বাড়িতেই ফেলে

এসেছি ? য়্যা !"

তার চেহারা দেখে আমার ভয় করতে লাগল। পাছে মাথাব্যথা বাড়ে। পার্সটা যে পকেটে ছিল সেইটে তার দিকে ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। সে কী মনে করে পকেট টিপল। পার্সটার সন্ধান পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি আশ্বস্ত হলুম। বললুম, "এবার বুঝলে তো। কেন অত হাসছিলুম ?"

"ওঃ! এইজন্যে !"

"তখন আধক্রাউন দিতে রাজী হচ্ছিলো না। এখন গোটা পার্সটাই আমার।"

অনেক দেরিতে যে বাস্‌টা এলো সেটা আমাদের ট্রেন ফেল করিয়ে দিলে। সে বললে, "চলো তবে আমার বান্ধবী মুরিয়েলের বাড়ি যাই। সে যদি দুটো ঘর দেয় তো থাকা যাবে। নয়তো পরের ট্রেনে লণ্ডন।" তার মাথাব্যথার জন্যেই ছিল আমার মাথাব্যথা। তাই সে যখন তার বান্ধবীর বাড়িতে আমাকে নিয়ে পৌঁছল তখন আমি আলাপ পরিচয়ের পর মুরিয়েলকে বললুম, "একমাত্র এঁর জন্যে জায়গা আছে তো ভালোই। আমার জন্যে ভাববেন না।"

মুরিয়েলের বন্ধু জো আমাকে কাছাকাছি একটা হোটেলে নিয়ে চললেন। সঙ্গিনী বললে, "আমার পার্স থেকে আমাকে সামান্য কিছু দিয়ে বাকিটা তুমি রেখো।"

আমি তাকে খ্যাপাবার জন্যে বললুম, "তোমার পার্স কিসের ? আমার পার্স থেকে তোমাকে কিছু দান করে বাকিটা আমি পকেটে পুরলুম।"

তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কিন্তু পরিহাস করবার মতো অবস্থাও বিদায় নিল। সকলের সামনে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সাজতে হলো, যদিও তার পীড়িত মুখখানির দিকে চেয়ে আমার মন কেমন করছিল। সারা রাত তাকে মনে পড়ছিল যখন তখন মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছিলুম যে আমাদের দু'জনের দেহ যত দূরেই থাক আমাদের আত্মা তো অভিন্ন।

পরের দিন সকালে দু'জনে মিলে ওয়াটারলু ফিরে এলুম। তখনকার বিদায়টাই সত্যকারের বিদায়। কেননা দিনের কোলাহলে ও কাজকর্মের মাঝখানে দু'দিনের একত্রবাস স্বপ্নের মতো অলীক বোধ হলো।

আনন্দ বাগচী

১৩৩৪ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ পাবনা জেলায় আনন্দ বাগচীর জন্ম। যদিও কবি হিসেবে আনন্দবাবুর পরিচিতি বেশী থাকলেও গল্পকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি কম নয়। ত্রিলোচন কলমচি ছদ্মনামে আনন্দবাবু লিখেছেন অনেক।

অনেকক্ষণ কেউ কথা বলেনি। শুধু মাথার ওপরে মউচাকের মত অস্পষ্ট গুঞ্জনে
ওয়া কেটেছে পাখাটা। শ্বেতপাথরের ছোট্ট টেবিলটা সকলের বুক ছুঁয়েছে। একটু
কে বসতে গেলে এই হয়। পরিসর বড্ড কম। তা হোক তবু এটা নিরালা, বলতে
লে রেষ্টুরেণ্ট মনেই হয় না। কোন বাড়ির ভেতরের মহলে বসে আছে এমনই মনে
য়। এখানে সত্যিই দুটি মহল। সামনে তরফে মালিক বসেন, আলো হাওয়া আসে
খানে সবাসবি, সদর রাস্তায় লোক চলাচল চোখে পড়ে। বয় ছুটোছুটি করে, পেয়ালা
রিচের শব্দ প্রায় লেগেই থাকে।

কিন্তু একটা কলতলা-উঠোন পেরিয়ে, আলো আঁধারি প্যাসেজ ডিঙিয়ে কয়েকটি
্যাবিন নিশ্চুপ পড়ে থাকে সারাদিন। পোড়ো ঘরের মত। অন্তত এই দুপুরে বেলাটা।
তুড়ে ভূতুড়ে লাগে। কেউ আসে না। অনেকে বোধ খবরই রাখে না এই অন্দব
হলেব। কারণ সদর থেকে ক্যাবিন-গুলো চোখে পড়ে না। শুধু যারা জানে তারাই
ানে।

ওরা তাই আসে। দু-বছর ধরে হামেশাই মনখুলে গল্প করতে এখানে এসেছে।
াব মেয়েদের মনখোলা মানেই মুখখোলা। সে কিছু রাস্তায় পার্কে চলে না। যেখানে
পরের কান খোলা সেখানে তাদের মুখ বন্ধ। তাই কফি-হাউস কিংবা ওয়াই এম
এ-তে পশার জমাতে যায়নি কোনদিন। এখানেই এসেছে প্রতিদিন. এবং আজও
সেছে। কিন্তু আজ ওবা অনেকক্ষণ এলেও কোন কথা বলেনি, গল্প তো নয়ই।
কমন একটা থমথমে মুখ নিয়ে বসে আছে তিনজনে। রোদে তাতা চেহারা জুড়িয়ে
য়েছে পাখার হাওয়ায়, কাঠেব পার্টিশানের মধ্যে, বিজলি বাতির গোলমেলে
আলোয়।

তবু কেমন কেউ অস্বস্তিভবা আর অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে তিনটে মুখ, তিনজোড়া
চোখ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। অবশ্য তিনজন কখনো পরস্পরেব দিকে তাকাতে
ারে না, একজন আর একজনের দিকে তাকায়, তারপর মুখ বদল ক'রে আরেক
নের দিকে। অথচ কথা নেই। যেন তিনটে শূন্য পেয়ালা টেবিলের ওপরে মুখোমুখি
য়েছে।

বাইরে অন্য কোথাও, বেলা একটার রোদ ঝলসাচ্ছে হযত, এই বৈশাখী রোদ্দুরে।
খানে তার তাপ নেই, এখানে শুধু নকল আলো আর বানানো ছায়ার কারচুপি। শুধু
াখার শব্দ, সবুজ পর্দা আর ঠাণ্ডা টেবিল। আর তিনজন, তিনজোড়া চোখ, তিনজোড়া
নিশ্বাস-প্রশ্বাস। একতাল কথাই যেন পিণ্ড পাকিয়ে গেছে।

সৃন্ধিকা বলল, 'বেশ ছিলাম, এতদিন, বেথুনের চারচারটে বছর আর ইউনিভার্সিটির

দুই—এই ছ'বছর বেশ ছিলাম আমরা।'

হৈমন্তী কথাটা লুফে নিয়ে যেন বাঁচালো, 'সত্যি কিসব দিন গেছে তখন আমাদের। বর্ষার দুপুর···শীতের দুপুর···গ্রীষ্মের দুপুর, সেইসব দুপুরগুলো'—কি বলবে ইতস্তত করে থেমে গেল হৈমন্তী।

বনানী সূত্র ধরে বলল, 'আর ফিরে আসবে না আমাদের কাছে।'

'এমনিই হয়', যূথিকা বলল, 'যা যায় আর বুঝি ফিরে আসে না। আমাদের অতীতটা যদি রিপ্লাইকার্ডের মত আবার ফিরে আসতো আমাদের হাতে—'

'তাহলে নিজের হাতে লেখা ঠিকানাটা অদ্ভুত লাগতো।' বনানী মুচকে হাসলো।

'ঠাট্টা করিস না বনানী। ইট ইজ ট্রু স্যাড।'

'আমি তোকে ঠাট্টা করিনি রে। সত্যি যখন ভাবি আমাদের সেই আড্ডার দিনগুলোর কথা, আকাশপাতাল স্বপ্নের কথা, পড়াশোনার কথা, তখন বুকের কাছটায় মোচড় লাগে।'

'লাগেই তো। আর লাগে বলেই-তো আমরা বেঁচে আছি, এখনো ম্যারান'—

'অন্তত মাস্টারনি হয়ে যাইনি', বনানী বলল, 'আমার সেই আশঙ্কাই বেশি ছিল তোদের মধ্যে একমাত্র আমিই স্কুলে চাকরী করছি দু-বছর ধরে।'

'সত্যি তোকে মাস্টারনীর চেহারায় ভাবতেই পারা যায় না। তুই ক্লাস ম্যানেজ করিস কি করে?'

'কিন্তু রত্না আর লাবণ্যরও কি আমাদের মত দুঃখ হয়? ওরা কি এখনো ভাবে সেসব দিনের কথা!'

'ছাই ভাবে।'

'ওরা সুখিয়ে গিয়েছে, যার অপরনাম মুটিয়ে যাওয়া। ভালো ঘর ভালো বর পেয়েছে··· সুখে মানুষ শেষ পর্যন্ত মোটা হয়ে যায়, মরে যায়। স্থূল হয়ে যায়--'

'ওরা সত্যিই মরে গেছে। রত্নাটা সবার আগে। দিল্লি থেকে চিঠি লিখছে কাল চিঠিতে ওর মৃতদেহ দেখলাম যেন। মনের কোন চিহ্ন নেই। কেবল সুখ-আহ্লাদে কথা, ঐশ্বর্যের ফিরিস্তি··· পাল্টে গেছে একেবারে।'

'অথচ ছ-মাস আগেও কেঁদে গেছে, মনে আছে?'

'তা আর নেই, তারও আগের কথা হুবহু মনে আছে আমার। প্রতিজ্ঞা করেছিল একা থাকবে '

'মুখে যাই বলুক, বিয়েই চেয়েছিল। নিরানব্বইটা মেয়ের মতই ও একটা। ন ডোবালো।'

'ও একা কেন, লাবণ্য কি করলো।'

'বিট্রে! এছাড়া আর কিছুই মনে হয় না আমার, বিট্রে করেছে-আমাদের সঙ্গে!'

'নিপাত যাক মুখপুড়ী। ডুবেডুবে জল খাচ্ছিল এতদিন।'

'ও-ও তো বলেছিল একই কথা। বলেছিল: অল্ বোগাস—বিয়ে মানেই অন্ধকা একটি অপরিচিত লোকের গায়ে ঢলে পড়া—আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমি পরিচ্ছ থাকবো। শেষে কিনা প্রেম করে—'

'তা অপরিচিত লোকের গায়ে তো আর ঢলেনি, কথার একেবারে খেলাপ করেনি যাই হোক।' বনানী মুখ টিপে হাসলো।

'আলবৎ করেছে!' বনানীর দিকে স্ফুলিঙ্গভরা চোখে তাকালো যূথিকা, 'ও একটি কিং লায়ার।'

'কুইন বল।' বনানী আবার টিপ্পনি কাটালো।

যূথিকা চটে গেল, 'বড্ড ফাজিল হয়েছিস বনো, সময় অসময় জ্ঞান নেই তোর।'

হৈমন্তী যূথিকার পক্ষ নিল, 'বুঝেছি। ছোট ছোট মেয়েগুলোর মাথা চটাচ্ছ করছিস স্কুলে গিয়ে।'

'বড় মাথা চিবিয়ে খাওয়ার চেয়ে সে বরং ভালো। লাবণ্যর মত'—

'তুই থাম যূথিকা', বনানী বলল, 'দিদিদিকে চটে যাচ্ছিস আজ। কি হয়েছে বলতো তোর। যে জন্যে ডেকে এনেছিস আমাদের।'

'হ্যাঁ', হৈমন্তী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বলল, আসল কথাটাই ভুলে মেরে দিয়েছি আমরা। আহা সুন্দরী, তোমার ব্যাপারখানা কি খুলে বলো দেখি এইবার'—

পর্দা সরে গেল সহসা। বয় সরবতের ট্রে নিয়ে ক্যাবিনে মাথা গলালো। কোন কথা না বলে টেবিলটা মুছলো একবার ভিজে তোয়ালে দিয়ে। ততক্ষণ ওরা চেয়ারের পিঠে হেলে বসলো। মসৃণ ঠাণ্ডা সাদা পাথরের টেবিলটাকে মনে হল নিদ্রার শান্ত চকনা একটা। সমাধি। সমাধির ওপরে আলো দিয়ে যেন, প্রথমে মনে হয়েছিল ফুল। সমাধিতে ফুল ছড়ানোটাই স্বাভাবিক বেশি, কাচের তিনরঙের তিনটে ফুল। বনানীর মনে হয়েছিল প্রথমে উপমাটা। একটু আগে যাদের নিয়ে স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, তারা সকলেই একরকম মৃত। কেউ নেই। তাদের কাছে তারা আজ আর কেউ নয়। আর সেই ছটা বছর, ভাবনা দিয়ে এখনো ছোঁয়া যায় যেকোনো মুহূর্তে কিন্তু হাত দিয়ে যায় না, জীবন দিয়ে না। তারা বসে আছে সমাধির আবহে। আর কাঠের পার্টিশান দেওয়া নকল আলোয়, অর্ধেক আলো অর্ধেক ছায়া মেশানো ঘরে, যেখানে মাথার ওপরে বাস্তব ঝুলছে নিষ্প্রাণ পাথার ঘায়ে, মনে হচ্ছে একটু আগেও সেখানে কেউ ছিল, অন্তত কারো শোক, কারো বেদনা।

সরবতের গ্লাসগুলো নামিয়ে রেখে বয় চলে গেলেও কেউ সাহস করে সামনে ঝুঁকলো না। মনে হলো সামনে শুধুই পাথর, সাদা পাথর, হয়ত ঠাণ্ডা কিন্তু ভারি অনড় হয়ে সকলের বুকের ওপরে ছিল একটু আগে পর্যন্তও। এবং ভিজে তোয়ালে দিয়ে লোকটা শুধুই টেবিলটা পরিষ্কার করে যায়নি, এই বেবিনের সমস্ত কথা নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়ে গেছে যেন। আর তাই তিনজন এখন একটা নির্বাক রহস্যে চুপ করে বসে রয়েছে। একটু আগেও এই রকমই ছিল, অল্প একটু আগে। কেউ তখন কথা বলতে সাহস করেনি। এখনো তাই। যূথিকা তার অভ্যাস মত ভাঁজ করা রুমালে নাক অবধি ঠোঁট দুটোকে চেপে রেখেছে, তাকে নিরতিশয় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বনানী তার রুক্ষ কোঁকড়া চুলের একটি গুচ্ছ তিন আঙুলে টেনে টেনে সমান করতে ব্যস্ত, হয়ত ওই সঙ্গে কব্জি ঘড়িটার শব্দও শুনছে। সোনাপোকার মত কানের পাশে চিকচিক করছে সেটা। আর হৈমন্তী আঙুল দিয়ে তার নামিয়ে রাখা ফাইলটার ওপরে একমনে ক্লাস-

নোট নিচ্ছে যেন।

আসলে হয়ত ওই কাচের তিনরঙা তিনটে গ্লাসকেই ওরা ভাগ্যের শেষতাস বলে মেনে নিয়েছে। তাই ছুঁতে ভয় পাচ্ছে। নিষ্ঠুর সত্যটা জানতে কে না ভয় পায়। হাতের রেখায় নিজের তেমন ভবিষ্যৎ কে গোনাতে চায়। অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের তিনটে ইশারা যেন ওই সবুজ হলুদ আর লাল রঙের সরবতের গ্লাসে। চৌমাথার ট্রাফিক সিগন্যালের মত জ্বলছে। কাচের ফুল নয়, তিনরঙের তিনটে তরল বাতি। কে হাত দিয়ে কোনটা ছোঁবে। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম যেন একেই বলে।

অথচ যূথিকা জানতো তার ভাগ্যে কি আছে, কি ঘটতে যাচ্ছে পাকাপাকি। আর তার নিয়তি, সেই অনিবার্য নিয়তি যে রায় দিয়েছে সেইটেই যে কোনো উপায়ে তার অবশিষ্ট দুটি বন্ধুব কাছে খুলে বলতে হবে। তার জন্যে যে পরিমাণ ভূমিকা করা প্রয়োজন তা যেন এখনো সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেন সে, যেরকম বেদনার্ত মনোভাব প্রকাশ করা উচিত, যতটা ব্যাকুলতা, তার কিছুই তার মুখেচোখে অভিব্যক্ত হয়নি, হতে পারেনি। অথচ যূথিকা জানে বনানী আর হৈমন্তীর কাছে তার সংবাদ কতটা মর্মান্তিক শোনাবে, কতটা আকস্মিক। তবু উপায় নেই।

যূথিকা এক সময়ে ঠোঁটের ওপর থেকে রুমাল সরালো। নিষ্প্রাণ গলায় একটা ঢোক গিলে বলল, 'আমাকে আজ ওঁরা দেখে গেলেন। কি করি বলতো?'

'বাংলা দেশের মেয়েরা তো দেখবারই জিনিস কিন্তু দেখলেই সব হয় না, আসল কথা পছন্দ হয়েছে কিনা।'

যূথিকা জবাবে বলল, 'সঠিক জানি না। তবে ভাবসাব দেখে তো তাই মনে হল।'

হৈমন্তী বলল, 'দরদামে না পোষালে ফাঁড়া কেটে যাবে।'

যূথিকা বলল, 'কিন্তু এবার বোধ হয় ফাঁড়া কাটবে না। আমাকে পার করতে বাবা প্রয়োজন হলে সর্বস্ব পণ করবেন।'

বনানী বলল, 'তোমার উচিত আগে থেকেই জানানো। পরে ভদ্রলোককে কেন নাজেহাল করবে, এই বেলা সব খুলে বলো।'

'তুই তো জানিস বনো, বাবার মুখের ওপর কথা বলতে পারি না আমরা কেউ। আমার দাদা পর্যন্ত না'—

'তা বলে একটা জীবন নিয়ে খোলামকুচি খেলবার কোন মানে হয় না। শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছো কি করতে, নিজের সমস্যাটা বোঝাও তাঁদের। বাবাকে না পারো মাকে বলো।'

'বাবা পরোক্ষ ভাবে শুনে বলেছেন, মেয়ে তার নিজের ভালোমন্দ কতটুকু বোঝে! আমি তার বাবা, বয়সে নিশ্চয় তার চেয়ে কিছুটা বড়োই হবো। আর অভিজ্ঞতার'—

বনানী বলল, 'সব বাবা মা-রই ওই এক কথা—তোমাকে এতদিন স্বাধীনতা দিতে কার্পণ্য করিনি, পড়তে দিয়েছি কলেজে যা খুশি করেছ, যেমন খুশি চলেছো তা বলে এখন আমাদের কথার অবাধ্য হবে নাকি?'

'তা ছাড়া', যূথিকা হতাশ গলায় বললে, 'বিয়ে করবো না বললেই ওঁদের মনে রাজ্যের সন্দেহ উঁকি দেয়। ভাবেন অন্য কোথাও কিছু ঘটিয়ে বসে আছি। আমার মাসিমা তো প্রায় স্পাইয়ের মতই লেগেছিলেন আমার পিছনে পিছনে, ভেবেছিলেন কথা বার করবেন।'

'নীরস পাথর নিংড়ালে আর কি হবে!' বনানী আবার তরল গলায় বলল।

হৈমন্তী মৃদু হেসে বললে, 'দ্যাখ, ভেবে দ্যাখ যূথি, সত্যিই লভেটভে পড়িস নি তো?'

যূথিকা চটে গিয়ে ওর হাতে একটা চিমটি কাটলো।

'মাগো!' হৈমন্তী আহত স্থানে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'হাতে হাতে প্রমাণ পেয়েছি, আর না।'

বনানী বললে, 'কিন্তু তুই ভেবে দ্যাখ যূথি, বন্ধুরা একদিন ধীরে ধীরে সরে যাবে। একদিন আমরা পাঁচজন ছিলাম, বাংলার অধ্যাপক ঠাট্টা করে বলতেন পঞ্চকন্যা, ইউনিভার্সিটিতে ছেলেরা পিছন থেকে চোরা গলায় বলত পঞ্চসতী! আজ তার থেকে দুজন খসে গেছে, ভবিষ্যতেও হয়ত'—হৈমন্তীর দিকে একটা কটাক্ষ ছুঁড়ে বলল, 'আরও কেউ কেউ থাকবে না! তখন সারাজীবন একা থাকতে হবে তোমাকে। তোমার মত নিরীহ মেয়েরপক্ষে·· ভেবে দেখো।'

যূথিকা ফ্যাকাশে গলায় বলল, 'তুইও শেষে এই কথা বলছিস বনো। 'তুই-ই ছিলি আমাদের মধ্যে'—আর বলতে পারল না।

হৈমন্তী বলল, 'তোমারও অসুখে ধরলো নাকি বনো? ব্যাপার কি। নিজের সম্বন্ধে নতুন কোনো ডিসিশন নিয়ে ফেলেছ নাকি!'

'অত্যন্ত নিষ্ঠুর হলেও আমি আজ সত্যি কথাই বলছি। যূথি পারবে না। পারবে না যখন, মিথ্যে লোক হাসিয়ে লাভ কি। আমরা একটা আদর্শ নিয়ে চলেছিলাম সেই আদর্শের অবমাননা যথেষ্ট হয়েছে। হ্যাঁরে তোর বরকে দেখেছিস তুই. পছন্দ হয়েছে তোর?'

'তোর কি হলো, এমন স্ল্যাং ইউজ করছিস কেন।' হৈমন্তী গর্জালো।

'তুই আমার কথা শোন যূথিকা, বিয়ে করে ফেল দেখবি শান্তি পাবি। মিথ্যে আমাদের ভরসায় থাকিস না। আমরা শেষ পর্যন্ত তোকে বিট্রে করতে পারি, তোকে বাঁচাতে পারি না।'

বনানীর আজ কি হয়েছে। ওরা দুজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। বনানী তো এমন ছিল না। কিন্তু বনানীর মুখের কথার সঙ্গে বনানীর মনের কথা আজ পর্যন্ত কখনই অক্ষরে অক্ষরে মেলেনি। ওর মত একগুঁয়ে মেয়ে, জেদী মেয়ে, শক্ত মেয়ে খুব কমই ওদের চোখে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত ও কি বদলালো! কিছু বলা যাচ্ছে না। কারো মনের কথাই আজ আর বলবার মত সাহস নেই ওদের। ওরা আবার পরস্পরের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো।

মুখে যদি আলোটা না পড়তো ভালো হত। সবাইকার মুখ অস্পষ্ট, মুখের ভাষাও। কারণ মুখের রেখার মধ্যে দিয়ে মুখের ভাষাও ফোটে। অন্তত এরকম সময়। যখন তিনজন তিনটে কোণ বেছে নিয়ে মুখোমুখি যুঝছে। মনে মনে তারা লড়ছে, মুখে কথার

গড়খাই। কেউ কাউকে মনের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। এ সময় আলোটা না থাকলে ভালো হত। কারণ সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে, নিজের নিজের তাস বুকের কাছে ধরে রয়েছে, জেনে ফেলেছে, কিন্তু বলছে না। তিনজনের মধ্যে যদি দুজনের হুবহু মিলে যায়, ভয় সেখানেই।

শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপরে তিনরঙা সরবতের তিনটে গ্লাস ক্রমাগত ঘামছে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে এলো বনানী। ইউনিভার্সিটির আড্ডা, রেষ্টুরেণ্টের তর্কমীমাংসা সব সেদিনকার মত শেষ করে দিয়ে। যূথিকার সমস্যার কোনই সমাধান হলো না। কি-ই বা হবে। কোনো চাকরি নিয়ে কলকাতা শহরের বাইরে চলে যাবে তেমন ক্ষমতা তার নেই। অথচ পরিবারের মতামতের সামনে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়াবে, দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন লড়বে তেমন সাহস এবং সাধ্য যূথিকার কোথায়। যূথিকা নেহাৎ ভালোমানুষ, নিরীহ মেয়ে।

বনানী বাড়ি ফিরে এলো। রুক্ষ চুল, স্নান হয়নি। সমস্ত শরীর ঘামে আঠাআঠা। মিসট্রেসী ব্যাগটা খাটের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। জুতো জোড়া পায়ে করেই ছুঁড়ে মারলো বারান্দার কোণে। ঠাণ্ডা পাথরের মেঝের ওপরে পায়ের তলা ঘষলো বার কয়েক। নিচে কলঘরে জল পড়ছে ঝরনার আওয়াজে। তৃষিত অন্তরে কান পেতে শুনলো সেই শব্দ। মরুকগে যূথি, নিপাত যাক হৈমন্তী। এই মুহূর্তে, সারা দিনের অস্নাত অভুক্ত বনানীর কাছেই এই ঠাণ্ডা জলের আহ্বান অনেক বড়ো। এই বাড়িতে বাবা-মার বিরুদ্ধে কাকা-জ্যাঠার বিরুদ্ধে দিনের পর দিন তার সংগ্রামের অন্ত নেই। কতটুকু হৈমন্তী আর যূথিকা জানে, কতটুকু জানতো রত্না আর লাবণ্য। সব কথা কেউ জানে না। সবাই তাকে বাবা-মার আদুরে মেয়ে বলে জানে। তাদের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, সুতরাং তাদের যথেষ্ট পয়সা আছে একথা কারো কাছেই গোপন সংবাদ নয়। সে এক মেয়ে। তার ভবিষ্যৎ দেয়ালীর মত আলোয় আলোয় উজ্জ্বল। সকলেই মনে মনে হিসেবে কষতে ভুল করে না।

কিন্তু ক-জন জানে তার এই মাস্টারী করার পিছনে একটি জীবন সংগ্রামই লুকিয়ে আছে, বিলাসিতা নয়। তার চাকরি করা নিয়ে বাড়িতে কত কথা হয়েছে। মা-বাবার সম্মানে বেধেছে। তাঁরা তাকে স্কুল ছেড়ে দিতে বলেছেন। বলেছেন কথার বাধ্য হতে। যূথিকা আজ একবার যেকথা শুনেই হতাশ হয়ে পড়েছে, আজ ক'বছর ধরে তার জীবনে সেকথা কতবার জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। সেইসব লোভনীয় সম্বন্ধ বনানী ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এবং তার ফলে নানা নির্যাতন সহ্য করেছে মুখ বুজে। বাইরে কেউ জানতে পারেনি। বড়োঘরের কথা অমনিই চাপা থাকে।

আসলে কাউকেই জীবনের সঙ্গী বলে মনে হয়নি। পুরুষ অনেক দেখেছে তার এই তেইশ বছরের জীবনে। অনেক অনেক। হৈমন্তী কি যূথিকা হলে পাগল হয়ে যেতো। কিন্তু তার মাথার কোন পরিবর্তন ঘটেনি, দিব্যি ঠাণ্ডা আছে। শুধু জেনেছে, পৃথিবীতে সবপুরুষই একরকম। লোভী, বর্বর, বোকা। কেউ সঙ্গী নয়, কেউ বন্ধু হতে পারে না। কৃতী কৃতার্থ সুশ্রী হলেও। বনানী তাদের মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

দিয়ে গৌরবই বোধ করেছে। দেবী আমি নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী। চিত্রাঙ্গদার সেই উদ্ধত ভঙ্গি মনে পড়ছে। প্রত্যাখ্যাত পুরুষদের অপমানিত, হিংস্র মুখগুলি একের পর এক মনে পড়ে হাসি পেল বনানীর। চুলোয় যাক সব। সে একাই থাকবে বেশ থাকবে। যাক যূথি যাক হেমন্তী। কলের জলের শব্দে কান পেতে মনকে এই কথাই বোঝালো, কিন্তু তেমন যেন জোর পেল না ভেতর থেকে। কোথায় যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে সব কিছু।

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে বিকেলের। সামনেই দোতলার ঝুল বারান্দাটি একটি নির্জন ফুলের টবের মত। সেখানে চাঁপা গাছের একটি ঝুপসি ডাল ঘেরটোপ পরিয়ে দিয়েছে। শুধু ছায়া বিস্তার করেনি; সুগন্ধও ঢেলেছে। সুইচে হাত রেখে হঠাৎ থেমে গেল বনানী। সমস্ত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেল। আর একটি দিনের কথা মনে পড়লো। ঠিক এমনি সময় এমনি মুহূর্ত। সারাদিন অস্নাত বনানী। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। সামনেই ঝুল বারান্দায় চাঁপার ডাল ঢলে পড়েছে। ঘরে আলো জ্বালেনি। শরীরটা ভালো ছিল না। উদাসীন চোখে বাইরে তাকিয়েছিল। এমন সময়...

সব কথা মনে নেই। শুধু তার পরবর্তী ঘটনা মনে আছে। বনানী চিৎকার করে উঠেছিল। আর সমস্ত দেহের প্রতিবাদে যা পারেনি, একটি চিৎকারে কত সহজে সেটি সম্ভব হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়। একটি আলিঙ্গন, একটি নির্মম আলিঙ্গন কত সহজে স্খলিত হয়েছে, খসে পড়েছে তার গা থেকে। মনীশ স্তম্ভিত এবং বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল, এতটা সে আশা করেনি।

বনানীই কি করেছিল? সেই কি ভাবতে পেরেছিল যে, এই শান্ত চেহারার ছেলেটির মধ্যেও একই পুরুষ দিনে দিনে বাড়ছে। শুধু একটি সুযোগের অপেক্ষা। না বনানী মনীশকে তেমন কোনদিনই ভাবতে পারেনি। হাসতে গল্প করতে কি পড়ার আলোচনা করতে করতে ছোঁয়াছুঁয়ি কি এক আধবার হয়নি, চোখাচোখিও অসংখ্যবার কিন্তু মনীশের মধ্যে কোন লোভকে তো উঁকি মারতে দেখেনি। আর দেখেনি বলেই বনানীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী বন্ধু, হ্যাঁ তার বন্ধুস্থানীয় ছিল মনীশ। কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে এবং সেখান থেকে বাড়ি পর্যন্ত এসেছে সে বনানীর পিছু পিছু। ঠিক পিছু পিছু নয় পাশাপাশিই বলতে হবে। পরিচিত মেয়েরা এবং ছেলেরাও এ নিয়ে তাদের মুখোরোচক রসনা কেটেছে, গল্প বানাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বনানীর গাম্ভীর্য দেখে পারেনি তবে একথা সত্যি মনীশের মত এতদিন ধরে কেউ বনানীর পাশে পাশে চলতে পারেনি।

সেই মনীশ এই কাজ করলো। প্রথমে ভয়ে শিউরে উঠেছিল। মনে হয়েছিল ঘরের অন্ধকার দুটি বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে তাকে অজগরের মত গ্রাস করতে চাইছে পাকে পাকে জড়িয়ে বাঁধতে চাইছে এক অজানা বাঁধনে। বনানী প্রথমে সত্যি ভয় পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিল, নিঃশব্দে পারেনি। চূর্ণমুষ্ঠি ছুঁড়েছে বৃথাই। ফল হয়নি। বরং নিশ্বাসে নিশ্বাসে জড়িয়ে গেছে আরও বেশি করে।

তারপর ঘৃণা। অসম্ভব ঘৃণায়, বাড়ির লোকের কান বাঁচিয়ে বনানী একটি চিৎকার

করেছিল শুধু। কেউ শোনেনি, শুধু তারা দুজন ছাড়া। বনানী জানতো, মনীশ জানতো না হয়ত। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছেড়ে দিয়েছিল মনীশ। বনানী দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'স্কাউণ্ড্রেল!'

মনীশ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর সেই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে কাঠের পুতুলের মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বনানী। সমস্ত শরীর তখনো থরথরিয়ে কাঁপছে। রাগে ভয়ে ঘৃণায়। বুকের ওঠাপড়া থামেনি, শাড়ি আলুথালু, জামাটা পিঠের কাছে ঘামে লেপ্টে গেছে। ঠোঁটের উপরে বৃশ্চিক-জ্বালা। কাঠের পুতুলের মত উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বনানী। শব্দটা তখনো শোনা যাচ্ছে। সিঁড়িতে ঘষা খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে এলেও। মনীশ চোরের মত মাথা নিচু করে নেমে যাচ্ছে। তার পায়ের শব্দটা মনে হচ্ছে কোন এক পাতাল-পুরীর দিকে এগোচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। মনীশ কোনদিন আর ফিরবে না। তার আয়ু এতদিনে শেষ হল। এমনিভাবে আরও বহু যুবকের বিসর্জন হয়েছে। তাদের মধ্যে মনীশই বেশি দিন বাঁচলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচলো না।

আজও বনানী তেমনি একা-একা দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে। ঘরের চারটে দেয়াল তার দিকে তাসের সাদা পিঠের মত ঘিরে রইল। একটি অর্থহীন শূন্যতায়। কেমন ভয় ভয় করলো বনানীর। মনে হলো এই ধু-ধু তেপান্তরের মধ্যে সে একা, সে নিঃসঙ্গ। এই ঘর তার জীবনের একটি অবধারিত রূপক। এই নিঃসঙ্গতা, এই ধূসর মৃত্যু, তার বড়ো ভয় করলো। মনে হলো শূন্যতার মধ্যে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, তার হৃদপিণ্ডের গতি থেমে আসছে। ধ্বনি ক্ষয়ে ক্ষয়ে মুছে আসছে, তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে, কোন এক অজ্ঞাত, অদৃশ্য সিঁড়ির ধাপে ধাপে ঘষা লেগে। এতদিন জানতো না, একটু আগে, এক মুহূর্ত আগেও জানতো না এই ধ্বনিই তার জীবন। এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিটুকু হারিয়ে গেলে মুছে গেলে সে আর বাঁচবে না।

আশা দেবী

১৯২৫ সালে কাশীধামে আশা দেবীর জন্ম। 'মহিলা' পত্রিকার প্রাক্তণ সম্পাদিকা॥

নিজের প্রথম গল্প প্রসঙ্গে / আশা দেবী

'মাধবী' গল্পটি আমার প্রথম লেখা গল্প। এটি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়। তখন কিছুদিনের জন্য রবিবাসরীয় আনন্দবাজার দেখবার ভার পড়ে প্রখ্যাত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাতে। তিনি আমাকে আনন্দবাজার সাময়িকীতে একটি গল্প দিতে বলেন।

আমি তো আনন্দে অধীর হয়ে যথাসম্ভব যত্ন সহকারে গল্পটি লিখলাম। কিন্তু আমার স্বামী শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মশায়কে লেখাটি দেখাতেই উনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

বললাম, পাশ মার্ক পাব?

উনি বললেন, গ্রেস্ মার্ক না দিলে পাশ হওয়া শক্ত

আমার মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল। বুক দুরদুর করতে লাগলো। বললাম, ছিঁড়ে ফেলবো?

উনি বললেন, নীরেন কবি মানুষ—ক্ষমা ঘেন্না করে ছাপলেও ছাপতে পারে। তবে সবই তোমার কপাল আর সম্পাদকের হাত যশ।

ওঁর সব কথাতেই এমনি ঠাট্টা করাই স্বভাব ছিল। কিন্তু ওতে আমি কিছু মনে করতাম না। জানি ওঁর চেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী আমার আর কেউ নেই। তাই ভয়ে ভয়ে কী করবো ভাবতে ভাবতেই আনন্দবাজারের দারোয়ান এসে হাজির। এবং লেখাটা নিয়ে গেল। ছাপাও হলো। কেমন লাগলো সে বিচার তো আপনাদের কাছে।

ভারি ভাল লাগছে এই মেঘভরা বিকেলটা। ঠিক এই মুহূর্তেই যদি কোন মন্ত্রবলে এসে পড়তো মাধবী—এই জঙ্গল—এই কৃষ্ণচূড়া ফুলের আগুন-ধরা বিকেল আর এই পানের বরোজের অন্ধকার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে ? ফুলে ফুলে ভরে গেছে বন, গাছে গাছে কিশলয়ের ফিকে সবুজ রঙে বনবাদাড় ঝক ঝক করছে। এই সময়ে, ঠিক এই সময়ে কী মাধবী আসতে পারে না, একবার আসতে—পারে না কোন মতে ?

না—পারে না পারা তার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। কিছুতেই নয়।

কিন্তু একদিন তো সে আসতে পারতো। আসতে পারতো নিঃসঙ্কোচে অবলীলাক্রমে। তাকে কে আসতে বলতো মাথার দিব্যি দিয়ে। কে তাকে বলতো বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে এসো তুমি এই কৃষ্ণচূড়া গাছতলায়—যখন গাছটায় লাগত ফুলের আগুন আর আকাশে থাকতো রক্তসন্ধ্যার আলপনা।

কাঠঠোকরার বাচ্চাটা ধরে দাও না। মাধবী অনুনয় বিনয় করতে লাগলো।

কি যে সব অসম্ভব বায়না। অত পরের পাখি কী ধরা যায় ? অসীম বলেছিল।

ঃ যায় বৈকি ইচ্ছে করলেই যায়। আর ইচ্ছে না থাকলেই যায় না। মাধবী জানিয়ে দিলে গম্ভীরভাবে।

ঃ ইচ্ছে থাকলেও সাধ্যি নেই—

ঃ নেই কেন ? মাধবীর কালো ধনুকের মত ভুরু কোঁচকালো।

ঃ এ তো বড় নাছোড়বান্দা মেয়ে। পাখী ধরতে গিয়ে শেষে প্রাণ দেব ?

কথাটা শুনেই হাসিতে ভেঙ্গে পড়লো মাধবী। চোখ দুটো তার দুষ্টুমিতে ভরা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের রাশি···দুলিয়ে দুলিয়ে বলেছে ঃ তবে রথের মেলা থেকে একটা ময়না কিনে দাও।

যেমন অকারণে হাসতে পারে মাধবী তেমনি পারে অসম্ভব বায়না ধরতে।

একটা হলদে ঠোঁটওয়ালা ময়না কিনতে বাধ্য করিয়েছে সে শেষে। সুকুমাসিমা—মাধবীর মা-আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন ময়নাটা একটা বাঁশের খাঁচায় দুলছে বারান্দায়। অসীমের পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে সুকুমাসিমার রান্নাঘরটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। সুকুমাসিমা অসীমের জানালার দিকে চোখ রেখে বলছেন, ময়না পাখী তো শুধু কিনে দিলে হয় না বাবা, ওর ছাতুর দাম কে যোগাবে ?

ইকনমিকস-এর বই থেকে মাথা তুলে অসীম বললে ঃ তাইতো তবে পাখীটা বড় ভাল মাসীমা আর দেখতেও তেমনি সুন্দর।

সবই তো বুঝলাম বাবা, কিন্তু পাখি এখন দেখবে কে ? মাধু তো এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিল। ভাবছি ওর পিসের কাছে লক্ষ্ণৌতে পড়তে পাঠাব কলেজে।

আর ওঁদেরও ওকে নেবার খুব ইচ্ছে। নিঃসন্তান পিসে পিসিমা আর অগাধ সম্পত্তি।—যাক্ থাক ওদের কাছেই।

নিঃসন্তান পিসে আর অগাধ সম্পত্তি—কথাটা অসীমের কানে বাজতে লাগলো যেন। এই ময়না,—এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ—এই বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াবার মেঘলা সন্ধ্যা—সবই মিথ্যে হয়ে যাবে মাধবীর জীবনে। ময়নাকে ওরা খাঁচা খুলে উড়িয়ে দেবে নীল আকাশে। আর সোনা-কানা ময়না পাবার আনন্দ মাধবীর একটা নিছক বায়নার মধ্যে মিলিয়ে যাবে অর্থহীন কৈশোরের চাপল্যের সঙ্গে।

মাধবী চলে যাবে।

: কেন? এখানে থেকেও তো কলেজে পড়তে পারে?

: তা পারে। তবে কি জানো, এখন থেকে পিসের কাছে থাকলে আখেরে সুবিধা আছে। আমি বিধবা মানুষ, ওই একটী মেয়েই আমার সম্বল। যদি ওর একটা গতি হয় তবে আমি বাকী জীবনটা কাশী গিয়ে কাটাব। আমারও বয়েস হয়েছে, এখন তো নিদেনের চিন্তাও করতে হয়।

অসীম চুপ করে গেল। বুকের ভেতরের গভীর অন্ধকারে কে যেন সূক্ষ্মতন্ত্রীগুলোতে টান দিচ্ছে সজোরে।—আর সে মাধবীর স্বর্ণময় ভবিষ্যতের কল্প-সৌধের বর্ণনা শুনতে পারবে না।

কেন এমন মন খারাপ হয়? তা কি অসীমই জানে? কেন কৃষ্ণচূড়া গাছতলায় বসে বসে মাধবীর সঙ্গে তার কথা বলতে এত ভালো লাগে? কেন মাধবীকে দেখলে তার সমস্ত মন ভরে ওঠে? কত দিন—কতবার ভেবেছে, মাধবীকে কী যেন একটা বলবে সে। কী যেন একটা কথা পানের বরোজের অন্ধকারে নিঃশব্দ কান্নার মত গুমরে গুমরে মরছে। যতক্ষণ মাধবী তার কাছে থাকে, থাকে একেবারে একান্ত হয়ে পাশে বসে, ততক্ষণ তার কিছুই মনে পড়ে না। যখন ফিরে যাবার জন্যে চঞ্চল আলতাপরা পা দুটো আলতোভাবে নতুন দুর্বার ওপর ফেলে ফেলে চলে—, চলে মাথা নেড়ে নেড়ে, ঠিক তখনই যেন মনে হয়—ওই যা আজও তো বলা হলো না। তা নাই বা বলা হলো। এখনও অনেক সময় আছে। মাধবী এখন অনেক ছোট। যদি তার কথা শুনে বসন্তের দমকা হাওয়ার মত আবার হেসে ওঠে মাধবী। আবার যদি—।

না বলা যায় না, মাধবীকে। বলা যায় না কিছুতেই। এই কৃষ্ণচূড়া গাছতলায়—এই ভাঁট ফুলের আরণ্যক গন্ধের মধ্যে আর মেঘলা আকাশের সামিয়ানার তলায়। তবে? তবে যদি বলা না হয় তাহলে? তাহলে পানের বরোজের আবছা অন্ধকারে সব থমকে পড়ে থাকবে—কোনো দিন আলোয় বেরিয়ে আসতে পারবে না।

: তুমি তবে চলেই যাবে মাধবী? অসীম এক পা সিঁড়িতে আর এক পা উঠোনে রেখে জিজ্ঞাসা করল।

: হ্যাঁ, যাব। পিসেমশাই তো নিতেই এসেছেন আমাকে। ওই দেখ না ওঁর টুপি আর কী সুন্দর সুটকেশ। জানো, আমরা কাল সন্ধেয় চলে যাব। পিসেমশাই একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব—দেখ না সুট টুপি সব। আমার জন্যে কত সুন্দর সুন্দর শাড়ী ব্লাউজ

কিনেছেন। আমার হাতে ভালো বালা নেই তাই এখুনি মাকে সঙ্গে নিয়ে একজোড়া খুব সুন্দর বালা কিনতে গেছেন।

ঃ তুমি কি সত্যিই যাবে মাধবী? এখানে থেকে কি পড়াশুনা করা একেবারেই অসম্ভব? অসীম বারান্দার ওপর বসে পড়লো।

ঃ না আর তা হওয়া সম্ভব নয়। অতদূর থেকে নিতে এসেছেন—, আর মায়ের খুব ইচ্ছে। এখানে থাকাতেই তাঁর আপত্তি।

ঃ আপত্তি কেন?

ঃ আপত্তিই তো! একশোবার আপত্তি। বলেন, এখানে থাকলে নাকি আমার পড়াশুনা হবে না। এখানে নাকি আমি কেবল বনে বনে পাখি ধরে আর পেয়ারা খেয়ে বেড়াব।

ঃ পেয়ারা খেয়ে বেড়াবে কেন? এখানেও বেশ পড়া যায়। তুমি যেও না—সুকুমাসিমাকে বুঝিয়ে বল।

ঃ অনেক করে বুঝিয়ে বলেছি। কিছুতেই শোনে না। বেশী বললে আবার রেগে যায় ভীষণ।

ঠোঁট দুটো একটা অব্যক্ত বেদনায় কাঁপতে থাকে অসীমের।

ঃ তুমি কিছু বলবে? কিছু বলবে আমাকে?

ঃ কিছু বলবে? হ্যাঁ, কিছু বলবে বৈকি, বলাই তো উচিত। কিছু বলবার জন্যেই তো কত চেষ্টা—, কত আয়োজন। কিন্তু কেন সে বলতে পারছে না? মাধবীর কাছে এলেই কেমন যেন হয়ে যায় অসীম। কিছুতেই বলতে পারে না। তার সেই বলবার কথাটা।

এই মেঘলা আকাশ। এই টিপটিপে বৃষ্টির ছিটে তার হরিণের চামড়ার চটিটার ওপর এসে পড়ছে। বর্ষার জলের এলোমেলো ছাট লেগে ময়নাটা চেঁচাচ্ছে। ঘরমুখো পায়রাগুলো ভিজে ভিজে সারা হচ্ছে। এমনি সময়েই তো বলা যায়। বলা যায় তার ও সব না বলা কথা। আজ শূন্য বাড়ী। এত সুযোগ—তবুও সব বেধে যাচ্ছে। না—, বলা যায় না এখনও। এখন মাধবী বড় ছোট—, বড় ছেলেমানুষ। যদি ওর কথা শুনে তার মুক্তোর মত দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে রাশি রাশি হাসির [illegible] করে ওঠে? যেমন করে বর্ষা আসে। দামাল মেয়ের মত এলোচুল ছড়িয়ে তেমনি করে যদি তার কথা শুনে ছুটে পালায় মাধবী বৃষ্টির সোঁদাগন্ধেভরা মাঠের দিকে? তখন? না—এখনও বলা যায় না। এখনও ও ভারী ছোট একেবারে ছেলেমানুষ।

ঘরের মধ্যে থেকে আজ সমস্ত দিন বেরুল না অসীম। শুয়েই রইলো। খোলা জানালাটা দিয়ে আকাশের বিশৃঙ্খল মেঘের আনাগোনা চলেছে। শুধু অর্থহীনভাবে চেয়ে রইলো সে দিকে। মাঝে মাঝে তন্দ্রার মত ঘুমও এসেছিল যেন।

মা ঘরে এসে সন্ধে জ্বালালেন।

ঃ একি রে ভর সন্ধ্যেবেলায় শুয়ে আছিস?

ঃ এমনি! অসীম সংক্ষেপে জবাব দিল।

ঃ জ্বরজারি নয় তো ? মা মাথায় হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করলেন। তারপর ঘরের লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর তুলে একটু কমিয়ে দিলেন ; আর শুয়ে থাকিসনে। ওঠ—। মাধুটা চলে যাবে বলে বার বার দেখা করতে এসে ফিরে গেল। তোর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে আমি ভাবলাম তুই বেরিয়েছিস বুঝি। মেয়েটা কতক্ষণ বসে রইলো বারান্দার ওপর—। এই তো গেল এখুনি—ওর মার ডাকে।

ঃ কখন এসেছিল ? ডাকনি কেন ? অসীম একলাফে বিছানার ওপর উঠে বসলো।

ঃ অতটুকু মেয়েটাকে কেনই বা ওর মা পাঠাচ্ছে বিদেশে অসীম চুলগুলোর মধ্যে চিরুণী চালাতে চালাতে বলল।

ঃ এতটুকু ! তুই কি বলিস অসীম ? এই ফাল্গুনে ওর ষোলবছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এই বয়েসে তো আমি তোদের বাড়ীর এত বড় সংসার মাথায় নিয়েছি।

কে যেন একটা চাপা পাথর তার মনের ওপর থেকে সরিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাঁ, সত্যিই তো। মাধবী এখন ষোল বছর। এই বয়েসে মাও তো সংসার মাথায় নিয়েছেন। সেও তো পারে তার মার মত আর একটা সংসারের ভার। কথাটা তো সে কখনও ভেবে দেখেনি। যে মাধবীর এখন ষোল বছর হয়ে গেছে।

ছুটে এক ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাধবীদের বাড়ীতে। যেন হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য সত্য আবিস্কার করেছে। প্রায় দৌড়েই যখন সে মাধবীদের দরজায় এসে দাঁড়াল তখন ট্যাকসিটা চলতে সুরু করেছে। মাধবী যেন চলন্ত মোটর থেকে গলা বের করে অসীমের দিকে তাকাল একবার।

অসীম বিকেলের রক্তসন্ধ্যার আলোয় দেখল টলটল করছে মাধবীর দুচোখে ভরা জল। এখন আর সে ছেলেমানুষ নয়—তার ষোল বছর হয়ে গেছে। এ বয়েসে সে ইচ্ছে করলে সংসার মাথায় নিতে পারে। এত কাছে ছিল তবু অসীম একবারও বোঝেনি যে সে আর ছোট্ট মেয়েটি নেই।

এই মেঘে ঢাকা সন্ধ্যা আর কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে যখন সে প্রথম উপলব্ধি করলো সত্যটা আর মাধবীর দুচোখ ভরা জল—তখন মোটর-স্টেশনের পথ ধরে ছুটে চলেছে। সাতটা পঁয়তাল্লিশের গাড়ির প্রথম ঘণ্টাটা বেজে-উঠেছে।

আশাপূর্ণা দেবী

জীবনের প্রথম গল্প / আশাপূর্ণা দেবী

লেখার হাতেখড়ি শিশুসাহিত্যে। প্রথম লেখা (কবিতা) ছাপা হয় 'শিশুসাথী' পত্রিকায়। তারপর বেশ কিছুকাল শিশুসাহিত্য নিয়েই কলম ঘষেছি। বড়দের লেখায় হাত দিই হাতেখড়ির অনেক দিন পরে।

কাজেই 'জীবনের প্রথম গল্প' সম্বন্ধে গল্প দিতে ছোটদের গল্পই দিতে হচ্ছে। তবে বাংলা ১৩৩৬ সালের 'বার্ষিক শিশুসাথী'তে প্রকাশিত এই 'সোনার শিকল' গল্পটি যে আমার নিঃসংশয় 'জীবনের প্রথম গল্প' বলে দাবি করতে পারে কিনা ঠিক মনে হচ্ছে না, ছোটখাটো কিছু কিছু লেখা অবশ্যই কালের কবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে বড়সড় আস্ত একটি গল্প হিসেবে এটিকেই 'প্রথম' বলা চলে।

ওই গল্পটি এই পঞ্চাশ বৎসরকাল বার্ষিক শিশুসাথীর পৃষ্ঠাতেই বন্দী ছিল, কোনো সংকলন গ্রন্থে দেওয়া হয়নি। হয়তো 'ছেলেমানুষী'র নমুনা বলে মনে হয়েছিল। অথবা খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রকৃত কারণটা মনে পড়ছে না। পঞ্চাশ বছর পরে এটি দ্বিতীয়বার আলোর মুখ দেখল।

এক দেশের এক রাজপুত্তুর। বেজায় তাঁর শিকারের সখ,—শিকার পেলে তিনি আর কিছু চাননা।

একদিন শিকার করতে গিয়ে এক হরীণের পেছনে ছুটতে ছুটতে তিনি ফেললেন বনের মধ্যে পথ হারিয়ে, সঙ্গী সাথী যে কে কোথায় রইল, তার আর সন্ধান নেই। এদিকে সন্ধ্যেও হয়ে এসেছে ; কি করেন, শিকার করা হরীণটাকে একটা গাছের তলায় ফেলে রেখে, ঘোড়াটাকে গাছের গুড়িতে বেঁধে রেখে, রাজপুত্তুর এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন।

হঠাৎ কানে এল এক মিষ্টি বাঁশীর সুর। যেন সেই সুরে গাছের পাতা, নদীর জল, সব শিউরে শিউরে উঠছে! সুর ক্রমেই নিকট হয়ে এল।

বনের পথ বেয়ে, একটা ছেলে আসছে—রাখালের বেশ, মাথায় পাখীর পালক গোঁজা, গলায় বনফুলের মালা, হাতে বাঁশী। রাজপুত্তুরকে দেখেই সে বাঁশী থামিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

রাজপুত্তুর বললেন—বা! বেশতো, বাজাও! এই বনের মধ্যেই তুমি থাক নাকি?

ছেলেটি হাত তুলে বলল—ও—ই যে হোথায় বাঁশঝাড়টার ওপরে আমাদের ঘর। তুমি বুঝি পথ হারিয়েছ?

রাজপুত্তুর বললেন—হ্যাঁ, পথ হারিয়েছি, সঙ্গীদিগকেও হারিয়েছি—ভারী মুস্কিল!

ছেলেটি হেসে বলল—আজ বুঝি কেবল হাবাবারই পালা। আমিও পোষা হরীণটিকে হারিয়ে ফেলে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার বাঁশী শুনলেই সে ঠিক আসবে।

রাজপুত্তুরের প্রাণটা কেঁপে উঠলো, তাঁর মারা হরীণটা নয়তো? রাজার ছেলের গর্ব্ব এই রাখাল ছেলেটির সামনে কেমন যেন নুয়ে পড়ল, তিনি ভয়ে ভয়ে একবার সেই গাছতলার দিকে তাকালেন সঙ্গে সঙ্গে রাখাল ছেলেটির দৃষ্টিও সেইদিকে পড়ল।...

তখন চাঁদ উঠেছে, গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার টুকরো এসে মৃত হরীণের রক্তমাখা দেহে ছড়িয়ে পড়ে কি যেন একটা ভয়ঙ্কর ভাব জাগিয়ে তুলছিল। দুজনের বুকই শিউরে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে মরা হরীণের গায়ে আছড়ে পড়ে রাখাল ছেলেটির সে কি কান্না! সে কান্না শুনে বনের পশুপক্ষী, গাছপালা, নদীর জল, আকাশের চাঁদও যেন নিথর হয়ে ম্লান হলো।

রাজপুত্তুরও কেঁদে ফেললেন। পশুর রক্ত চিরদিন যাঁর অন্তরে আনন্দেরই সৃষ্টি

করেছে আজ সেই হৃদয় রাখাল ছেলের কাতর কান্নায় গলে গেলো। তিনি তার হাত ধরে অনেক করে ক্ষমা চাইলেন।

রাখাল ছেলে তার অনুতাপ দেখে ক্ষমা না করে থাকতে পারল না।

তখন দুজনে সেই খোলা আকাশের তলায়, মুক্ত উদার প্রান্তরে চাঁদকে সাক্ষী মেনে হাতে হাত রেখে বন্ধুত্ব পাতালেন। রাখাল ছেলে মরা হরিণটি সস্নেহে বুকে তুলে নিয়ে আগে আগে চললো, রাজার ছেলেও ঘোড়া খুলে নিয়ে তার পিছন পিছন চলতে লাগলেন।

ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘর—কৃষকের বাড়ী। কিন্তু রাজার ছেলে সেই ছোট্ট কুঁড়েখানি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চাঁদের আলোয় তকৃতকে ঝকৃঝকে বাড়ীটি যেন হাসছে। ঝর্‌ঝরে মেটে উঠোনটিতে গোটাকতক ফুলগাছ—একেবারে ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে!

রাজার ছেলের মনে হল তাঁদের রাজপুরীর বিশাল বাগানের সৌন্দর্য্য এর কাছে কত তুচ্ছ। রাখালের মা—মা আর ছেলে—আর কেউ নেই। রাখাল ছেলেটির মায়ের প্রাণভরা কত স্নেহ ও মমতা।

রাজপুত্তুরের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। সেই একশো দাসী যেন তাঁর মাকে ঘিরে থাকে—তাদের দেখেই ভয় হয়। আর এই নেহাৎ সাদাসিধে মাকে যেন সত্যি আপন বলে মনে হয়।

তিনি দু'জনকেই এমন আদর করে কাছে ডাকলেন যেন দুটিই তাঁর ছেলে। গরীবে ঘরের খাবার আয়োজন নিতান্তই সামান্য, কিন্তু রাজার ছেলের মুখে লাগল যে অমৃত! রাতদিন দাসী চাকরের খবরদারীতে, যাঁর জীবন কেটেছে, তাঁর কাছে আজ এই সত্যিকার মার স্নেহটুকু যেন স্বর্গের মন্দাকিনীর মতই মনে তৃপ্তি ঢেলে দিল। মেটে ঘরের মেঝেতে জীর্ণ শয্যায় শুয়ে যে আরাম তিনি পেলেন, সোনার খাটে আর মখমলের বিছানায় শুয়েও তিনি জীবনে কখনো সে আরাম পাননি।

পূর্ব্বের অভ্যাসমত সকালবেলা রাজকুমারের যখন ঘুম ভাঙল, তখন রাখাল ছেলে উঠে নিজেদের কাজে এসেছে। রাজার ছেলে রাখাল ছেলের মা'র কাছে বনের ফল-মূল আর কপিলা গাইয়ের মিষ্টি ঘন দুধ তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে নিজের সঙ্গী সাথীদের খোঁজবার চেষ্টায় বেরোলেন।

রাখাল ছেলে ততক্ষণে বনফুলের মালা পরে মাথায় পাখীর পালক গুঁজে, বাসন্তী রঙের চাদর উড়িয়ে সেজে গুজে উপস্থিত হল রাজবন্ধুকে এগিয়ে দেবে বলে।

বনের সীমানা পার হতেও হল না। রাজপুত্তুরের দেশ থেকে একদল লোক হাতি ঘোড়া, সেপাই শান্ত্রী নিয়ে বনের পথে আসছে দেখা গেলো। সকলের শেষে আসছে একটি সুন্দর শ্বেত হস্তীকে সুন্দর করে সাজিয়ে তার পিঠের হাওদায় মতির ঝালর ঝুলানো রাজকুমারের সোনার সিংহাসন পেতে বুড়ো মন্ত্রী মশাই। চুল কাঁচা বুদ্ধি পাকা ধরণের কয়েকজন রাজ-সভাসদ সঙ্গে এসেছে—দেখেই তো রাজার ছেলের বুক উঠল কেঁপে—কি ব্যাপার?

খানিক কান্নাকাটির পর মন্ত্রীমশাই জানালেন,—মহারাজা স্বর্গীয় হয়েছেন কাজে

যুবরাজই স্বয়ং রাজা। বুড়ো মন্ত্রী কাজে ইস্তাফা দিয়ে তীর্থে যাবেন, কাজেই একজন নূতন মন্ত্রী যেন তিনি খুঁজে নেন।

রাজকুমার পড়লেন বিপদে, হঠাৎ মনের মত মন্ত্রী বাছাই করাও তো সহজ নয়। প্রবীণ সভাসদদের অনেকেই মনে মনে মন্ত্রীপদের আশা পোষণ করতেন, কিন্তু নতুন রাজা বুড়ো সকলকে নিরাশ ক'রে তরুণ রাখাল ছেলেটিকেই নিজের মন্ত্রী করে নিলেন।

সকলে তো অবাক! এযে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতোই হলো এই ব্যাপার। রাখালের ছেলে—সে কিনা মন্ত্রী! এ যে ছাগল দিয়ে লাঙ্গল টানার মতোই হাস্যকর ব্যাপার!

রাজপুরীর এই ঐশ্বর্য সমারোহ আর বিপুল কোলাহলের মধ্যে সরলপ্রাণ রাখাল বালকের প্রাণ উদাস হয়ে যেতো। মনে পড়তো, তার শ্যামল স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘেরা পাতার কুটিরখানি, চিকন কালো কপিলা গাইটি, নদীর তীর, বনের পথ, পাখীর ডাক, চাঁদের আলো, আর তার সেই দুখিনী মা, যিনি তাঁর বুকের ধনটিকে ছেড়ে উদাসপ্রাণে দিন গুনছেন।

সেদিনটা ছিল শুক্লা একাদশীর রাত। আকাশের বুকে স্নিগ্ধ চাঁদটি তার উজ্জ্বল আলোর ধারা ছড়িয়ে পৃথিবীর বুক আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে। রাজবাগানের একটা অশ্বত্থ গাছের ডালে বসে কোন্ একটা নাম-না-জানা পাখী মিষ্টি করুণসুরে সারা বন ব্যাকুল করে তুলছে। নূতন আমের বোলের সুগন্ধে মেতে বাতাসটাও যেন মাতোয়ারা। নূতন রাজা তখন মন্ত্রণাগৃহে বসে কি ভাবে তিনি নূতন নূতন রাজ্য জয় করবেন, তারই ফন্দি আঁটছেন।

ডাক নূতন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী এলেন, হাতে তার রাজার দেওয়া শিরোপা, আর মন্ত্রী হওয়ার সাজসজ্জা।

রাজা বললেন—কি বন্ধু?

রাখাল ছেলে সেই সাজসজ্জা মাটিতে নামিয়ে রেখে ধরে ধরে বললে—বন্ধু, বিদায় দাও!

রাজা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সে কি বন্ধু! কেন এ অভিমান! কে কি বলেছে?

"কেউ কিছু বলে নি বন্ধু। তোমার দেওয়া এ গৌরবের ভার আর আমি বইতে পারছি না। আমায় ছুটি দাও, আমার মায়ের কোলে ফিরে যাই।"

"—আচ্ছা সখা, তুমি তোমার মাকে নিয়ে এসো না, তা হলে তো আর কোনো ভাবনাই থাকে না?"

রাখাল ছেলে হাসলে, "বন্ধু, এখানে এলে দু'দিনেই মা আমার শুকিয়ে যাবেন। মা কোরো সখা! তোমার এ পাষাণপুরীতে সব আছে, শুধু নেই প্রাণ। এখানকার বাতাসটাও যেন বন্দী, ভয়ে ভয়ে আসে, চুপি চুপি যায়! এখানে থাকলে দু'দিনেই আমি পাগল হয়ে যাব—আমার চাই মুক্তি, প্রাণভরা মুক্তি.....।"

রাজ-ঐশ্বর্য, মান-সম্ভ্রম ধুলোর মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বনের দুলাল তার রঙ্গীন উত্তরীয় উড়িয়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে বনে ফিরে এল।

রাজার প্রাণটাও এক মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো সুদূর বনের উদ্দেশে,—

মনে পড়ল, সেই একদিনের পাওয়া সরল সুন্দর জীবন ! যেখানে একটা তুচ্ছ হরীণ শিশুর রক্ত মানুষের চোখে অশ্রুর ধারা বহায়। আর এখানে মানুষের রক্তপানের কল্পনায় মানুষের কি উল্লাস ! বন্ধু সত্যইবলেছে হৃদয়হীন এই পাষাণপুরী। আমার ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গী নিই এখানের এই ঐশ্বর্যের বোঝা ঝেড়ে ফেলে হাল্‌কা হয়ে।

কিন্তু হায় ! রাজার পায়ে যে সোনার শিকল বাঁধা। রাখাল ছেলে যা অনায়াসে ফেলে চলে যেতে পারে, রাজার ছেলের তা ছাড়বার সাধ্য কই ! উতলা মনকে টেনে এনে এই কঠিন কর্তব্যে নিযুক্ত করতেই হবে। তিনি আবার হিসাবের খাতা খুলে কাজে মন দিলেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য ক্ষেত্রে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যেমন জনপ্রিয় তেমনি শংকর উপাধ্যায় ও শ্রীবাসবও সুপরিচিত। এই দুটি নামই শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। ১৯২০ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে আশুতোষ বাবুর জন্ম। আজও ইনি যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে জড়িত।

নিজের গল্প প্রসঙ্গে নিজে / আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৯৫০।৫১ সাল হবে সেটা। ফিলিপস ইলেকট্রিক্যালে রিপ্রেজেনটেটিভ এর ভালো এবং পাকা চাকরি পেয়েছিলাম। সে সময়ের হিসেবে বেশ ভালো মাইনে, চাকরিটা পাওয়ার ফলে বাড়িতে আনন্দের হাট বসেছিল। কিন্তু কানপুরে বদলি হওয়ায় আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল, বাইরে গেলে লেখক জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে এই আশংকা। দুম করে অত সাধের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসলাম, বাড়িতে শোকের ছায়া। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গল্পটি লেখা।

গল্পটি পড়ে তৎকালীন যুগান্তর সাময়িকী সম্পাদক পরিমল গোস্বামী শারদীয় যুগান্তরে ছেপেছিলেন। তবে আগে ফীচার লেখক হিসেবে পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ।

পুরুষমানুষের চোখে সচরাচর জল দেখা যায় না। বিশেষ করে যে মানুষ [illegible]জ সকালে কানে তুলো গুঁজে আর চোখের পাতা দুটো কেটে নিয়ে তবে কাজে [illegible]বে।

কিন্তু সেদিন রাতের গভীরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে যে মানুষটার দু'চোখ [illegible]য়ে জল গড়ালো নিঃশব্দে, সে যে শুধু পুরুষ তাই নয়, কালে জলে মার খাওয়া [illegible]বিকল পুরুষ।

কাহিনীর নায়ক আমি নিজে। নায়িকা আমারই শ্রীমতী। ঘটনাস্থল শহর [illegible]লকাতা। রঙ্গমঞ্চ, অসূর্যম্পশ্যা নীলমণির গলি সংলগ্ন নোনাধরা বাড়ির একতলার [illegible]কটা ঘর।

আগে নায়িকার কথা বলি। মালবিকা নবনীতাদের কেউ নয়। বাপমায়ের [illegible]দরের হাসি নামটাই চলতি। সপ্রগল্ভ নিভৃতে হাস্যমুখি বলে ডাকলে রাগ [illegible]বে। অর্থাৎ খুশি হয়। সম্প্রতি মারমুখি নামটাও ওকে মানায় ভাল। কিন্তু [illegible]কে কে।

রূপগুণ—?

নিরাশ হবেন। এমনি অজস্র আছে আমার চেনাশুনা সকল ঘরে। তেমন হাসি [illegible]লে কুটনো ফেলে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে, আমার ওপরে রাগলে লাগাম ছেড়ে [illegible] রসনার, অন্যের বেলায় শাড়ির আঁচল চোখে ওঠে।

তারপর পার্শ্ব চরিত্র। তাঁরা আমার বাবামা, দাদাবৌদিরা, নিচের দিকের আরো [illegible]টা ভাইবোন, দাদাদের ছেলেমেয়েরা এবং নিজের ছেলে। এই প্রহসনের সবাক [illegible]বা নির্বাক ভূমিকায় সকলেরই অংশ আছে।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না। কিন্তু আমাদের ভাগের টাকা ছাড়া সংসার পতিতপাবনীর পাওয়া ভার। বাবার পেনসান এবং ভাইদের রোজগারের ভগ্নাংশের সমাধিতে [illegible]ার-তরণী বহন করছেন মাতৃদেবী। অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাঁকে স্বয়ং অর্থসচিবের [illegible]তিস্পর্ধিনী বলে মানা।

আমার বরাদ্দ মাসিক পঁচাত্তর টাকা। এবং যত গোলযোগ এইখানেই। মোট কথা, [illegible]স পঁচাত্তর টাকা আমি প্রায়ই দিয়ে উঠতে পারিনে এবং সে জন্যে অপ্রিয়ভাষিণী [illegible]তেমার মেঘমূর্তিরও পরোয়া করিনে। কারণ, মাতৃদেবী সহৃদয়া। আমাকে এক [illegible]ম বাদ দিয়েই তিনি মাসের বাজেট কষে থাকেন।

গোড়াতে নিজেকে চোখ-কান কাটার অপবাদ দিয়ে রেখেছি। বাংলা কাগজে জাতীয় অর্ডারি লেখা সরবরাহ করেও পারিশ্রামিক আদায়ের ছলাকলা যে শেখেনি

তাকে ভাগ্যহত বলব। তারপর টোট্‌কা ঔষুধের বিজ্ঞাপন লিখেও চোখ-কানের পর্দা
আর এক দফা সংস্কার ঘটেছে। ঔষুধের ধন্বন্তরিকে প্রতিবারই সবিনয়ে আশ্বা
দিই, বিজ্ঞাপনের দাপটে সমস্ত কলকাতায় তাঁর রোগীর ছড়াছড়ি পড়ে গে
বলে। কিন্তু মাসের শেষে ওই পঁচাত্তর টাকা আর তুলে উঠতে পারিনে।

প্রকাশকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিনয়-বিনম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি, হবে?

ঝাঁঝিয়ে ওঠেন কেউ, এত ঘন ঘন তাগিদ দিলে হবে কেন, এই সেদিন না নিয়ে গেলেন কিছু?

সেদিন অর্থাৎ দু'মাস আগে।

কেউ বা বলেন, সের দরে আমার লেখা বেচে দিলে একেবারে হিসেব দিতে পারেন যত ঝামেলা, ইত্যাদি—

আমি নির্বিকার। বিনয়ের হোমিওপ্যাথি সংস্করণ।

তারপর মাসিক এবং সাপ্তাহিকের পরিবেশ, এ পর্যায়ের কুলীন গোষ্ঠীবর্গকে সভ
পরিহার করে চলি, শুনতে পাই, সেখানে অপ্রথিতযশার লেখা ছাপতে হলে তেলে
কারখানা থাকা দরকার। আমার রাজত্ব পোশাকী-সম্পাদকের ছোট দপ্তরে। সেখা
দু'কথা শুনি দু'কথা শোনাই এবং ঝগড়া করে তর্ক করে দু'পাঁচ টাকা আদায়ও করে নি
আসি। টাকা দিয়ে ফেলে সেখানকার সম্পাদকরা রাগের মাথায় শাসিয়ে দেন প্রায়ই
আর আমার লেখা ছাপা হবে না, এই শেষ।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরি। মুখহাতে বেশ করে জল দিয়ে চেষ্টা করি দিনের গ্লানি ধু
ফেলতে। লেখার কাগজপত্র এবং একমাত্র সঞ্চয় বইগুলির নিবাস ঘরের কোণের ছো
আলমারিটাতে। এর বাড়ীতে ওটাও আমারই মত পঙ্‌ক্তি-হারা, ব্রাত্য, বেশী রা
হলে হাসি ওর গায়ে তালা লাগায়, কিন্তু আমার বোবা ধড়ফড়ানি দেখে নিজেই আবা
খুলে দেয় শেষ পর্যন্ত।

তারপর বাতাস উঠুক, তুফান ছুটুক, আমার কানে তুলো, পিঠে কুলো।

গোড়ায় গোড়ায় আমার লেখার প্রতি সকৌতুক আগ্রহ ছিল সকলেরই, হাসির
এবং স্থৈর্য বিড়ম্বিত হয়েছে অনেক পরে। কিছুকাল আগেও ছাপা অক্ষরে লেখা পড়ে
সগর্বে ভাবত, রসসৃষ্টির যত কারিগরি এবং ভাষা-বণিকের যত চাতুরীর ফল্গুধা
আমারই কলমের ডগায়।

কিন্তু 'ফুরালো দিন কখন নাহি জানি...।' নিরুপায় হয়ে এক এক সময় ঝগড়
করি।—কি করব বলো, চাকরি? কেউ দেবে না।

ব্যবসা—? আমার একমাত্র মূলধন তো তুমি।

তবু মেজাজ ওর ক্রমশই বিগড়াচ্ছে। শাড়ি না, গাড়ি না, গয়না না, সিনেমা না, নিয়মিত হাত খরচাও না। এর পরে একটু বকাবকি করতে না পেলে ওর অসুখ করাও তা বিচিত্র নয়। বিধাতার যোগাযোগ এমনি, এর জন্য সুযোগ খুঁজতে হবে না অতিবড় [সু]হৃৎজনেরও। লেখার ঝোঁকে হয়ত ওরই পরিত্যক্ত শাড়ির আঁচলে কলমের মুখ [উ]পছানো কালি মুছে রেখেছি, নয়তো ব্লেড-এ ছেলের নখ কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে [ব]সে আছি, অন্যথায়, তার সর্দি-জ্বর ভুলে বেশ করে তেল মাখাতে বসেছি, চান [ক]রাবো—। পরের সকারুণ অবস্থাটা পাঠকবর্গের অনুমানের ওপরে ছেড়ে দিলাম।

পূর্ব-ভাষণের এখানেই শেষ।

সেদিন সন্ধ্যায় বাগ্‌বাদিনীর আরাধনায় প্রস্তুত হয়ে কাঠের আলমারির সামনে [ব]সে দেখি তালা লাগানো। শ্রীমতী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। অনুনয় করে বললাম, [কৌ]তুক রাখো কৌতুকময়ী, আজ আমার তাড়া আছে।

বাতায়নবর্তিনী নির্মম, নিশ্চল।

কি হল ?

ঘুরে দাঁড়ালো, তুমি চাকরির চেষ্টা দেখবে কি না ?

ঘাবড়ে গেলাম।—দাদারা কিছু বলেছে ?

ও ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রায়, কি—?

তাড়াতাড়ি সামাল দিলাম, তবে কি বৌদিরা ?

এমন দাদাবৌদি তোমার, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে লজ্জা করে না ?

ভাবনায় পড়া গেল। মা কিছু বলবেন না জানি, দাদাবৌদিরাও লোক ভালো, [আ]মিও আর যাই হই, মানুষ খারাপ নই—তবে আলমারির গায়ে তালা কেন ! কিন্তু [ও]র মুখের দিকে চেয়ে আর জিজ্ঞাসাবাদের সাহস হল না।

চৌকিতে অর্ধশয়ান, প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু বিধি নিতান্তই অপ্রসন্ন।

রাতের আহার সম্পন্ন করে আবার শয্যা নিলাম। আলমারির পুঁথিপত্র রোজ [এ]কবার করে নাড়াচাড়া করা ন'বছরের অভ্যাস। অস্বস্তি লাগছে কেমন। মনে হচ্ছে [কো]ন কাজটা যেন বাকি।

রাত বাড়ছে। মাঝখানে ছেলে ঘুমিয়ে। ওপাশে তার মাও আশ্রয় নিয়েছে। [থে]কে থেকে এক একটা বড় নিঃশ্বাস এবং চুড়ির শব্দ শুনি। অনেকক্ষণ বাদে ছেলের [মা]থা ডিঙিয়ে একখানা নরম হাত বাহু স্পর্শ করল।

ঘুমুলে ?

বললাম, না—।

রাগ করেছ ?

না।

আচ্ছা, তুমি এমন কেন গো, আধ ঘণ্টায় আসর জমাতে পারো, আর একটা চাকরি [যো]গাড় করতে পার না ?

নিদাঘ-রজনীর নিভৃতি প্রহরে এক মুহূর্তে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল কোথা দিয়ে। অটুট সঙ্কল্পে রাত কাটালাম, প্রকাশক না দিক, প্রয়োজন হলে আলমারির পুঁথি-পত্র আমিই বেচে দেব সের দরে।

তৈল-সিঞ্চনে পাথর ভেজানোর ইতিবৃত্ত বাদ দেওয়া যাক। বিলিতি ল্যাম্প-ফ্যাক্টরীর ছোট ম্যানেজার মাসতুত ভাই। চিঠির সুপারিশে তাঁর ওপরওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন সেলস্ লাইন-এ চাকরির জন্যে।

তারপর ধার করতে বেরুলাম। টাকা নয় পোশাক। পায়ের জুতো থেকে মাথার টুপি পর্যন্ত।

হাসির কথামত আধ ঘন্টায় আসর জমাতে চেষ্টা করেছি সাহেবের মুখোমুখি বসে। ছোট ম্যানেজারের সুপারিশে হোক অথবা যে কারণেই হোক অতিবড় সংশয়বাদীও ফলাফল সম্বন্ধে আশান্বিত হবেন। বিদায়ের আগে সাহেব জিজ্ঞাসা করে রাখলেন কলকাতার বাইরে যেতে রাজি আছি কি না। অম্লানবদনে জানিয়ে এলাম। ভারতবর্ষের বাইরে যেতেও আপত্তি নেই।

ইতিমধ্যে আর এক কলমও লিখিনি। বইয়ের আলমারিটা অদৃশ্য আকর্ষণে টানে বার বার। কিন্তু না, ও-পর্বের যবনিকা টেনে দেবই। হাসি আর আমি সাহেবের প্রতিটা কথা ওজন করি বার বার, ওতে চাকরি হওয়া সম্ভব কি না। দু'টাকা খরচ করে দরজার গায়ে লেটার-বক্স লাগালাম একটা, নিয়োগপত্র না হারায়। মাসতুত ভাইয়ের কাছে ছুটি তিনবার করে।

অবশেষে, আয় ছুটে আয় চোখের বালি, চিঠি এসেছে—।

মাদ্রাজ প্রভিন্স-এর সেলস্ অর্গ্যানাইজার নিযুক্ত হয়েছি। এক মাস কাজ শেখার পরে সেখানে রওনা হতে হবে, বেতন তিন শ'। ভবিষ্যৎও সুবর্ণোজ্জ্বল।

বাবার মুখের দুশ্চিন্তা কাটল। মা প্রসন্ন হাসি হাসলেন। বৌদিরা উৎফুল্ল মুখে ঘোষণা করলেন তাঁরাও মাঝে মাঝে যাবেন বেড়াতে। মা বাড়িয়ে তুললেন শ্রীমতীকে, ভাগ্যে ওর মত মেয়ে সঙ্গে থাকবে, নইলে কি যে হত বিদেশে বিভুঁইয়ে, ইত্যাদি একগাল হেসে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল, দাদা বলেছিলেন, গায়ের রঙ কালো হয় মাদ্রাজে মাগো এমনিতেই তো রঙ তেমন ফরসা নয় আমার।

আশ্বাস দিলাম, সেখানে যাঁদের মনোহরণ করবে তাঁরাও কালোই হবে বোধ করি।

শিক্ষানবিশীতে লেগে গেলাম। দাদারা চাঁদা তুলে কোট প্যান্ট নেকটাইয়ের খরচা যোগালেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্যাটালগ ঘেঁটে ল্যাম্পের নাম মুখস্থ করলাম দিনকতক। কোম্পানীর গাড়িতে বাজারে ঘুরে ঘুরে দালালি রপ্ত করলাম সকাল সন্ধ্যা।

রাতে বাড়ি ফিরে প্রথম চোখ পড়ে কোণের আলমারিটার ওপর। এখন একাই পঙক্তিহারা ওটা। আমি জাতে উঠেছি। ক্রূর শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ওটার দিকে। কতক্ষণ ঠিক নেই। হাসির ডাকে চমক ভাঙে, হাত মুখ ধোবে না ?

ইলেকট্রিক ল্যাম্পের দালাল আমি এ মন্ত্র অনুক্ষণ জপ করি মনে মনে। কিন্তু কলম হাতে নিলেই হাত নিশপিশ করে কেমন। সেদিন আলমারিটা ঘর থেকে বার করে দিলাম। ন'বছরের অভ্যস্ততা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো ওটার সঙ্গে। হাসি দেখল চেয়ে চেয়ে। রাত্রিতে বলল, সেখানে গিয়ে কিন্তু তোমার লেখা ছাড়া হবে না বলে রাখলাম।

হাসি পেয়ে গেল। ও কি দুর্বল ভাবে আমায় ! খবরের কাগজের আপিসে আর ঘণ্টা ধরে বসে থাকতে হবে না, টোট্‌কা ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখে একজন অশিক্ষিতের মন যোগাতে হবে না, প্রকাশকের ভ্রূকুটির এখানেই শেষ, মাসিক সাপ্তাহিকের দরজায়ও আর হত্যা দিতে হবে না কোন দিন। অখণ্ড মুক্তি, আবার লিখব !

কিন্তু কয়েক দিন বাদে নিজেই এসে আলমারিটা খুললাম। বইগুলি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করলাম। নিজের লেখাগুলির ওপর নিবিড় স্নেহে হাত বুলিয়ে গেলাম অনেকক্ষণ ধরে। ব্যথায় বুকের ভিতরটা টনটন করছে। ফিরে দেখি হাসি পিছনে দাঁড়িয়ে।

হেসে বললাম, এগুলো ভাগ্নের ওখানে পাঠিয়ে দিই, তার খুব ঝোঁক এ সবে।

হাসি ইতস্তত করে বলল, সঙ্গে নেওয়া চলে না ?

পাগল ! বাতির দালালির সঙ্গে এ জিনিস অচল। তাছাড়া লেখা এখানেই খতম। এ শুধু উপোস করাতে বাকি রেখেছে। হাসতে হাসতে আলমারি খোলা ফেলেই পালিয়ে গেলাম।

প্রবাস যাত্রার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে ভিতরে একটা শুকনো টান ধরে যাচ্ছে কোথায় অনুভব করতে পারি।

অন্তস্তলে দিবারাত্র এক নীরব হাহাকার শুনতে পাই। আলোর দাম মুখস্ত করতে গিয়ে অন্ধকার দেখি চোখে।

কি যে ঘটে গেল কোথা দিয়ে হুঁস নেই। সম্বিৎ ফিরে দেখলাম কাজে ইস্তফা দিয়ে কোম্পানী থেকে বেরিয়ে আসছি।

আলমারিটার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে আছি স্থাণুর মত। মুখে স্তব্ধতার বর্ম। ওদিকে কি হচ্ছে চোখে না দেখলেও অনুমান করতে পারি। বাবার মুখে খবরের কাগজ নেমে এসেছে আবার। মা পূজোর ঘরে ঠাকুরের পায়ে নির্ভর করছেন। দাদারা মাথা নিচু করে বসে।

আর হাসি……

ভাবতে পারিনে।

রাত বাড়ছে। উঠে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম এক সময়। চূড়ান্ত বোঝা-পড়া এখনো বাকি। একদিনে নয়, দু'দিনে নয়—দিনে দিনে।

জানালার গরাদ ধরে হাসি দাঁড়িয়ে আছে। মুখ ফেরাল। হাসিঅশ্রুর সমন্বয়। একটু অপেক্ষা করে চৌকিতে এসে বসল। আবার একটু চুপচাপ থেকে ঝপ করে বলে উঠল, আমি খুশি হয়েছি, বুঝলে মশাই—?

আমি অবাক। চেয়ে আছি।

ও আড়চোখে দেখল একবার,—লেখাটেখা ছেড়ে এ চাকরি নিয়ে বাইরে যাওয়াটা তোমার কেমন লাগত বলব…?

চেয়েই আছি।

ঘুমন্ত ছেলের গায়ে একটা হাত রাখল সে। বলল, অভাবের তাড়নায় ওকে ফেলে পালিয়ে যাবার কথা মনে হলে আমার যেমন লাগে।

এবারে আমি দাঁড়িয়ে আছি জানালার গরাদ ধরে। নীলমণির গলির দেয়ালের ওধারে এক ফালি আকাশ দেখা যায়। চেয়ে থাকি। হঠাৎ সচকিত হয়ে অনুভব করি দু'গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। শশব্যস্তে মুছে ফেলি। ফিরে দেখি হাসি হাসছে মিটিমিটি।

কণা বসুমিশ্র

জন্ম ঃ ১৯৪৫ সালে, তেজপুর আসামে।

আমার প্রথম গল্প / কণা বসুমিশ্র

প্রথম গল্পের জন্ম আমার নিজেরই একান্ত অজানায় কবে হয়ে গেছে জানি না। স্কুলের হাতে লেখা ম্যাগাজিনে প্রথম ভূতের গল্প লিখি। আর ছাপার অক্ষরে প্রথম লেখা বেরোয় মাসিক বসুমতীতে।

১৯৬২ সনে কলকাতার কলেজে যখন সবে ভর্তি হয়েছি, তেজপুরে স্কুলের পাঠ চুকিয়ে এসে তখনো জানিনা আমি লেখক হব। লেখা ছিল একটা হবি! কবিতা, প্রবন্ধ, রম্য-রচনা কলেজের দেওয়াল পত্রিকায় একটা দুটো লিখি। এক সময়ে তেজপুরে গিয়েছি মা, বাবার কাছে ছুটি কাটাতে। গরমের লম্বা দুপুর। পড়তে ইচ্ছে করে না। ঘুমও পায় না। বসে বসে কলকাতার বন্ধুদের চিঠি লিখি। কোন এক বন্ধুকে চিঠি লিখতে গিয়ে ওই বন্ধুরই স্বপ্নে দেখা ঘটনাটা গল্প হয়ে যায়। স্বপ্নটা ও আমায় বলেছিল আগেই। ওর প্রেমিক ওকে প্রতারণা করেছিল। কিন্তু স্বপ্নেও দেখেছিল, তার সঙ্গে ওর বিয়ে হচ্ছে।

আমার গল্প অবশ্য শেষ হয়েছে, দারুণ একটা যন্ত্রণার ব্যথা বুকে নিয়ে। নায়ককেও পায়নি। স্বপ্ন ভেঙে গেলে ও বুঝেছে ওটা শুধুই স্বপ্ন মাত্র। ও থাইসিস রুগী। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ও এক পরিপূর্ণতায় স্বপ্ন দেখেছিল।

যাইহোক গল্পটা আর পোস্ট করা হয়নি বন্ধুর ঠিকানায়। কি মনে করে জানিনা, ওটা পাঠিয়ে দিই মাসিক বসুমতীর ঠিকানায়! তারপর ভুলে যাই।

ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে এলো। কলেজ খোলার দিন এগিয়ে আসছে।

একদিন বাবা তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কোর্ট থেকে। ওঁর হাতে বাদামী রঙের কাগজে মোড়া একটা ম্যাগাজিন বাবা বললেন, "তোমার নামে এটা এসেছে।" ম্যাগাজিন খুলে দেখি ওই লেখাটা ছাপা হয়েছে।

আজ আমার বিয়ে। তারই সাথে। সকাল থেকে ঘন ঘন বাজছে শাঁখ? দধিমঙ্গল হ'ল, গায়ে হলুদ হ'ল। আরও কত কি? আনন্দ? হ্যাঁ, আনন্দ হচ্ছে বৈকি? এ আনন্দ কার না হয়? তারপর আবার আমি ওকেই পাচ্ছি। কোন দিনের কোন অলস মুহূর্তেও এ কথা উঁকি দেয়নি মনে যে ওকে আমি পাব। কারণ, আমি তো লক্ষপতির মেয়ে। আব ও?

নিতান্ত সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ভদ্রলোক ওব বাবা। যে কথা ভাবতেও চমকে উঠতেন আমার বাড়ির সবাই। তাই আমাদের মেলামেশাটা কেউ সহজ ভাবে নিতে পারেনি।

বাবা বলেছিলেন, তুমি তো বড হয়েছ পিয়াল, কত বুদ্ধি তোমার আর মূর্খ নও তো।

আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি বাবা?

বাবা গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, সৌম্যের সাথে না হয় নাই বা মিশলে।

তারপর কি বলেছিলেন আমার মনে নেই। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মধ্যবিত্ত পবিবারের দারিদ্র্যকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবেছিলেন। বাবাব মুখের ওপর কথা কই নি কোনদিনই। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে গোপনে। ওকে আমি ভুলতে পাবিনি। ও যখন ওদের ছাদে এসে দাঁড়াত সেই বইখানা হাতে নিয়ে, লাইফ আফটার ডেথ, আমি তক্ষুণি ছুটে আসতুম তেতলার জানলায়। চোখাচোখি হত কতবার। দুপুরের নিস্তব্ধতায় কেউ থাকত না তার সাক্ষী। ওর বাড়ীর আমার বাড়ীর সবাই তখন ঘুমে অচেতন।

ও বলত, মৃত্যুর পরপারে গিয়ে মিলব আমরা।

আমি অধৈর্য্য হতাম। উঃ সে কতদিন—আর একটা জনম।

ও হাসত, বলত, হ্যাঁ, তারই প্রতীক্ষায় থাকতে হবে পিয়াল।

একদিন তেতলার জানলা থেকে বলেছিলুম, জান আমি বাগ্‌দত্তা?

ওর গোঁফের ফাঁকে হাসির রেখা। বলল, ভালই তো।

ওকে ব্যথা দিতে ইচ্ছে করত। আমার জন্যে ফেটে যাক্ না ওর মন। দেখব কতখানি ভালবাসে আমায়।

জান আমার বিয়ে?

আবার সেই হাসি। নেমতন্ন খাওয়া যাবে।

কিন্তু তুমি যে আমায় আর পাবে না।

কেন বিয়ের পর আসবে না ও বাড়ীতে?

ওঃ তাতেই খুশি ? তুমি কি মনে কর, তখনো আমি ছুটে আসবো এই তেতলার জানলায় ?

আসবে বৈ-কি। ওটুকু আমার প্রাপ্য।

আমি খিল খিল করে হেসে উঠতাম। এ যে রাধা আর শ্রীকৃষ্ণ। মিথ্যেই বিয়ে করে মরবে বেচারা আয়ান ঘোষ।

ও বাধা দিত, উঁহু, একটু আলাদা। তোমার আয়ান ঘোষের প্রেম হবে ব্যবহারিক। সে দ্বাপরের আয়ান ঘোষ তো নয়। কিন্তু এ হতভাগার প্রেম হবে স্বর্গীয়। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর একটি মুহূর্তের দেখা তাও দূর থেকে চোখের দেখা মাত্র। তাই নিয়ে কল্পনায় করবে বাসর রচনা।

আমার মনটা টন টন করে উঠত। ওকে আঘাত দিতে গিয়ে সে আঘাত ফিরে আসত আমার বুকে।

একদিন দেখলাম ও আর আসে না ছাদে। আমি উন্মুখ হ'য়ে বসে থাকি জানলায়। একদিন নয়—দুদিন নয়—সাতদিন—আটদিন। বছর ফিরে এল।

ওকে যে না দেখি তা নয়। কারণ, আমার তেতলার জানলাটা দিয়ে তো সবই দেখা যায় ও বাড়ীর। ও দিব্যি স্নান করে খেয়ে দেয়ে অফিস যায়। হয়ত কখন অন্যমনস্ক ভাবে তাকায় এ বাড়ীর জানলায়। আমার দিকে চোখ পড়তেই সরে যায়। আমি ভাবি, একি ওর অভিমান ? পোষ্টে লিখি চিঠি। উত্তর আসে না। আমার অশান্ত মন তবু লেখে চিঠি।

অনেকদিন পর একটা উত্তর আসে। আমি আবার চললাম আমার স্পিরিচ্যুয়াল ওয়ার্ল্ডে। আমার ধ্যান ভাঙিও না। দুদিনের বেশী আমার কাউকে ভাল লাগে না!

একটা অদৃশ্য সংকেত ওর চিঠিতে। ও স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আমায় আর ভাল লাগে না ওর। অনেক সাবধানে যত্ন করে ভাঁজ করে রাখলুম চিঠিটা। কয়েকটা অক্ষরে ভরা একখানা সাদা কাগজ। তা হোক এ আমার ঐশ্বর্য। এই প্রথম ওর লেখা। এই শেষ।

আমি আজও কুমারীই আছি। আছি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়। আমি জানি ও একদিন ফিরে আসবে। ওকে যে আসতেই হবে। নইলে কি ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার প্রেম আমার তপস্যা ? আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়। সেতারটা টেনে নেই। চাই নিজেকে ভুলিয়ে দিতে।

মা, বাবা হার মেনেছেন। এখন আর বিয়ের কথা বলেন না কেউ। বাবা বলেন

আমার মায়ের জন্যে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স রেখে যাচ্ছি। আর ভরসা ভগবান। তবু একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, সৌম্যকে বিয়ে করবে ?

না।

কেন ?

জানতে চেও না।

বাবা মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন। মাকে বলেছিলেন, যাক্—সে ভূতটা ত'হলে ঘাড় থেকে নেমেছে। বিয়ে না করে ভাল। মেয়ে আমার আর্য নারী।

পাশের বাড়ী এনার বিয়ে। এনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে মাত্র। ওরাও মধ্যবিত্ত পরিবার।

মিত্রবাড়ীর অনুশাসনের চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাবার অনুমতি ছিল না আমার। এ পাড়ায় কারো সঙ্গে খুব একটা ভাব নেই আমাদের। এনার বিয়েতে যাবার জন্যে বার বার অনুরোধ করে গেলেন ওর বাবা। যেতেও হ'ল আমাকে মায়ের সঙ্গে। বিয়ে বাড়ীর হৈ চৈ আমার ভাল লাগে না। ওঁরা বলেছেন বারে বারে তাই যাওয়া।

এনার বিয়ে হচ্ছে। ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে দেখছি আমরা। একনজর দেখলুম ওঁকে। সে সৌম্যবাবু। আমায় দেখতে পেয়ে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। হাজার জনের মিছিলের মধ্যে খুঁজছে ওকে—সে আমার ব্যাকুল চোখ।

আবার দেখলুম ওকে দোতলার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে। ও বিয়ে দেখছে। সেখান থেকে আমায় দেখতে পাচ্ছে না ও। কিন্তু আমি তো পাচ্ছি ওকে দেখতে। ওর মুখ শুকনো। বড্ড রোগা হয়ে গেছে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে আছি ওর মুখের পরে অনেক দূর থেকে। ওর মুখখানা থমথমে। চোখে জল। চমকে ওঠে মন ওর চোখে জল ? কেন ?

কিছুদিন থেকে একটা অস্পষ্ট কথা কানে এসেছিল। এনা সৌম্যকে ভালবাসে। সৌম্য এনাকে ভালবাসে। গুরুত্ব দিই নি কথাটাকে—মিথ্যে কথা ! গুজব। এনার মত একটা সাধারণ মেয়ের মধ্যে এমন কি পেতে পারে সৌম্য ?

শুভদৃষ্টি। ও ছুটে পালিয়ে গেল ওখান থেকে। সব কিছুর উত্তর মিলল যেন। আমি পাষাণ। আমার চোখে জল নেই। ফুরিয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে মন হাহাকার করে উঠল একটা হতভাগা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলের জন্যে। ও পেল না এনাকে। আহা ! এনা কি নিষ্ঠুর। ও চিনল না জিনিয়াসকে। এনা ভুল করল। মস্ত বড় ভুল।

তারপর ? থাক্ সে সব কথা। লিখতে গেলে মহাভারত। আজ আমার বিয়ে। আমি সৌম্যকে পেয়েছি। আজ সুখের দিনে দুঃখের কথা না হয় নাইবা বললাম।

সৌম্য বলছে, অভিমান কোর না পিউ। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। ভুল করেছিলুম তোমায় চিনতে। দুজনার প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলবো দুজনে। আমাদের মত এত' সুখী কে বলত ?

সৌম্যের লোমশ বক্ষে টেনে নেয় আমায়। আমাব চোখে জল এতদিন পর।

খুশখুশে কাশি। কাশতে কাশ:তে বুক ফেটে যায়। বিছানাটা রক্তে লাল হয়ে গেল। মা মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। আমি তাকাই। ঘুম ভেঙে গেছে। আমি থাইসিস্ রুগীর স্বপ্ন দেখেছিলাম বুঝি ?
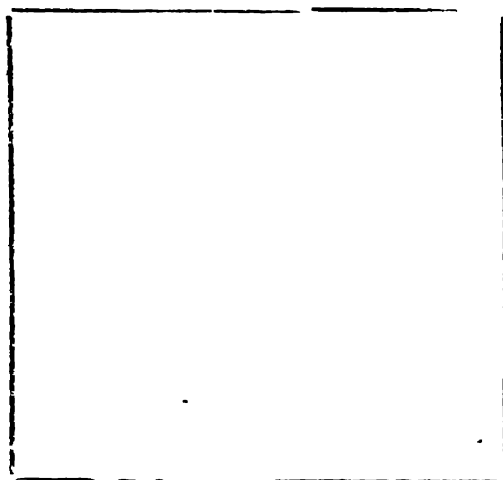
কমলকুমার মজুমদার

জন্ম : ১৯১৪

গৌরীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার দরুন কিছু ভাল লাগছিল না। মনটা বড্ড খারাপ,—নীতীশ ভাবতেই পারছে না, দোষটা সত্যিই কার। অহরহ মনে হচ্ছে—আমার কি দোষ? জীবনে অমন মেয়ের সঙ্গে সে কখনই কথা বলবে না।

দক্ষিণ দিককার বারান্দা দিয়ে যতবার যায় ততবারই দেখে, গৌরী পর্দ্দা সরিয়ে এদিক পানে চেয়ে আছে, ওকে দেখলেই পলকে পর্দ্দা ফেলে দেয়। এ চিন্তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মনটা সদা চঞ্চল হয়ে রয়েছে, কি করে, কোথায় বা যায়? কোন কাজেই মন টিকছে না! অবশেষে বিকেল বেলা মনে পড়ল—জুতোজোড়া নেহাৎ অসম্মানজনক হয়ে পড়ছে, অনেক অনুনয়-বিনয় করে ঠাকুমার কাছে ব্যাপারটা বলতে—টাকা পাওয়া গেল।

নিজের জিনিস নিজে কেনার মত স্বাধীনতা বোধ হয় আর কিছুতেই নেই, অথচ মুসকিলও আছে যথেষ্ট। যদিও সরকার মশায়ের গ্রাম্য পছন্দের আওতায় নিজের একটা স্বাধীন পছন্দ গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তাকে বিশ্বাস নেই—কি জানি যদি ভুল হয়? যদি দিদিরা বলে, 'ওমা এই তোর পছন্দ?' সিদ্ধান্ত যদি হয়—'তা মন্দ কি বাপু বেশ হয়েছে, ঘষে মেজে অনেক দিন পায় দিতে পারবে 'খন।' এর চাইতে গুরু শ্লেষ আর কি হতে পারে? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে নীতীশ রাস্তা দিয়ে চলেছে। ছোট দোকানে যে তার পছন্দসই জুতো পাওয়া যেতে পারে না, এ ধারণা তার বদ্ধমূল, তাই বেছে বেছে একটা বড় দোকানে গিয়ে উঠল।

জুতোওয়ালা এমন করে কথা বলে, যে তার উপর কথা বলা চলে না, মনে হয় যেন ও কথাগুলো নীতীশের। যে জুতোজোড়া পছন্দ হল, সেটা সোয়েড আর পেটেন্ট লেদারের কম্বিনেশান। ক্লাসের ছেলেরা হিংসে করে মাড়িয়ে দিতে পারে, গৌরীর মনে হতে পারে, কেন ছেলে হয়ে জন্মালুম না?

দাম ছ-টাকা, ঠিক পাঁচ টাকাই তার কাছে আছে। দর-কষাকষি করতে লজ্জা হয়, পছন্দ হয় নি বলে যে অন্য দোকানে যাবে তারও জো নেই, কারণ শুধু তার জন্যে এতগুলো বাক্স নামিয়ে দেখিয়েছে। আজকাল তো সবকিছুই সস্তা, কিছু কম বললে দেয় না? ইচ্ছে আছে, কিছু পয়সা যদি সম্ভব হয় তো বাঁচিয়ে একখানা মোটা খাতা কিনবে, গৌরীর হাতের লেখা ভাল, ভাব হলে, তার উপর সে মুক্তোর মত অক্ষরে লিখিয়ে দেবে—নীতীশ ঘোষ—সেকেণ্ড ক্লাস··· অ্যাকাডেমি।

লজ্জা কাটিয়ে বলে ফেললে, সাড়ে চারে হয় না ?

জুতোওয়ালা বললে, আপনার পায়ে চমৎকার মানিয়েছে, একবার আয়নায় দেখুন না, দরাদরি আমরা করি না।

নীতীশ পিছন ফিরে আয়নার দিকে যেতে গিয়ে দেখে, নিকটে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, যার বয়েস সে আন্দাজ ঠিক করতে পারে না, তবে তার দাদার মত হবে। যাকে আমরা বলব আটাশ হতে তিরিশের মধ্যে, তাঁর হাতে ছোট্ট ছোট্ট দুটি জুতো কোমল লাল চামড়ার। দেখে ভারী ভাল লাগল—জুতোজোড়া সেই নরম কোমল পায়ের, যে পা দুখানি আদর করে স্নেহভরে বুকে নেওয়া যায়, সে চরণ পবিত্র, সুকোমল, নিষ্কলুষ।

সহসা যেমন দুর্ব্বার দখিন হাওয়া আসে, তেমনি এল অজানা মধুর আনন্দ, ওই কিশোর নীতীশের বুকের মধ্যে। ছোট লাল জুতো দেখলে ওর যে বিপুল আনন্দ হতে পারে, এ কথা ওর জানা ছিল না—জানতে পেরে আরও খুসী হল, খুসীতে প্রাণ ছেয়ে গেল। ইচ্ছে হল, জুতোজোড়া হাতে করতে, ইচ্ছে হল হাত বুলোতে। কোন রকমে সে লজ্জা ভেঙে বললে, মশাই দেখি, ওর রকম জুতো।

ক-মাসের ছেলের জন্যে চান ?

ভীষণ সমস্যা, ক-মাসের ছেলের জন্যে চাইবে ? বললে, ছ-সাত, না না, আট-দশ মাসের আন্দাজ।

একটি ছোট্ট বাক্স, তার মধ্যে ঘুমন্ত দুটি জুতো, কি মধুর ! নীতীশের চোখের সামনে সুন্দর দুটি মঙ্গল চরণ ভেসে উঠল। মনে হল, ও পা দুটি তার অনেক দিনের চেনা অনেক স্বপ্নমাখা আনন্দ দিয়ে গড়া। হাসি চাপতে পারলে না, হাসি যেন ছুটে আসছে না হেসে থাকতে পারল না।

মনে করতে লাগল, কার পায়ের মত ? কার পা ? কিছুতেই মনে আসছে না টুটুল ? না—টুটুল তো বেশ বড়। ইচ্ছে হল জুতোজোড়া কিনে ফেলে। জিগগেস করল, ওর দাম ?

এক টাকা।

নিজের টাকা দিয়ে কিনতে ইচ্ছে হল, কিন্তু সাহস হল না। কিন্তু উদ্বৃত্ত টাকাও যে তার কাছে এখন নেই, হয়তো কিছু সস্তায় হতে পারে। কি করা যায়, 'কি হবে কিনে ?' বলে বিদায় দেওয়া যায় না ? যাক টাকা পেলে কেনা যাবে। নিজের জুতো কেনাও হল না, দরে পোষাল না বলে। যখন সে উঠতে যাচ্ছে, তখন তার মনে হল, পিছন থেকে জুতোজোড়া তাকে টানছে, বিপুল তার টান ! যেন ডাকছে কি মোহিনী শক্তি ! একবার মনে হল কিনে ফেলে, কি আর বলবে, বড়জোর বকবে তবুও সাহস হল না।

চিরকাল সে ছোট ছেলে দেখতে পারে না, ছোট ছেলে তার দু-চক্ষের বিষ, ভবেই পেত না টুটুলকে কি করে বাড়ির লোকে সহ্য করে···কি করে লোকে ছোট ছলেকে কোলে নেয়? নিজের ওই স্বভাবের কথা ভেবে লজ্জা হল, তবু—তবু ভাল াগছিল, যতবার ভুলবার চেষ্টা করে ততবার ভেসে আসে সেই লাল জুতো—মধুর ল্পনা। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই লাল জুতোর পানে দেখে সে আস্তে আস্তে দোকান থকে বার হয়ে এল।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কত অসম্ভব কল্পনাই না তার মনে জাগছিল। তার মনে খন, পিতা হবার দুর্ব্বার বাসনা। গৌরীর সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তাহলে? বেশি হলে মেয়ে সে পছন্দ করে না, একটি মেয়ে সুন্দর ফুটফুটে দেখতে, কচি কচি হাত পা, নের মধ্যে অনুভব করল, যেন একটা কচি কচি গন্ধও পেল। গৌর সন্ধেবেলায়, ায় অন্ধকার বারান্দায় বসে, গপোর ঝিনুকে করে তাকে দুধ খাওয়াবে: ঝিনুকটা পোর বাটিতে বাজিয়ে বাজিয়ে বলবে, আয় চাঁদ আয় চাঁদ—কি মধুর! আকাশে খন দেখা দেবে একটি তারা। আমায় বাবা বলে ডাকবে, শুনতে পেল—ছোট দুটি াহু মেলে আধো আধো গদ্‌গদ্‌ভাবে ডাকছে, বাবা—হাতে দুটি সোনার বালা। দখতে যেন পেল, গৌরী তাকে পিছন থেকে ধরে দাঁড় করিয়েছে, মাঝে মাঝে শিশু াল সামলাতে পারছে না, উল্লাসে হাতে হাত ঠেকছে, হাস-উচ্ছল মুখ। আমি হাত টো ধরে বলব, 'চলি চলি পা-পা টলি টাল যায়, গর্‌বিনী আড়ে আড়ে হেসে হেসে ায়।'···

াকে নাম হবে? গৌরী নামটা পৃথিবীর মধ্যে নীতীশের কাছে মিষ্টি, কিন্তু ও ামটা রাখবার উপায় নেই, লক্ষ লক্ষ নাম মনে করতে করতে সহসা নিজের লজ্জা রতে লাগল, ছি-ছি সে কি যা-তা ভাবছে! কিন্তু আবার সেই বাহু সেই বাহু মেলে ক যেন ডাকল—'বাবা'।

না, ছেলেমেয়ে বিশ্রী, 'বিশ্রী' শুধু এই ওজর দিয়ে প্রমাণ করতে হল যে—যদি িলের মত মধ্যরাতে চীৎকার করে কেঁদে উঠে—উঃ কি জ্বালাতন!

যে জুতো দেখে ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেই লাল জুতো-াড়ার কথা সকলকে বলে, কিন্তু সঙ্কোচও আছে যথেষ্ট, পাছে গৌরীকে নিয়ে যা ল্পনা করেছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদিও প্রকাশ হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, বুও মনে হচ্ছিল, হয়ত প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। একেই তো গৌরী এলে, ঠাকুমা াকে আরম্ভ করে বাড়ির সকলে ঠাট্টা করে। ঠাট্টা করার কারণও আছে; একদা ানের পর তাড়াতাড়ি করে নীতীশ ভাত খেতে গেছে, ঠাকুমা বললেন—নীতীশ তোর াঠময় যে জল, ভাল করে গাটাও মুছিস নি? পাশেই গৌরী দাঁড়িয়েছিল, সে অমনি াচল দিয়ে গাটা মুছিয়ে দিলে পরম স্নেহে—অবশ্য নীতীশ তখন ভীষণ চটেছিল। ই রকম আরও অনেক ব্যাপার ঘটেছিল যাতে করে বাড়ির মেয়েদের ধারণা, ীতীশের পাশে গৌরীকে বেশ মানায়—বিয়ে হলে ওরা সুখী হবে এবং তাই নিয়ে রা ঠাট্টাও করেন।

কি করে, আর কাউকে না পেয়ে নীতীশ তার বড়বৌদিকে বলল, জানো বড়বৌ
আজ যা একজোড়া জুতো দেখে এলুম, ছোট্ট জুতো, টুটুলের পায়ে বোধহয় হবে
কি নরম, তোমায় কি বলব! দাম মাত্র একটাকা! অবশ্য নীতীশের ভীষণ আপ
ছিল টুটুলের নাম করে অমন সুমধুর ভাবনাটাকে মুক্তি দেওয়ায়, কিন্তু বাধ্য হয়ে দি
হল।

বৌদি বললেন, বেশ, কাল আমি টাকা দেব'খন—তুমি এনে দিও।

মনটা ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হল, কি জানি সত্যি যদি আনতে হয়—শেষে কিনা টুটু
পায়ে ওই জুতোজোড়া দেখতে হবে! তবে আশা ছিল এইটুকু যে, বৌদি বলার প
সব কথা ভুলে যান।

নীতীশ পড়ার ঘরে গিয়ে বসল। পড়ায় আজ তার কিছুতেই মন বসছিল
সর্বদা ওই চিন্তা। তার কল্পনা অনুযায়ী একটি শিশুর মুখ দেখতে ভয়ানক ইচ্ছে হল
এ বই সে বই ঘাঁটে, কোথাও পায় না, যে শিশুকে সে ভেবেছে তার ছবি নেই
কোথায়? কোথায়?

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে গৌরীর গলা পাওয়া গেল, অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে ব
বলছে। প্রতিবার ঝগড়ার পর নীতীশ এ ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করেছে, গৌরীকে
বুঝতে পারে না। হয়ত গৌরী আসতে পারে, এই ভেবে সে বইয়ের দিকে চে
বসে রইল।

উদ্দাম দুর্ব্বার বাতাসে ত্রাসে কেঁপে ওঠে যেমন দরজা জানলা, গৌরী প্রে
করতেই পড়ার ঘরখানা তেমনি কেঁপে উঠল। হাসতে হাসতে ওর কাঁধের উপর হ
দিয়ে বললে, লক্ষ্মীটি আমার উপর রাগ করেছ?

কথাটা কানে পৌঁছতেই রাগ কোথায় চলে গেল!

রাগের কারণ আছে। গৌরী ফোর্থ ক্লাসে উঠে ভেবেছে যে সে একটা মস্ত বি
হয়ে পড়েছে—অঙ্ক কি মানুষের ভুল হয় না? হলেই বা তাতে কি? প্রথমবার
পারে নি, দ্বিতীয়বার সে তো রাইট করেছে। না পারার দরুন গৌরী এমনভাবে হাস
লাগল এবং এমন মন্ত্র উচ্চারণ করলে যে অতি বড় শান্ত ভদ্রলোকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘ
নীতীশের কথাতো বাদই দেওয়া যাক।

নীতীশের রাগ পড়েছিল, কিন্তু সে মুখ তুলে চাইতে পারছিল না; সেই কল্পনা ত
মনের মধ্যে ঘুরছিল।

রাগ করেছ? আচ্ছা আর বলব না, কক্ষনো বলব না—বাবা বলিহারি র
তোমার! কই আমি তো তোমার উপর রাগ করি নি?

মানে? আমি কি তোমায় কিছু বলেছি যে রাগ করবে?

গৌরীর এই সব কথাগুলো শুনলে ভারী রাগ ধরে, কিছু বলাও যায় না।

চুপ করে আছ যে? এই অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না ভাই··
অঙ্ক-টঙ্ক হবে না—
লক্ষ্মীটি তোমার তুটি পায় পাড়!
এতক্ষণ বাদে ওর দিকে নীতীশ চাইল। ওকে দেখে বিস্ময়ের অবধি রইল না, সেই
াশুর মুখ; যাকে সে দেখেছিল নিজের ভিতরে, অবিকল গৌরীর মতই ফর্সা—ওই
কম সুন্দর চঞ্চল, কাল চোখ।
কি দেখছ?
লজ্জা পেয়ে ওর অঙ্কটা করে দিলে। তারপর নানান গল্পের পর, লাল জুতো-
জোড়ার কথা ওকে ব'লে বললে, কি চমৎকার! মনে হবে তোমার সত্যি যেন ছোট্ট
ছোট্ট তুটো পা।
ছোট্ট তুটি চরণ কল্পনা করে গৌরীর বুকও অজানা আনন্দে তুলে উঠল—যে আনন্দে
থা দিয়েছিল নীতীশের মনে। গৌরী বললে, আচ্ছা কাল তোমায় আমি পয়সা দেব,
ামার টিফিনের পয়সা জমানো আছে—কেমন?
নীতীশ ভদ্রতার খাতিরে বললে, তোমার পয়সা আমি নেব কেন?
কথাটা গৌরীর প্রাণে বাজল, সে অঙ্কের খাতাটা নিয়ে, বিলম্বিত গতিতে চলে
ল। নীতীশ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।
দিন-তুয়েক গেল পয়সা সংগ্রহে। এই তুদিনের মধ্যে গৌরী এ বাড়ি আর আসে
। ঠাকুমা জিগগেস করলেন, নীতীশ, গৌরী আসে না কেন রে?
আমি কি জানি?
কথাটা ঘরে থেকে শুনেই গৌরী তৎক্ষণাৎ গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দাঁড়াল।
ঠাকুমা বললেন, আসো না কেন?
জ্বর।
জ্বর কথাটা নীতীশকে মোটেই বিচলিত করল না, ও জানে, ওটা একটা ফাঁকি ছাড়া
ার কিছু নয়।

টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জুতোজোড়া আনতে, রাস্তা থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে
লে, কারণ হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, প্রতি মোড়ে মোড়ে গুণে দেখতে লাগল পয়সা
ক আছে কিনা।
জুতোর দোকানে ঢুকেই বললে, দিন তো মশাই সেই লাল জুতো, সেই যে, সেদিন
'খে গিয়েছিলুম?
দোকানদার একজোড়া দেখালে। ও বললে, না—না, এটা নয়, দেখুন তো ওই
লফে?
পাওয়া গেল সেই স্বপ্নময় জুতো! কি জানি কেন আরো ভালো লাগল—ওর মধ্যে
যেন লুকিয়ে আছে। চিত্তের মধ্যে একটি হিংস্র আনন্দ দেখা দিল—দর নিয়ে গোল

বাধল না, একটি টাকা দিয়ে জুতোজোড়া নিলে। জুতোওয়ালা বললে, আব
আসবেন। মনে হল বোধহয় ঠকিয়েছে।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অনেক বার ইচ্ছে হল বাক্সটা খুলে দেখে—কিন্তু পারল না
একবার মনে হল, এ দিয়ে কি হবে? কার জন্যেই বা কিনল? সে কি পাগল! মিে
মিথ্যে টাকা তো নষ্ট হল?

ভিতর হতে কে যেন উত্তর দিল, 'কেন, টুটুলের পায় যদি হয়?' টুটুলের কথা মা
হতেই একটু ভয় হল, যদি তার পায় সত্যিই হয়, তাহলেই তো হয়েছে। আবার প্র
কিন্তু কার জন্যে সে কিনেছে? বেশ ভাল লাগল বলে কিনেছি! ভাল লাগে বলে ে
মানুষ অনেক কিছু করে, বাজী পোড়ায়, গঙ্গায় গয়না ফেলে—এ তবু, একজোড়া জুে
পাওয়া গেল তো। বাজে খরচ হয় নি, বেশ করেছে, একশো বার কিনবে। সহ
জিহ্বায় দাঁতের চাপ লাগতেই মনে পড়ল, কেউ যদি মনে করে তাহলে জিব কাটে, ে
মনে করতে পারে? গৌরী? আজ গৌরীকে ডেকে দেখতে হবে।

বাড়িতে পৌঁছে, সকলকে মূল্যবান জিনিসটা দেখাতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সাহস হ
না, যদি ঠাট্টা করে? প্রথমত সে নিজেই ঠিক করতে পারছে না,—কার জন্যে কিন
কেন কিনল?

টুটুল বারান্দায় তখন খেলা করছিল, তার পায়ের মাপটা নিয়ে জুতোটা মেপে দেখ
টুটুলের পা কিঞ্চিত বড়—কিন্তু ওর মনে হল অসম্ভব বড়! শঙ্কিত চিত্তে ঠাকুমার কা
গিয়ে বললে, তোমাদের সেই লাল জুতোর কথা বলেছিলুম, এই দেখ।

ভাঁড়ার ঘর হাসি উচ্ছলিত। ঠাকুমা বললেন, ওমা—কোথায় যাব, ছেলে না হবে
জুতো! হৈ হৈ পড়ে গেল। নীতীশের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, বললে, আ
টুটুলের জন্যে এনেছিলুম…

কে শোনে তার কথা! যুঝতে না পেরে, পড়ার ঘরে গিয়ে আলোটা জ্বেলে বস
সামনে জুতোজোড়া, প্রাণভরে দেখতে লাগল। এ দেখা, যেন নিজেকে দেখা। ভাবে
গৌরীকে কি করে ডাকা যায়?

গৌরী গোলমাল শুনে, জানলায় এসে দাঁড়িয়ে দেখছিল—ব্যাপারটা কি সে বুঝে
পারে নি। মনে হচ্ছিল, নীতীশ একবার ডাকে না?

সহসা চিরপরিচিত ইশারায়—না থাকতে পেরে নেমে এল, আসতেই নীতীশ বলে
তোমায় একটা জিনিষ দেখাব, দাঁড়াও।

গৌরী উদ্গ্রীব হয়ে ওর দিকে চাইল। নীতীশের শার্ট বোতাম-হীন দেখে বলে
তোমার গলায় বোতাম নেই, দেব?

দাও।

গৌরীর চুড়িতে সেফটিপিন ছিল না, শুধু একটি ব্লাউজে বোতামের পরিবর্তে
না ভেবেই সেটা দিয়ে বুঝল ব্লাউজ খোলা, বললে,—দাও ওটা তোমায় একটা ে
দিচ্ছি।

থাক।

থাক, কেন, এনে দিই না? কাতর কণ্ঠে বললে।

থাক, বলে হাসিমুখে সে জুতোর বাক্সটা খুলে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল।

সুনিবিড় প্রেমে কালো চোখদুটো স্বপ্নময় হয়ে এল। গৌরী জুতোজোড়া দেখে, কেঁপে উঠল! তার দেহে বসন্ত-মধুর শিহরণ খেলে গেল। মনে হল, এ যেন তারই শিশুর জুতো! অস্পষ্টভাবে বললে, আঃ··! তার দেহ আনন্দে শিথিল হয়ে আসছিল। যেন কোন রমণীয় সুখ অনুভব করে, আবার বললে, আঃ।·· সব কিছু যেন আজ পূর্ণ হল। নিজেদের কল্পনায় যে সুন্দর ছিল, যেন তাকেই রূপ দেবার জন্যে আজ দুজনে আবদ্ধ হল।

নীতীশ বিস্ময় ভরে দেখে ভাবছিল, একি! পাশের বাড়িতে তখন সেতারে চলছিল তিলক-কামোদের জোড়—তারই ঘন ঝঙ্কার ভেসে আসছিল। ওই সঙ্গীত এবং এই জীবনের মহাসঙ্গীত তাদের দুজনকে আড়াল করে রাখলে, হিংস্র বাস্তবের রাজ্য থেকে। যে কথা অগোচরে অন্তরের মধ্যে ছিল, সে আজ দুলে-দুলে উথলে উঠল। বহু জনমের সঞ্চিত মাতৃস্নেহ— মাতৃত্ব।

দেখতে পেলো, সুন্দর অনাগত শিশু, যে ছিল তার কল্পনায়, অঙ্গটি তার মাতৃস্নেহের মাধুর্য্য দিয়ে গড়া, যাকে দেখতে অবিকল নীতীশের মত, তার আত্মা যেন শিশুর তনুতে তনু নিল। ইচ্ছে করল বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে—বুকে জড়িয়ে ধরে বেদনা-মাখা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে। জুতো দুটোয় আসতে আসতে হাত বুলোতে বুলোতে সহসা গভীর ভাবে চেপে ধরল, তারপর বুকের মধ্যে নিয়ে যত জোরে পারে তত জোরে চেপে, সুগভীর নিশ্বাস নিলে, মনে হল যেন তার সাধ মিটেছে। ভগ্নস্বরে কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এল, আঃ··

আনন্দে বিস্ফারিত আঁখিযুগল। নিজেকে যেন অনুভব করলে। আজ শান্ত হল তার লক্ষ বাসনা লক্ষ বেদনা- লক্ষ স্বপ্ন মূর্ত্তি পেল।

বিশ্বগত অপূর্ণতা তারা এই তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করলে, পূর্ণতার সম্ভাবনায় দুজনের মহা-আনন্দ-মদে মত্ত হয়ে উঠল।

গৌরীর হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, ওই লাল জুতো পরে, নীতীশ টলমল করে চলল, আর -গৌরী চলতে শুরু করলে, নীতীশের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে। আচম্বিতে সশব্দে জুতোজোড়াকে চুম্বন করলে। তারপর নীতীশের দিকে চেয়ে, ঈষৎ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠে জিগগেস করলে, কার জন্যে গো?

মৃদু হেসে বললে, তোমার জন্যে!

বারে তুমি যেন কি! অতটুকু জুতো, আমার পায় কখনও হয়? কার লক্ষ্মীটি বল না? তোমার বুঝি?

ধেৎ! আমার হতে যাবে কেন?

ভুরু কুঁচকে বললে, তবে কার? চোখের তারা নেচে উঠল।

তোমার পুতুলের ?

ওমা—তা হতে যাবে কেন ? তুমি এনেছ, নিশ্চয় তোমার ছেলের ?

আচ্ছা, বেশ দুজনের—

হ্যাঁ—অসভ্য, বলে গ্রীবাটাকে পাশের দিকে ফিরিয়ে নিজের মধুর লজ্জাটা অনুভব করলে। লাল জুতোজোড়া তখনও তার কোলে, যেন মাতৃমূর্ত্তি।

কুমারেশ ঘোষ

১৩২০ সনে যশোর জেলার কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গ-ব্যঙ্গের রচনায় সিদ্ধহস্ত। একটা বা দু'টো নয়, তেরটি ছদ্মনাম ধারণ করে কুমারেশ বাবু বহু লেখার জনক। ছদ্মনামগুলি, অষ্টচক্র, কু, কুশ, কে জি, বকযন্ত্র, বক্তিয়ার, ব্যবসায়ী, যযাতি, মর্জিনা, শ্রীচোখাচোখ, শ্রীগ্রন্থকীট, শ্রীভাঙ্গাকুলো, স্বামীবেলানন্দ।

সজনে ডাঁটা ও কুমারেশ ঘোষ ॥

৩৬ বছর আগেকার কথা। ১৯৪২ সাল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী বোমার ভয়ে সপরিবারে কুষ্টিয়ায় (এখন বাংলাদেশে) গিয়ে আস্তান গেড়েছি। সেখানে আমার মামাবাড়ি এবং আমিই তখন মালিক। সে বাড়িতে কয়েক ঘর ভাড়াটিয়া ছিলেন। আমিই তখন তাঁদের ল্যাণ্ডলড। একজন ভাড়াটিয়া বহুদিন বাড়ি ভাড়া বাকি রেখে, বহু তাগিদেও দিচ্ছিলেন না। এই সময় একদিন খেতে বসে দেখি পাতে কচি সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি। গিন্নীকে জিগ্যেস করায় বললেন, ঐ যে তুমি দু' তিন বছর আগে এখানে এসে একটা সজনের ডাল পুঁতেছিলে বাগানে, আজ দেখি সেই গাছে কটি কচি ডাঁটা ঝুলছে। তাই পাড়িয়ে চচ্চড়ি রেঁধেছি। শুনে চমকে উঠলাম: ঐ ডালটিকে একটু স্থান দিয়েছিলাম মাটিতে—এ তো দেখছি তারই প্রতিদান। তখনই এই গল্পটি মাথায় এসে গেল।

লিখলাম এবং স্থানীয় 'জাগরণ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয়, নিশিকান্ত পাত্র (এ পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ প্রভৃতি অনেকেই লিখেছেন একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে গল্পটি শুনেই নিয়ে নিলেন এবং 'জাগরণ' পত্রিকায় ছাপলেন।

পরে প্রকাশিত হয়েছে আমার 'কাঠের ঘোড়া' গল্প সংকলনে।

সহরের বাইরে খানিকটা জমি কিনে ছোট্ট একটা বাড়ি তোলা গেলো। বন্ধুরা বাড়ি 'খে মনে মনে খুশি হ'লেন কিনা জানিনে, তবে মুখে উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করলেন।

দক্ষিণ খোলা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি। সামনে বারান্দা। বারান্দার থামে 'তয়ে উঠেচে মাধবীলতা। সামনে একটু খোলা জায়গা, ঘাস বিছানো। তার এক ।শে তরিতরকারির বাগান। আর একদিকে নানা ফুলের গাছ। একজন ভদ্রলোকের াগান থেকে একটা সজনের ডালও এনে পুঁতে দিয়েছিলাম বেড়ার ধারে। সজনের ল আর ডাঁটা, দুই-ই ভোজন বিলাসী বাঙালী বাড়ির পরম আদরের জিনিষ।

কথাটা গোপনেই বলি। বাড়ি তৈরী করতে গিয়ে টাকার টান পড়েছিলো যখন, খন হাত পাততে হয়েছিলো আমার এক ধনী অথচ উদার আত্মীয়ের কাছে। বিমুখ তে হয়নি, সটান ধার দিয়েছিলেন বিনা আড়ম্বরেই। অর্থাৎ মুখের কথায় টাকা ।ওয়া গেছলো হাতে. খৎ লিখে দিতে হয়নি। ঘটনাটি এ-যুগের একটি বিস্ময়।

কিন্তু স্বাভাবিক যা, পাকে চক্রে তাই ঘটে গেলো। ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেলেন। াজেই তাঁর ছেলেদের বলে যেতে পারলেন না এই ধার দেওয়া টাকার কথা। হয়তো াঁচে গেলাম আমি। এই নিয়ম ঃ একজন মরলে, আর একজন বাঁচে।

নাঃ বাঁচা গেল না। দিন দুয়েক বাদে স্বর্গীয় আত্মীয়টির বড় ছেলে আমার দরজায় সে উপস্থিত। হাতে একখানি নোট বুক। বললো, বাবার নোট বুকে দেখচি তিনি াপনাকে দেড়হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। দেবেন টাকাটি ফেরত? এ সময়ে পেলে ড় উপকার হয়। বড় দরকার ছিলো।

প্রথমে হকচকিয়ে গেছলাম। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম। ব... ... ... াবা তো কবে শোধ করে দিয়েচি। লেখা নেই নোট বুকে?

—না।

—তবে বোধহয় তোমার বাবা নোট বুকে লিখতে ভুলে গেচেন।

এইবার আত্মীয় পুত্র থতমত গেলো। হয়তো লজ্জাও পেলো সে। বললো, হয়তো াই। বাবা অনেকেই এরকম মুখের কথায় টাকা দিতেন। শুধু নোট বুকে টুকে াখতেন। আর যাঁদের কাছ থেকে ফেরত পেয়েচেন লিখেও রেখেচেন এই বইয়ে। াপনার টাকা উল্লেখ নেই বলেই এসেছিলাম। যাক, মনে কিছু করবেন না।

হেসে বললাম, না, না, মনে করবো কেন? তিনি সে সময় টাকাটা দেওয়ায় বড়

উপকার হয়েছিলো। এ বাড়িতে বাস করচি, বলতে গেলে তাঁরই অনুগ্রহে। সত্যিকথা বলতে কি, তিনিই আমাকে এখানে বসিয়েচেন।

—আচ্ছা আমি তা হলে !

—একটু চা হবে না ?—ভদ্রতা করলাম।

—না।—ছেলেটি বোধহয় লজ্জা পেয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

যাক বাঁচা গেলো। আর টাকা চাইতে আসবে না কেউ।

সেইদিনই দুপুরবেলা—

খেতে বসেচি। গৃহিণী পাঁচ তরকারি ভাত সাজিয়ে নিয়ে সামনে ধরলেন। বসলেন একপাশে হাত পাখা হাতে নিয়ে।

সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে বললাম, বাঃ বেশ তো কচি ডাঁটা !

গৃহিণী হেসে বললেন, এ তোমারই বাগানের। ঐ যে সেবার একটা সজনে ডাল পুঁতেছিলে পূবের দিকে বেড়ার ধারে, সেই গাছের ডাঁটা।

—সেই গাছের ?

চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে গেলো আমার। একটু যাকে জায়গা দিয়েছিলাম, সে আজ প্রতিদানে দিলো তার যথাসাধ্য। আর আমি !···

খাওয়া ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়ালাম।

গৃহিণী অবাক হলেন, কী হলো ?

বললাম, একটা দরকারি কাজ মনে প'ড়ে গেচে। এখুনি বেরুতে হবে। তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে গেলাম।

উঠালাম দেড় হাজার টাকা।

গেলাম ছুটে সেই আত্মীয়ের বাড়ি।

টাকাটা দিয়েছিলাম মনে আছে, কিন্তু কি কৈফিয়ৎ দিয়েছিলাম আজ আর মনে নেই।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

নিজের প্রথম গল্প প্রসঙ্গে / গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আমার প্রথম গল্প ছাপা হয়েছিল—কলেজ ম্যাগাজিন বাদে—'ঋত্বিক' কাগজে। ভাগ্যের বিচিত্র বিধানে সে গল্প সম্পাদক চেয়ে নিয়ে গিযে ছেপেছিলেন। সে কাহিনী রেডিওতে একাধিকবার বলতে হয়েছে। এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন কেশব সেন—বর্তমান কালের খ্যাতিমান লেখক অধ্যাপক প্রলয় সেনের বাবা। কিন্তু সে গল্প হাতের কাছে নেই। তার পরেও কয়েকটি গল্প ছাপা হয়েছে হয়ত তা কোথাও আছে এখনও, আমার পক্ষে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। এই 'শুভবিবাহ' গল্পটি প্রথম দিকেরই গল্প, ১৯২৮ সালে প্রকাশিত। 'সম্মিলনী' বলে একটি ফুলস্কেপ ৪ পেজী সাইজের পাক্ষিক পত্র ছিল, তার সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত কালীমোহন বাবু, ভবানীপুরে ল্যান্সডাউন রোড (?) থেকে বেরোত বোধহয় রঙমশাল প্রেসে ছাপা হ'ত। পরিচ্ছন্ন সাহিত্য পত্রিকা ছিল কাগজটি। তবে মালিক সম্পাদকের আর্থিক সঙ্গতি তত ছিল না। সামান্য বিজ্ঞাপন থেকে কাগজ ও সংসার চালাতে হ'ত। লেখকদের টাকা দিতে পারতেন না। কিন্তু অন্যভাবে সে মূল্য শোধ করতেন। কি করে নবীন লেখককে উৎসাহ দিতে হয় তা জানতেন। 'সম্মিলনী'তে প্রথম গল্প আমার ছাপা হয় 'ছাতার আত্মজীবনী'—সেটি যতদূর মনে হচ্ছে কোন বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা। তার পরেই এই। মনে আছে এক জৈষ্ঠ্যের দুপুরে বৃদ্ধ কালীমোহনদা ছাতা মাথায় গলদ ঘর্ম অবস্থায় এসে হাজির হয়েছিলেন, ভাই গজেন আমি কি কাগজ তুলে দেব? তোমরা না বাঁচালে মারা যাব যে। তোমার গল্পের ভারী নাম হয়েছিল গতবার, আর একটা অমনি গল্প দাও ভাই, আজই দাও। নইলে কাগজ আর চালাতে পারব না। এবং বসে এই গল্প লিখিয়ে নিয়ে গেলেন। এই হল কালীমোহনদার পারিশ্রমিক দেওয়া—নবীন লেখকের কাছে টাকার চেয়ে ঢের দামী।

শুভবিবাহ গল্পটির মূলে একটু সত্য ইতিহাসও ছিল। ঘটনাটা ঘটে লাভপুরে তারাশংকরবাবুর দেশে। এ মহামারীর চেহারা একটুও অতিরঞ্জিত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রাম।

দশ বারো ঘর ব্রাহ্মণ, আট নয় ঘর কায়স্থ এবং মাত্র দুই ঘর বৈদ্য, বাকী সবই নীচু জাতের বাস। ইহারা প্রয়োজন মত ভদ্রলোকদের 'গোয়াল' বা 'কিষেণের' কাজে আসে—বলদ জুড়িয়া দূর গ্রামে গো-গাড়ী করিয়া লইয়া যায়, ইহাদেরই জমি ভাগে জমা লইয়া চাষ করে এবং ধান ঘরে তুলিবার সময় হিসাব বুঝাইতে মারা পড়ে। ইহা ছাড়া প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভোগা এবং মহাজনদের হাতে পায়ে ধরা—এ সব ত আছেই।

মহানন্দ দাস বৈষ্ণব। পূর্বে কি জাত ছিল তা এখন জানা যায় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমাদের আর জাত কি, বৈষ্ণবের দাস, এই আমাদের পরিচয়।

অভিজ্ঞ লোকেরা চোখ টিপিয়া বলেন, জাত হারালে বৈষ্ণব, তা জান না? ও সব কথা তোল কেন?

যেমন বেঁটে, তেমনি রোগা। চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি কামাইবার অভ্যাস আছে কিন্তু সে প্রায় একমাস অন্তর, বিধু পরামানিক যখন সুদের টাকা দিতে আসে তখনই—। ছোট একটা টিকি, গলায় মোটা তুলসীর মালা এবং নাসিকা ও ললাটে সূক্ষ্ম গোপী চন্দনের তিলক আঁকা।

একটি মেরজাই, সাবান দিয়া কাচিয়া পরিলে প্রায় দুই বৎসর যায়, অতএব ঐ সুবিধা! জমি জায়গা যে কিছু কিছু ছিল না তা নয়, কিন্তু সে বেশী নয় এবং তাহা অর্থ উপার্জনের মুখ্য পথও নয়। মহানন্দ যেদিন প্রথম এ গ্রামে বাস করিতে আসে সেই দিনই গ্রামের লোক কি করিয়া ধরিয়া ফেলে যে লোকটি মহাজন, এবং...বাঁচিয়া যায়। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত সকলকার দায়ে অদায়ে দেখিতে ঐ একটি মাত্র মহানন্দ দাস। লোকটা সুদ একটু বেশী নেয় সত্য কিন্তু অর্দ্ধরাত্রেও চাহিবামাত্র টাকা বাহির করিয়া দেয়। এ তল্লাটে যত মহাজন আছে মহানন্দের মত অত উঁচু মন কাহারও নয়, টাকা যতই না কেন বাকী পরিয়া থাক, উপযুক্ত বন্ধক দিলেই টাকা বাহির করে, কোনও কারণেই না বলে না। লোকটার যে কত টাকা তাহা রায় পাড়ার পণ্ডিত মহাশয় পর্য্যন্ত আন্দাজ করিতে সাহস করেন নাই, তবু তাঁহার 'শটকে' ও 'নামতা' ভাল করিয়াই পড়া আছে। তবে মহানন্দের বাড়ী কোনও দিন ডাকাত পড়ে নাই, সে কেবল এই একমাত্র কারণে যে, ডাকাতদেরও টাকা ধার করিবার প্রয়োজন হয়।

ভদ্রলোকেরা বন্ধক রাখেন গহনা, ছোটলোকেরা রাখে বাসন। জমি জায়গাও যে বন্ধক থাকে না তাহা নয় কিন্তু সে কদাচিৎ কখনও, নেহাৎ দায়ে পড়িলে তবে; কারণ

আদালতকে মহানন্দের বড় ভয়। তবু এই কয় বৎসরে মহানন্দের প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বিঘা ধানজমি দখলে আসিয়াছে ; কেনে নাই সে এক কাঠাও।

অলঙ্কার বন্ধকে সুদ বেশী, টাকাও কম। দশ টাকার অলঙ্কারে পাঁচ টাকার বেশী সে কোনমতেই ধার দিতে প্রস্তুত নয়, এবং সুদও টাকায় চার পয়সা। অথচ আনুমানিক দেড় টাকা মূল্যের থালা আনিলে এক টাকা পর্য্যন্ত কেহ কেহ পাইয়াছে। চৌদ্দ আনা ত বটেই। সুদও টাকায় তিন পয়সা হিসাবে ; কারণ যাহারা অলঙ্কার বন্ধক দিতে আসে তাহাদের হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত, দ্বিতীয়তঃ অলঙ্কার বিক্রয় করিতে সেই সদরে ছুটিতে হয়। বাসনের সুবিধা ঢের—স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়, ভাঙ্গিলেও ক্ষতি নাই—সুদের হিসাব বোঝানো কিষাণদের এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়, দ্বিতীয়তঃ বিক্রয় করা সুবিধা, বাসনওয়ালা নিত্যই গ্রামে আসে।

মহানন্দের সংসারের মধ্যে কন্যা পাঁচী ও পাঁচীর মা এই দুইটি প্রাণী। খরচ মোটেই বেশী নয়—ছেলে যে হয় নাই, ইহাতে মহানন্দ সুখীই ছিল, ছেলের খরচ কি কম? মেয়েকে শুধু খাইতে দিলেই চুকিয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি মেয়েকে লইয়াই অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। মেয়ে বড হইয়াছে, পাঁচীর মা বলে—বোধহয় ষেটের পনেরোই হবে। বাপ ধমক্ দেয়, তুই তো সবই হিসেব রাখিস! বারো হয়ত ঢের।...কিন্তু পাঁচী বড়ই হইয়াছে, সে কথা মহানন্দ নিজেও মনে মনে স্বীকার করে!

এ গ্রামে ঠিক ছোট জাত নয় অথচ বৈষ্ণব এমন পাত্র ছিল না। দূর গ্রামে পাত্র আছে, কিন্তু তাহারা বেশি টাকা চায়। টাকা পাইবে না শুনিলে পাঁচীর মায়ের বিবাহের তারিখ ও ঘটনাস্থল সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সুতরাং সুবিধা হয় না। চার পাঁচশ' টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা মহানন্দ মনে করে, মেয়ে মারিয়া ফেলা ভাল। মাঝে মাঝে বলে, ও আমার মেয়ে নয়—ছেলে! থাক ও ঘরে

কিন্তু পাঁচীর মা বলে, নাতি-নাতনি না হলে এত পয়সা কাকে ধরে দেবে শুনি?

—এত-ত কত পয়সা! নজর দিস্‌নি বলছি পাঁচীর মা যখন তখন। আজ যদি এক ভগবান না করুন, রোগ নাড়াই হয়, তাহলে ও কটা টাকা ত ওষুধেই উড়ে যাবে।

কিন্তু অত কষ্টের পয়সা পাঁচ ভূতে লুটিয়া লইবে মনে করিয়া রীতিমত শঙ্কিত হই ওঠে। কাজেই পাত্র শেষ পর্য্যন্ত খুঁজিতেই হয়।

অশান্তি যখন সত্য সত্যই এইরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে তখন একদিন ভগব মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেমন করিয়া তাহাই বলি—শরতের শেষ—সন্ধ্যায় দিকে একটু গা-টা কেমন শির শির করে—বাহিরের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া মহানন্দ তাম টানিতে টানিতে একটা সুদের হিসাব মিলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গয়েশ্বরীখানি ভারীভুরি, পাঁচীর মায়ের ভারি পছন্দ হইয়াছে, হিসাবটা মিলিলেই আর ফেরৎ দিব প্রয়োজন হয় না কিন্তু হিসাবটা বড় অবাধ্যভাবে মিলিতে চাহিতেছিল না।

শুধু কলকের পর কলকে তামাক পুড়িতেছিল। এই বাজে খরচটা মহানন্দ করিতে পারে নাই। বরং সে কথা কেহ তুলিলে বলিত, দুটো ত প্রাণী, মেয়েটার বি দিলেই পর হয়ে যাবে, একটা বাজে খরচ ত চাই-ই, নইলে এত পয়সা খাবে কে?

বাহির হইতে সাড়া আসিল, বলি দাসের পো আছ নাকি ?

যোগাই নাকি ? এস, এস, দোর খোলা আছে !

যোগাই ওরফে যোগেন এক বয়সী—সুখ দুঃখের কথা উহার সহিতই জমে ভাল।

যোগাই খদ্দরের চাদর গায়ে ঘরে ঢুকিল, এবং দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

মহানন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাদরের যে স্থানটা উঁচু হইয়াছিল সেই দিকে চাহিয়া কহিল, শুধুই তামাক খেতে এসনি, দরকার পড়েছে বুঝি ?

যোগাই অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, আচ্ছা সে হবে, হবে। আগে হুঁকোটা দাও দিকিনি যোগাই সৎজাত, গোয়ালা, হুঁকো তাহাকে দেওয়া চলে ; মহানন্দ হুঁকোটা বাড়াইয়া দিল। যোগাই মিনিট দুই নিঃশব্দে তামাক টানিয়া কহিল, গোটা দুই টাকা দিতে হবে এই রুপোর চরণচূড়টা রেখে।

মহানন্দ কহিল, কৈ দাও দেখি।

কিন্তু রুপার চরণচূড়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা থালাও বাহির হইল।

—এ সব আবার কি ?

—এটা সুবলের মা জোর করে গছিয়ে দিলে। বল কেন আর—বলে, যাচ্ছ ত অমনি এটা দিয়ে আমার জন্যে একটা টাকা নিয়ে এস—

সুবলের মা কাত্তরার মেয়ে—পাড়ায় অনেকের বাড়ী বাসন মাজার কাজ করে ; হার সহিত যোগাইয়ের নাম মিশিয়া একটা কুৎসা বাতাসে উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া াজকাল মিলাইয়া গিয়াছে।

থালাখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রদীপের আলোয় দেখিয়া মহানন্দ শুষ্কস্বরে হিল, ইস্কুলের ছেলেদের একটা থালা গতবার পুকুরের জলে হারিয়ে যায় আর ঁজে পাওয়া যায়নি। থালাখানা যা শুনেছি কতকটা এই রকমই দেখতে ছিল। াক্—সুবলের মাকে এই টাকাই দেব আমি, কিন্তু তিনটি আনা কেটে নিয়ে।

যোগাই 'ইস্কুলের থালা'র ধাক্কাটা সামলাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল, কেন ?

—আষাঢ় মাসে সুবলের অসুখের সময় যে কাঁসিখানা রেখে এক টাকা নেয়, া গত মাসে বেচে সুদ-আসলে আদায় হয়নি। তার দরুণ তিন আনা কেটে নেব।

—ও তিন আনা পয়সা না হয় ছেড়েই দাওনা বাপু !

চোখ প্রায় কপালে তুলিবার মত করিয়া মহানন্দ কহিল। সেই সময়ই আমার াড়েছে কিনা ! বলে টাকার অভাবে মেয়ের বিয়েই হচ্ছে না।

—হ্যাঁ ! টাকার অভাবে মেয়ে বিয়ে হচ্ছে না !...ভাল কথা, আজ বাঁকুড়ো থেকে াকদল লোক রামায়ণ গাইতে এসেছে শুনেছ ?

মহানন্দ কহিল, না শুনি নি !

—ওই বারোয়ারী তলার নিচে গাইবে। তা প্রায় দশ-বারো জনা লোক হবে ট ! সব বৈষ্ণব শুনলুম ; ঐখানে দেখ না, যদি পাত্তর জোটে !

—পোড়া কপাল ! রামায়ণের দলের লোকের সঙ্গে দেব মেয়ের বিয়ে !

কিন্তু টাকা দিয়া যোগাইকে বিদায় করার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা মাথার ধ্যে ঘুরিল। মহানন্দ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কথাটা যোগাই-এর কাছে যত সহজে ওড়ানো গেল—তত সহজে মন হইতে বিদায় লইল না। পরদিন অপরাহ্ণে মেরজাইটা সাবান দিয়া কাচাইয়া লইয়া মহানন্দ বেড়াইতে বেড়াইতে বারোয়ারী তলায় উপস্থিত হইল।

বিস্মিত হইল সকলে। নকড়ি ভটচাজ্ কহিলেন, ওই! এ যে মহানন্দ দেখছি কি মনে করে? তাগাদায় নাকি?

গৌরগতি বাবু (ইঁহার শালা কোথাকার মুন্সিফ) কহিলেন, না হে না, পরকালের কথাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ঐ সে আমার সম্বন্ধী বলত না—

মহানন্দ হাসিয়া কহিল, না শরীরটাও ভাল ছিল না, আর ভাবলুম এত দূর থেকে এসেছে ভগবানের নাম শোনাতে—একবার যাওয়া যাক্! তাঁকে ত ভুলেই আছি—

দলের মূল গায়ক যে তাহার বয়স বোধ করি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইবে। দাড়ির মত পাকানো চেহারা—সামনের দিকে যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অল্প দাড়ি আছে—তার কয়েক গাছি এখনও পাকে নাই। গলায় বেশ পুরু গোছের তুলসীর মালা।...সঙ্গের বাকী লোকদের মধ্যে ষাট হইতে আরম্ভ করিয়া ষোল পর্য্যন্ত সব বয়সেরই লোক ছিল। তার মধ্যে দুই একটি দেখিতে ভালই।

একটু পরেই গান আরম্ভ হইল। রামায়ণের কথা যেমন করিয়াই বলুক ভাল লাগে—ইহারা ত তবু মন্দ গাহে না। কিন্তু সেদিকে মহানন্দের মন ছিল না, মূল গায়েনের সম্মুখের থালাটি কেমন করিয়া পয়সা ও আধলায় ভরিয়া উঠিতেছিল, সেই দিকেই তাহার দৃষ্টি একাগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা শুনিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব. ইহাদের অনেককে সত্য সত্যই মাসে কুড়ি দিন শুধু নুন দিয়া ভাত খাইতে হয়, তাহা সে ভাল করিয়া জানিত, প্রায় সকলেই তাহার নিকট টাকা ধারে—অথচ পয়সা, আধলা আনি পর্য্যন্ত অবিরাম পড়িতেছে, পাশের ধামাটা চাল, আলু, লাউ, বেগুন ও মশলায় প্রায় ভরিয়াই গিয়াছে। থালায় যে পয়সাগুলি জমিয়াছে তাহার একটা কাল্পনিক মোট হিসাব মনে মনে ঘুরিয়া সুদে আসলে বৎসরান্তে কত দাঁড়ায় সেই অঙ্কের রূপ ধারণ করিল। সে অঙ্ক যেন ক্রমশঃ বাড়িতেছে—পয়সা হইতে টাকায়, টাকা হইতে গিনিতে তাহারা যেন চারি পাশের সমস্ত লোককে ছাইয়া ফেলিল। সহসা যেন মনে হইল নিজের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ ইহাদের কাছে তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর। সে আর বসিতে পারিল না; অকারণে পাশের লোককে 'মাথা ধরেছে' এই মিথ্যা জবাবদিহি করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল!

পাঁচীর মা শুনিতে যায় নাই—শুনিতে চাহিলেও মহানন্দর কাছ হইতে পয়সা আদায় হইবে না, অথচ খালি হাতে শুনিতে যেন লজ্জা করে। যাহারা পয়সা দেয় তাহারা যে চামরের স্পর্শ লইয়া ফিরিবার সময় বিশেষ করিয়া তাহারই দিকে চায়। এরূপ ঘটনা ইহার আগে ঘটিয়াছিল।

তাই সে রীতিমত আশ্চর্য হইল মহানন্দ যখন রাতে ফিরিয়া কহিল, গান শুনি গিয়েছিলাম।

চক্ষু যুগল যতদূর সম্ভব বিস্ফোরিত করিয়া পাঁচীর মা চাহিয়া রহিল, তাহার পর স্বরে প্রশ্ন করিল, কেমন গায়?

—ছাই গায়। খালি পয়সা কুড়োবার মন্তর। লোকের যত নাকে কান্না আমার কাছে এসে। সুদ আমি আর কত নিই?

পাঁচীর মা প্রতিবাদ করিল না—শুধু একটু মৃদু হাসিয়া নিজের কাজে গেল। কিন্তু মহানন্দ সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিল যেন এক বস্তা টাকা সে কোথা হইতে লইয়া আসিতেছিল পথে হনুমানে কাড়িয়া লইয়াছে।

পরদিন সকলের দিকে খানিকটা গড়িমসি করিয়া বেলা আটটা নাগাদ সে বারোয়ারী তলার দিকে যাত্রা করিল। অধিকারী বাহিরে রোদে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের চটটা বিস্তৃত করিয়া দিল।

অতিথির পরিচয় সে ইতিমধ্যেই পাইয়াছে। যে লোকটা ইহাদের বাসন প্রভৃতি মাজার কাজ করিতেছে সে দূর হইতে দেখিয়া কহিয়াছিল—ওই?

মহানন্দ দাস এদিকে আসে কেন?

—মহাজন মশাই! মেলা টাকা!

মহানন্দ চটে বসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, মশাইয়ের নাম?

—আমার নাম রাধাগোবিন্দ দাস। বৈষ্ণব। মহাশয়ের?

—আমার নাম মহানন্দ দাস—আমিও বৈষ্ণব।

—আসুন।

রাধাগোবিন্দ হুঁকা বাড়াইয়া দিল। মহানন্দ কহিল—আপনাদের বাড়ী শুনলাম বাঁকুড়ায়।

—সবাইয়ের লয়। তবে দল আমাদের বাঁকুড়ার। মানে আমার বাড়ী বাঁকুড়ায়।

খানিক তামাক টানিবার পর মহানন্দ প্রশ্ন করিল—কি রকম রোজগার-পাতি হয়?

—আর মশাই রোজগার! আগে খুবই ছিল। দৈনিক পাঁচ টাকা হ'ত—। এখন দেড় টাকা সাতসিকে হয় না। লয় পাঁচকড়ি?

ষোল-সতের বৎসরের একটি ছেলে কলাইয়ের বাটিতে চা খাইতে খাইতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে-ই পাঁচকড়ি। সে সায় দিয়া কহিল, তাই ত! কাল প্রথম দিন, তাই মোটে দু'টাকা হয়েছে—

পাঁচকড়ি সরিয়া গেলে মহানন্দ কহিল, এদের কি রকম কি দিতে হয়?

—কেউ চার পয়সা রোজ, কেউ ছ'পয়সা রোজ আর খাওয়া; বাকি সব আমার।

রাধাগোবিন্দ সন্দিগ্ধভাবে চাহিতেছিল। মহানন্দ কথাটা চাপা দিয়া কহিল, সবাই কি বৈষ্ণব?

—হ্যাঁ, তা প্রায় সবাই!

—বিয়ে হয়েছে সকলের?

—সব। সব। এক এই পাঁচকড়ি ছিল বাকি, ওরও গেল আষাঢ়ে হয়ে গেছে। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া—নাঃ ঘর মশাই এক আমারই খালি, তা ছাড়া সবাইকারই ভর্ত্তি আছে।

মহানন্দ সমবেদনার সুরে কহিল,—আপনার কি পরিবার নেই?

আবারও দীর্ঘশ্বাস—

—নাঃ! প্রথম পক্ষকে ষোল বছরেরট করলুম, সইল না। দ্বিতীয় পক্ষটি যা হোক ঘরকন্না করলেন, তা তিনিও গত বৈশাখে ফাঁকি দিলেন।... ..তাও যদি একটা ছেলেপুলে থাকত তা হলেও ভুলে থাকতুম।......আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না।

মহানন্দ কহিল, তা ত বটেই!...আহা!

রাধাগোবিন্দ হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া কহিল, কেন বিয়ের খোঁজ করছিলেন কেন? মেয়ে আছে নাকি?

—হ্যাঁ, আমারই মেয়ে। যাই, আজ উঠি, বেলা হয়েছে!

রাধাগোবিন্দ কহিল, বিকেলে আসবেন কিন্তু। বৈষ্ণবের চরণ দর্শন কত ভাগ্যে তবে মেলে।

মহানন্দ বিরস মুখে বাড়ির রাস্তা ধরিল। একটা তবু আশা ছিল, তাহাও গেল।

বাড়ী ফিরলে পাঁচীর মা পা ধুইবার জল দিয়া কহিল, কোথায় গিয়েছিলে গো?

—ঐ বারোয়ারী তলায়। ওখানে আমাদের জাতের লোক এসেছে বিস্তর—তা খোঁজ খবর করতে গিয়েছিলুম!

—হ'ল কিছু?

মহানন্দ মুখ বিকৃতি করিল—নাঃ সব বিয়ে হয়ে গেছে—। তারপর খামব অযাচিত ভাবেই বলিল, যাই বলো বাপু, অধিকারীর কিন্তু অনেক টাকা! চারটি ব পয়সা দলের লোকেদের দিতে হয়, বাকী সব ওর—অবিশ্যি যাওয়া আসার খরচ আ কিন্তু সে আর কত?

কন্যার বিবাহের সহিত অধিকারীর টাকার কি সম্বন্ধ ভাবিয়া না পাইয়া পাঁচীর ম রান্না ঘরে চলিয়া গেল। মহানন্দও পা ধুইয়া ঘরে আসিয়া খাতার সম্মুখে বসিল কিন্তু হিসাবে মন লাগল না। এমন কি হারাণ ডোম একটা ঠাকুর বাড়ীর বাটী বাঁ দিয়া চার আনা পয়সা লইয়া গেল, তাহাকে গত মাসের সুদের কথাটা একবার ব পর্য্যন্ত হইল না।

অপরাহ্ণে মহানন্দ কহিল, যাবি নাকি গান শুনতে?

পাঁচীর মা কহিল, হ্যাঁ পয়সা-কড়ি দেবে না, শুধু হাতে আমার বড় লজ্জা করে?

মহানন্দ সহসা উদার হইয়া উঠিল। কহিল, মোহন শেখ আজ একটা লাউ দি গেছে না? ঐটেই নিয়ে চল্—দিবি।

তখনও গানের দেরী ছিল। মেয়েদের দিকে স-কন্যা পাঁচীর মাকে পাঠাইয়া দিয় নিজে পুরুষের দিকে বসিতে যাইতেছিল, রাধাগোবিন্দ দেখিতে পাইয়া স-কলর অভ্যর্থনা করিল, এই যে, এই যে, আসুন, আসুন, সামনে বসুন।

হরিচরণ টিপ্পনি কাটিলেন, মহানন্দর কি সত্যিই ধর্ম্মে মতি হ'ল নাকি হে?

গৌরগতি কহিলেন, আমার সম্বন্ধী বলে, বয়স বাড়লেই মরণের ভয় হয়, ও তা কিন্তু গায়েন অত খাতির করে কেন হে?

রাধাগোবিন্দ তখন কহিতেছিল, বাবুদের বাড়ী থেকে গিন্নীমা বলে পাঠিয়েছেন

চারদিন ওঁর বাড়ীতে কথা হবে। কুড়িটি টাকা নগদ আর একটা গরদের জোড, প্যালা যা পড়বে সব আমার।

মহানন্দ কহিল, বলেন কি?

—এ আর এমন বেশি কথা কি?—সুপুরের বাবুরা গত বছর আমার পরিবারের জন্যে পর্য্যন্ত এক জোড়া শাড়ি দিয়েছিল।

গান আরম্ভ হইল। কিন্তু মহানন্দের মনে হইতে লাগিল কুড়ি টাকা অনেক টাকা। সহসা যেন মনে হইল খঞ্জনীর বোলে টাকাই বাজিতেছে·

পরদিন সকাল বেলায় পাঁচকড়ি খুঁজিয়া খুঁজিয়া মহানন্দের বাড়ী গিয়া উপস্থিত। সবে স্নান করিয়াছে, টেরি দিয়া অপর্য্যাপ্ত তেল ও জল তখনও গড়াইতেছে।

হাতে একটা বড় গোছের থালা, তাহার উপর পরিপাটী করিয়া একটা সিধা সাজানো, চাল, ডাল, আনাজ,—মায় ঘি তেল পর্য্যন্ত। তাহার সহিত একখানি ধোয়া নূতন ধুতি।

পাঁচকড়ি থালা নামাইয়া কহিল, বাবাজী পাঠিয়ে দিলে, চান করে এনেছি আমি, ঠাকুরের সেবা প্রসাদ পাবেন।

কথাগুলি মুখস্থের মতই শোনাইল, এত সকালে স্নান করানোর জন্য পাঁচকড়ির মনটা বাবাজীর উপর একটু অপ্রসন্ন ছিল। যদিও তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না, পাঁচকড়ি স্নান না করিয়া আসিলেও সিধার উপকরণগুলি যাহারা দিয়াছে তাহাদের কথা মহানন্দের জানা ছিল এবং আপত্তি ছিল না।

যথারীতি 'একি' 'একি'—এ সব আবার কেন? অপরাধী করা হয় ইত্যাদির পর মহানন্দ বাড়ীর ভিতর থালাটি লইয়া গেল।

পাঁচীর মা শুনিয়া অবাক হইয়া কহিল, সে কি গো, তুমি ওদের দেবে, না ওরা তোমাকে দিলে।—

মহানন্দ শুধু কহিল, হুঁ। থালাটা মেজে দে—

ইহার পর আরও দুই-চারদিন আসা যাওয়া এবং জিনিষপত্র আদান প্রদানের পর সহসা একদিন দমকা হাওয়ার মত বাড়ী ঢুকিয়া মহানন্দ কহিল, সাধে কি ভগবানকে ডেকেছিলি পাঁচীর মা, এতদিনে পাঁচীর আমার পাত্তরের মত পাত্তর জুটল—পাঁচীর মা পুলকিতভাবে রান্না ঘরের বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন করিল,—ওমা, কোথাকার পাত্তর গো? কে সম্বন্ধ আনলে?

মহানন্দ কহিল, সাত পুরুষে বৈষ্ণব ওরা, ওর পিতামহ ছিলেন লোচন দাসের সাক্ষাৎ শিষ্য, কত জন্মের পুণ্যি থাকলে তবে ওরা বাড়ীতে পা দেয়—

পাঁচীর মা কহিল, কে গো, তাই বলো না?

মহানন্দ কাল সারারাত্রি জাগিয়া মনে মনে রিহার্স্যাল দিয়া রাখিয়াছে, সে অত সহজে কথা ভাঙ্গিবে কেন? সে কহিল—আর পয়সাই কি সামান্য? এই গাঁ খানার মত একখানা গাঁ কিনে ফেলতে পারে। ওদের আয় কত?

পাঁচীর মা এবার ধৈর্য্য হারাইল, মরণ আর কি—আসল কথা কিছুতেই বলবে না খালি যত বাজে কথা—কে, কি বিত্যান্ত, নেশাখোর কি মাতাল তার ঠিক নেই—

—বলিস কি পাঁচীর মা? জিভ খসে যাবে যে। মহাপুরুষ লোক ওরা—

দুই হাত জোড় করিয়া মহানন্দ উদ্দেশে নমস্কার করিল। পাঁচীর মা যখন নিতান্ত রান্না ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে তখনই কথাটা ভাঙ্গিল, আমাদের এই বাবাজী, ঐ যাঁর রামায়ণ গাইতে এসেছেন না, তাঁদেরই অধিকারী রাধাগোবিন্দ, উনি আমার পাঁচীকে চরণে স্থান দিতে রাজী হয়েছেন।

বিস্ময়ে কিছুকাল বাক্যস্ফূর্তি হইল না, তাহার পর পাঁচীর মা সপ্তমে চড়িল—তুমি পাগল হয়েছ, না দেহে সত্যিই মানুষের নেই? এঁ্যা—! ঐ বাহাত্তুরে বুড়োর সঙ্গে দেব পাঁচীর বিয়ে! এঁ্যা! বাপ হয়ে কি করে মুখে আনলে গো!

—অমন নিজ্জলা মিথ্যে কথাগুলো মুখে আনিসনি পাঁচীর মা, অপরাধ হয়। বলি মানুষ আমরা চিনি না? চল্লিশের ওধারে কিছুতেই নয়। কেমন ঢলঢলে চেহারা, বরং আরও কম মনে হয়।

পাঁচীর মা গালে হাত দিয়া কহিল, পোড়ার দশা। ঐ শেষ কাঠ মিনষেকে বলে ঢলঢলে চেহারা! ও সব হবে-টবে না বলে দিলুম—এইবার নিজমূর্ত্তি ধরব—

—হায় রে! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। একে ত এতগাদা টাকা চায় তাও না হয় ধার-কর্জ্জ করে দিলুম, কিন্তু যার সঙ্গেই দেবে সে-ই পাঁচীকে নিয়ে চলে যাবে। বলি পাঁচ সাতটা নয় ঐ একটা, তাও যদি চোখের আড়াল হয় তা হলে আর মাগ বাঁচবে না, কেঁদে কেঁদেই মরবে। তার চেয়ে, মরুকগে, বললে যে দেশের জমি জায়গা বেচে সব টাকা এনে আমার হাতে দেবে—আর এইখানেই থাকবে—ভাবলুম ভাল হ'ল, বয়স একটু বেশ—তা আমার পাচীই বা কি ছেলে মানুষ?

পাঁচীর মা রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে কাছে আসিয়া কহিল, তবে রে হাভাতে! টাকা নিয়ে মেয়ে বেচছ! আবার মেয়ের বয়স দেখছ! ঐ বাহাত্তুরের সঙ্গে আমার দুধের মেয়ে পাঁচীর তুলনা? —টাকা সঙ্গে যাবে—? আজই যদি দাঁত ছিরকুটে হয়ে যাও, টাকা কোথায় থাকবে রে? বেরো আমার সামনে থেকে—

মহানন্দ এতখানি বয়সে পাঁচীর মায়ের এমন মূর্ত্তি দেখে নাই, সে বুঝিল যে এ মতে চলিবে না! আর কথা না কহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘরে গিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল—

দুপুরে আসিল পাঁচী ডাকিতে—বাবা, ভাত খাবে চল।

—ভাত আজ আর খাব না। শরীরটা ভাল নেই।

পাঁচীর মা বুঝিল, কহিল, ইঃ বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। না খেলে, আয় আমরা খেয়ে নিই।

কিন্তু রাত্রেও যখন খাইল না, তখন পাঁচীর মা প্রমাদ গণিল। নিজেই আসিল সাধিতে কিন্তু মহানন্দের সেই কথা, এ প্রাণ আর রাখব না পাঁচীর মা, বাবাজীকে আমি কথা দিয়েছি—সে কথার নড়চড় আমার জীবন থাকতে হবে না। তার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। জীবনে কখনও কথার খেলাপ করিনি, জানিস্ ত!

পাঁচীর মা তিরস্কার করিল, অনুনয় করিল, অভিমানে কাঁদিল, কিন্তু মহানন্দ অটল।

সে জানিত যে স্ত্রীলোকের মন টলাইতে হইলে পুরুষের শুধু একটু দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন হয়—আর কিছু নয়। ঘটিলও তাই—দূর ভবিষ্যতে কন্যার বৈধব্যের অপেক্ষা

ৰ্তমানে নিজের বৈধব্যের ভয়ই প্রবল হইল, পাঁচীর মা রাজী হইল। কন্যার অভিমানের হ খোঁজ লইল না, কন্যার মাতার অভিমান ভাসিয়া গেল, মহানন্দেব অভিমানটা বড় ইয়া উঠিল।··

লেখাপড়া হইল—রাধাগোবিন্দ দাস, পিতা ৺নটবর দাস, সাকিম মৎসহরি গ্রাম. না রামসাগর, জিলা বাঁকুড়া, জাতি বৈষ্ণব, পেশা কথকতা।

এতদ্বারা খোস মেজাজে, বহাল তাবয়তে, কন্যার বিনানুরোধে প্রতিশ্রুত হইলেন যে হানন্দ দাস মহাশয়, পিতা ৺ছ'কড়ি দাস, সাকিম ইত্যাদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কন্যা মতী পাঁচুবালার সহিত উক্ত রাধাগোবিন্দ দাসের বিবাহ দিলে রাধাগোবিন্দ দাস খনও পাঁচুবালাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারিবে না এবং দেশের যাবতীয় জমি যগা বিক্রয় করিয়া সমস্ত টাকা পাঁচুবালাকে দিবে এবং পাঁচুবালার অভিভাবক বিধায় া মহানন্দের কাছেই থাকিবে। মহানন্দ দাস উক্ত টাকার মধ্য হইতে কিছু টাকায় য জমির ওপর কন্যা পাঁচুবালার জন্য পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন— ইত্যাদি।

গ্রামে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। মহানন্দ পুরুষদের ধমক দিয়া বলিল, বাবুরা র এক পয়সা সুদ দিতে হ'লে ত মরে যান। কৈ, কেউ মেয়েব বিয়ে দিয়ে দিতে রেছিল ? · হুঁ।

মেয়েরা পাঁচুর মাকে বিবিধ ছন্দে কথা শুনাইতে লাগিল। পাঁচীর মাব শুধু নীরবে শ্রুবিসর্জন কবা ছাড়া আর উপায় ছিল না। মহিলাবা বিদায় লইলে মহানন্দ ভিতরে সিয়া তর্জ্জন করিত—হিংসে, হিংসে, জানিস্ পাচীর মা, কোন রকমে একটা সুপাত্র াগাড় কবেছি ত সব হিংসেয় ফেটে মরছে। ঐ ত ও পাড়ার বদে মহি. দেয়ান টের মড়াব সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ?·· ও সব আমার দেখা আছে।

কিন্তু এত সব মূল্যবান কথাতেও পাচীব মা শান্ত হইতে পারিত না। না হোক্ াহাতে মহানন্দেব কিছু যায় আসে না। কণ্ঠীবদল করা তাহাদেব সমাজে চলিত আছে -পাঁচীর যদি টাকা থাকে তবে তাহার কণ্ঠীবদলের লোকও জুটিবে। কিন্তু পরে কি ইবে ভাবিয়া এখন এতগুলা টাকা ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

পাত্রেব সংসাবে থাকিবার মধ্যে এক ভাই আছে। আবও জ্ঞাতি এবং কুটুম্ব-জন আছে। রাধাগোবিন্দ সবিনয়ে ভাবী শ্বশুবকে কহিল—তাদের ত একটু খবর দওয়া লাগে।

মহানন্দ কহিল—নিশ্চয়। নইলে কেউ কোথাও আসবে না, নিমুড়ো-নছুড়ো করে মি মেয়ের বিয়ে দেব নাকি ?

স্থির হইল সংবাদ লইয়া পাঁচকড়ি যাইবে এবং পুরুষ ও স্ত্রী লোকের মধ্যে যাহারা াসিতে ইচ্ছা করে ঐ পাঁচকড়িই লইয়া আসিবে।

এ ধারে বিবাহের আর একটি ছাড়া দিন নাই অগ্রহায়ণ মাসে—সামনে অকাল ! বং সে দিনটিও আগতপ্রায়। সুতরাং উভয় পক্ষের যাবতীয় উদ্যোগ—আয়োজন াচীর মা একাই করিতে লাগিল। বরযাত্রী একেবারে বিবাহের দিন সকালে আসিয়া পৌঁছিবে। উভয় পক্ষের আহারাদির যথেষ্ট ঘটা—সমগ্র গ্রাম নিমন্ত্রণ হইবে। রযাত্রী আসিয়া সকালে খাইবে—তাহার একরূপ আয়োজন, আবার রাত্রে বিবাহের

খাওয়া, তাহার অনুরূপ আয়োজন, এমন কি, একথাও কানাঘুষা চলিতে লাগিল যে রাত্রের ভোজ রাবড়ি পর্যন্ত হইবে !···রাধাগোবিন্দের সঙ্গেই যে অত টাকা ছিল, তাহা মহানন্দ কল্পনাও করে নাই।

বিবাহের দিন আসিল—বরযাত্রীও আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা বার বার খাইল এবং কিছু কিছু বাঁধিল। খালি ভাই লেখাপড়ার কথাটা কি করিয়া জানিতে পারিয়া সহস্র তিরস্কার করিতে লাগিল। দেশের জায়গা জমিগুলি তাহার হাতেই চিরকাল থাকিবে—এই কথাই সে জানিত। রাধাগোবিন্দ তাহার পায়ে হাতে ধরিয়া শেষে কিছু নগদ টাকা দিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া ঠাণ্ডা করিল।

বিবাহের সময় আসিল। গ্রামের লোক কেহ বা যোগ দিল, কেহ বা দিল না, কিন্তু তাহাতে মহানন্দের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না।

বাবুদের বাড়ী হইতে বিবাহ উপলক্ষে একটি চেলির জোড় রাধাগোবিন্দ উপহার পাইয়াছিল, সেইটি পরিয়া, ঐটুকু পথ তাও পাল্কী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্বিঘ্নে চার হাত এক হইয়া গেল। খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা কিছুরই ত্রুটি হইল না—মায় বাসর ঘরে নাচ পর্যন্ত। শুধু পাঁচী সেই যে গোড়া হইতে ঘাড় নীচু করিয়াছিল, তাহাকে কেহ আর ঘাড় তোলাইতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে নূতন জামাতা মুখ ধুইতে ধুইতে তাহার সৌভাগ্যের কথা ধারণা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচীর যৌবনপুষ্ট চেহারাটা কাল হইতে মনে হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন তাহার সর্বদেহে আলোড়ন দেখা দিতেছে। একটা আনন্দের স্রোত বুকের মধ্যে দিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেই পুলকহিল্লোল যেন ক্রমে বাতাসে ছড়াইয়া যাইতেছে, রেণু রেণু হইয়া বিশ্বের প্রতি অনুতে মিশিতেছে—

সংবাদ আসিল, পাঁচকড়ি সকালে উঠিয়া বার-দুই পায়খানায় গিয়া এবং একবার বমি করিয়া কেমন যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। দুইবার সুদীর্ঘ পথ রেল-ভ্রমণ, উপর্যুপরি আহার এবং রাত্রি জাগরণই অবশ্য তাহার কারণ—

বক্তার বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল। রাধাগোবিন্দের মনে হইল তাহার বুকের আনন্দ সব যেন এক হইয়া পেটের মধ্যে গিয়া তাল পাকাইতেছে—

শেষে যেন সর্বদেহ অন্যভাবে আলোড়িত করিয়া বমনের আকারে বাহির হইল—

—ওমা, নতুন জামাইও যে বমি করছে গো !

সার্কেল অফিসার ও হেল্‌থ্ অফিসার আসিয়াছেন।

হেড্ মাস্টার বুঝাইতেছিলেন যে বোর্ডিং-এর চারিপাশে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো আবশ্যক। এতগুলি ছেলের শুভাশুভ—

—সব সুদ্ধ ক'জন পড়েছে ?

—বোধ হয় জনা সাত-আটের হয়েছে। গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে কি না !

রামায়ণ দলের অধিকারী আর ছোঁড়াটা মরেছে—আর একটা লোকও পড়েছিল, গাঁজা খেয়ে বেঁচে উঠেছে। তা ছাড়া নিবারণবাবুর নাতনী মরেছে আর কারো খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে শুনেছি মহাজন দাস মশাই-এর অবস্থাও খুব খারাপ।

গৌতম রায়

১৯৩৯ সালে গৌতম রায়ের জন্ম

নিতান্ত ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকা ও লেখার প্র • ঝোঁক। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ শিল্পী হিসেবে গৌতম রায়ের পরিচিতি।

আঁকার ফাঁকে ফাঁকে শ্রী রায়ের সাহিত্যে প্রবেশ।

নিজের প্রথম গল্প প্রসঙ্গে / গৌতম রায়

নায়ক গল্পের নায়ক পরমানন্দ। তার আসল নাম পরমানন্দ নয়। কারণ তাকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। সেই ছোটবেলা থেকে। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। ক্লাস সেভেনে একটি নতুন ছেলে এল। নাম অনিল। কিছুদিন পরই সে আমাদের বন্ধু হয়ে গেল। রোগা রোগা একহারা চেহারা। সন্ধ্যেবেলা অনিল এসে হাজির। এসেই আমার পড়ার বই-টই এলোমেলো করে বলল, 'তোদের ছাই হবে'। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও আবার বলল, 'পাশের পড়া করছিস ? প'ড়ে ছাই হবে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে ?'

'মানে ?' মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'বি. এ., এম. এ. পাশ করবি। তারপর কোথাও এক জায়গায় কেরানীর চাকরি পাবি। বড় জোর তিনশ, চারশ—ব্যস তোদের জীবনের সব শেষ—আমি চললুম।'

'চললুম মানে—কোথায় ?'

'বোম্বে'—

'মানে ?'

'সাইড হিরো। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কি ? সত্যি।'

'ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন সিনেমার হিরো হবার। এবার সুযোগ এসে গেছে। সাইড হিরোর পরই আসল হিরো। অতএব বাই বাই।'

অনিল আমাকে 'বাই বাই' করে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন সে কাঁটার মত বিঁধেছিল। কারণ তার পারিবারিক অবস্থা আমি কিছুটা জেনেছিলাম। যা আমার গল্পে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এ গল্প যখন লেখা, তখন তাকে যতটুকু দেখেছি ততটুকুই লিখেছি। ১৯৫৫-এ 'নায়ক' আমার প্রথম লেখা গল্প। যদিও ছাপা হয়েছে অনেক পরে। এবং যখন গল্পটি ছাপা হয় তখন অনিলকে নিঃশেষিত দেখেছি। দেখেছি ছায়াছবির রূপোলী মায়ার প্রতারণায় সে কিভাবে নিজেকে ঠকিয়েছে। হাজার প্রবঞ্চনার ইতিহাস তার যুবকমুখে বৃদ্ধের ছায়া ফেলেছে। কিন্তু 'নায়ক' গল্প আমি আর পাল্টাইনি।

অনিলকে ধন্যবাদ। সেই আমার প্রথম গল্প লেখার অনুপ্রেরণা।

নিজেকে সে প্রায়ই কোন না কোন সিনেমার নায়কের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে হাঁটতে
লতে এবং কথা বলতে ভালবাসে। এবং এই কল্পনাটা যখনই তার মনে আসে তাকে
বশ উৎফুল্ল এবং পরিতৃপ্ত মনে হয়। অথচ সে জানে এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দটুকু আরো
ক গভীর বেদনার পক্ষে যথেষ্ট। এবং সে তার আগামী বেদনার ইঙ্গিত পাওয়া
ত্বেও কোন মতেই মুহূর্তের স্বল্প আনন্দটুকুকে নষ্ট করতে রাজী নয়।

অসীমের মাইনে হয়েছে তিনদিন এবং গতকাল রাতের কথা অনুযায়ী নিশ্চয়ই এরই
ধ্যে তার সব ফুরিয়ে যায়নি। ভেবে দেখল পরমানন্দ। এখন বাজে বারটা।
াত ঘড়িতে চকিতে তাকিয়ে নিল সে। স্কুল ফাইন্যাল পাশের পর বাবা নিজের
াতের ঘড়িটা খুলে দিয়েছিলেন। তার পর থেকে বাবা আর ঘড়ি পরেননি।
সই পরে। ঐ ঘড়ি নিয়েই সে ইন্টারমিডিয়েট আর বি কম পাশ করেছে। এবং
তারও পর গত পাঁচ বছর সে কোনরকম চাকরী না পেয়েও এবং ঘড়িকে কোন রকম
তল ইত্যাদি পরিবেশন না করেও স্লো ফাস্ট-এর মাধ্যমে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। অথচ
খনও কিছু করা হয়ে উঠছে না। ইস্ত্রি করা জামা কাপড়গুলো কবে থেকে যে
শ্রীহীন হয়ে অঙ্গে উঠতে শুরু করেছে সেটা সে আপাতত সঠিক বলতে পারে না।
াঝের এক ইলেকশনে কোন একটা দলের হয়ে খেটে কিছু বাড়তি রোজগার হয়েছিল—
তাতে টেরিলিনের শার্ট আর প্যান্টটা হয়ে গিয়েছিল।

পরমানন্দ ভাবে, টেরিলিনটা যে আবিষ্কার করেছিল লোকটা নিঃসন্দেহে দরিদ্র-
হিতৈষী। কিনতে হয়ত খরচ হয় একটু বেশী কিন্তু সেলাই কেটে না যাওয়া পর্যন্ত এবং
চারমিনারের ফুলকি লেগে কয়েকটা জায়গায় ফুটো হওয়া ছাড়া টেরিলিন অনবদ্য।

পরমানন্দ দ্রুত পা চালায়। এখন বাজে বারোটা। স্লো ফাস্ট হলেও দু পাঁচ
মিনিট এদিক ওদিক হবে। তাতে কিছু যাবে আসবে না। অসীমের লাঞ্চ হতে সেই
একটা। জোরে হাঁটলে ওকে পাকড়ানো যাবেই। কলেজ স্ট্রিট থেকে জি পি ও।
বাসে গেলে দশ পয়সা। ভাড়াটা মারতে পারলে পয়সা এবং সময় দুটোই বাঁচে।
কিন্তু বেলা বারোটার বাসে ভাড়া না দিয়ে টুস করে নেমে যাবার মতো শিল্পটুকু সে
এখনও রপ্ত করে উঠতে পারেনি। এবং ঠিক নামার মুহূর্তে কনডাকটর ভাড়া চাইলে
কর্ণ এবং গণ্ডদেশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। খাঁকি জামা প্যান্ট পরা লোকটা নিশ্চয় তার
তার সম্বন্ধে ততক্ষণে ধারণা করে নিয়েছে, 'এ সেই সব ছ্যাঁচড়া ডাবলিউ টি পার্টি'র'
লোক।

তাই পরমানন্দ প্রায়ই ফাঁকা ট্রামে বা বাসে উঠে কনডাকটর ভাড়া চাইবার আগেই
তার ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে জানলার বাইরে মুখ করে বসে থাকে।

কনডাকটর দ্বিতীয় বার পয়সা চাইলে প্রথমে সে খানিকক্ষণ বোকার মত ফ্যাল ফ্যা
করে তাকিয়ে থাকে। তারপর এ পকেট সে পকেট হাতড়ে পয়সা দেবার ভঙ্গী
টিকিটটাই তার হাতে গুজে দেয়। খচে যাওয়া লোকটা বিড়বিড় করতে করতে চ
যায় আর পরমানন্দ হৃষ্টমনে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।

এর দ্বারা সে যে ঠিক কোন ধরনের মানসিক তৃপ্তি পায় তা নিয়ে তেমন বি
ভাবেনি তবে বিশেষ এক ধরনের খচরামি করে মনের জ্বালা মেটানোর সুখ পায় এ
সে উপলব্ধি করেছে।

একটা চারমিনার ধরিয়ে পরমানন্দ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, কনডাকটর
ভদ্রলোকেদের ইজ্জত ছিনতাই এর ফিকিরে আছে সর্বদা। ঠিক নামার মুহূর্তে হন্তদ
ভদ্রলোকের কাছে ভাড়া চাইবে এবং বিব্রত ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে তাকি
মুচকি হাসবে মনে মনে। কিংবা হয়ত কনডাকটর টের পেল কোন যাত্রীর পয়
দেবার ক্ষমতা নেই অথচ তাকে বাসে উঠতে হয়েছে। বেছে বেছে সেই লোকটি
কাছেই কনডাকটর ভাড়া চাইবে এবং তাকে দু চার কথা শুনিয়ে বাস থেকে নামি
দেবে।

আঃ এই চারমিনারগুলো এত গাঁট বাজ!

পরমানন্দ বিরক্তিতে সিগারেটটা জোরে টানতে থাকে। আর গাল দুটো প্র
চুপসে যায়। ধোঁয়া আসছে না। আগুনটা একটা গাঁটে আটকে গেছে। রা
কাট টোস্টেড টোবাকো। কোথায় যে কখন গাঁট পড়ে। মনে হয় নিভে গে
জলে ভেজা মরার কাঠের মত। নিভু নিভু ধুকছে।

নাটকীয় কায়দায় দু আঙুলের আলতো টোকায় পরমানন্দ গাঁট মুক্তো ক
সিগারেটটা। আবার ধরাতে হবে। গাঁটটা যাবার আগে আগুনটা নিবে গেছে।

রাস্তা পার হয়ে পরমানন্দ হিন্দি ছবিতে তার ফেভারিট হিরোর মতো ইলেকট্রি
পিলার বক্সের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। এবং নবতম এক কায়দায়, যেটাকে ও স
নিজস্ব কায়দা বলে বন্ধু মহলে জাহির করে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার ঘনিষ্ঠ আঘাতে ম
কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায় এবং আরো চমকপ্রদ কায়দায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিক
তাচ্ছিল্য আঘাতে দূরক্ষেপন করে কাঠিটাকে।

'তুমি কিন্তু অ্যাট ইজ ফিল্মে নামতে পারো,' ছায়ানিবিড় ইডেনে ঘনিষ্ঠ হতে হ
সোমা একদিন বলেছিল, 'তোমার যা ফিগার—'

'তাহলে স্বীকার করছ আমার ফিগারটা ভালো'—পরমানন্দ পরম আনন্দে হাওয়া
ধোঁয়া ভাসিয়ে চুপ করেছিল।

'কিন্তু বাপু তোমার নামটা পাল্টিও। পরমানন্দকুমার-ইস্ কি বিচ্ছিরি।'—সো
খলখিল শব্দে ভেঙে পড়েছিল।

'পরমানন্দকুমার!' পরমানন্দ ভাবে, সত্যিই অ্যান্টিরোমান্টিক নাম। গ্ল্যাম
ওয়ার্ল্ডে ওই নাম খেয়ো কুত্তার মতো। লাথ খেয়েই ফিরে আসতে হবে। দুনিয়ায় ক
অজস্র মধুর নাম রয়েছে। অথচ তার পিতৃদেব! মাঝে মাঝে তার কেমন যে
বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করে বাবার বিরুদ্ধে। বাড়ির পাশের মুদির দোকানের বো

ংসিত ছোঁড়াটারও নামের বাহার কত। অরূপ কুমার দত্ত। ঐ তো ছিরি তোর! াত ভালো নাম দিয়ে তোর কি দরকার? বরং একটা ভালো নাম তার হওয়া ়চিৎ ছিল।

তাব চেহারা আছে রূপ আছে। কিন্তু সদানন্দের ছেলের নাম পরমানন্দ ছাড়া আর কিছু াবতে পারে না পরমানন্দের বাপেরা। অনেকদিন ধরে অনেকবার ভেবেছে পরমানন্দ ামটা পাল্টাতে হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি, কতদিন ভেবেছে শিয়ালদা কোর্টে কংবা অন্য কোথাও গিয়ে এফিডেফিট করে নামটা পাল্টে দেবে। কিন্তু ভাবাই কবল সার হয়েছে। আসলে পরমানন্দ বন্ধুদের মধ্যে সেই আাদ অকৃত্রিম নন্দ হয়েই য়েছে।

একবার এক ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে কথাবার্তা কিছু এগিয়েছিল। নায়ক হবার ্যোগ তার হয়নি বটে। কিন্তু ছোটখাটো কয়েকদিনের কাজ ছিল সেটা। রোলটা লেও ইমপট্যান্ট। কথাবার্তা যখন এগুচ্ছে তখন ফস্ করে ওদেরই একজন পাশ থেকে লে উঠেছিল, 'নামটা কিন্তু দাদা আপনাকে পাল্টাতে হবে।' কানটান লাল করে প্রায় কাচুমাচু মুখে পবমানন্দ উত্তর দিয়েছিল, 'হ্যাঁ তাতো বটেই, তাতো বটেই।'

সে কাজটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরমানন্দ ছেড়ে দিয়েছিল। নায়ক হবার যার ইচ্ছা ায়কেব কাছাকাছিও যেতে পারবে না এমন একটা রোল সে নিয়ে উঠতে পারেনি।

সোমা বলেছিল, 'নিয়ে নিলেই পারতে। প্রথমেই কেউ বড রোল পায়?' রমানন্দ সাফ এবং সোজা উত্তব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ পায় এবং পেতে হবে। নায়কের কেব হয়ে ঢুকলে তাকে আর কোনদিনও নায়ক হতে হবে না। তাব আখেরের খানেই ইতি।'

পরমানন্দ নিজেকে সেই ভাবেই তৈরী করেছে এবং করছে। অন্তত চলাফেরা থাবার্তায় সে সর্বদাই নায়ক। বি কম পাশ করার পর বাবা ডেকে বলেছিলেন, এবার সংসারেব কিছু দায়িত্ব নাও। মাথার ওপর দু বোন। তাদেরও ভাবনা ভাবতে খ! আর কতদিন এ রকম উড়ু উড়ু হয়ে ঘুরে বেড়াবে?'

মাথা চুলকে পরমানন্দ পালিয়ে এসে হাফ ছেড়ে ছল। বাবা তার ধ্যানধারণা নিয়ে ীবনটাকে দেখতে চাইছেন। সেই দৃষ্টি নিয়ে পরমানন্দের উচ্চাকাঙ্খা তিনি বুঝতে ন না। তাঁকে এসব বোঝানোও যাবে না। বেশ কিছুদিন পর বাবা তার জন্য কটা চাকরীও মোটামুটি জোগাড় করেছিলেন। আপাতত টেম্পোরারী হলেও রাধরির জোরে শেষ পর্যন্ত পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। কিন্তু পরমানন্দ তা নিতে ারেনি। তার বদলে সে অভিনয় করে বেড়িয়েছে এ দলে ও দলে। আর সুযোগ ুঁজেছে প্রোডিউসার আর ডিরেকটরদের বাড়িতে হানা দিয়ে।

'চাকরী টা নিলেই পারতিস,' কফি হাউসে বসে অসীম একদিন বলেছিল।

'নাঃ রে ও চাকরী ফাকরী আমার দ্বারা হবে না—'

'বাজারের অবস্থা ত দেখছিস?'

'আরে দূর, চাকরী করে আর কত পাব? আড়াইশো তিনশো ব্যাস। শেষ র্যন্ত সাত আটশোয় গিয়ে রিট্যায়ারমেন্ট, ওতে কি হবে? গাঁজাক্ষুর মত এক মুখ

ধোঁয়া ছাড়তে পরমানন্দ বলেছিল, 'চাকরী, বিয়ে, ছেলের ফুড, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ক্যাজুয়াল লিভ আর ধর্মঘট--দূর দূর। তোরা শালা একেবারে টিপিক্যাল বাঙালী হয়ে গেছিস। অথচ ভেবে দেখ একটা ছবিতে নায়ক হলে তোর কি অবস্থা হবে—'

ওর যুক্তিতে অসীম উৎসাহিত হয়নি। এমনকি সোমাও। চাকরীটা না নেওয়াতে সোমা দুঃখিত এবং বিষণ্ণ।

'এটা কিন্তু তোমার ওয়াইজ হ'ল না। চাকরী করতে করতেও চেষ্টা করতে পারে —জগতে এরকম উদাহরণ তুমি কটা চাও?'

উদাহরণে পরমানন্দ উৎসাহিত হয়নি। দাঁত খিচিয়ে অলীক স্বপ্ন বিলাসী ছেলের উদ্দেশে সদানন্দবাবু বলেছিলেন—'নায়ক হচ্ছে না গুষ্টির মাথা হচ্ছে। পয়সা খরচ করে আসল সিম্পাঞ্জী তৈরী হয়েছেন। মাথার চুলগুলো দেখো, তেল না মেখে মেখে জটা ধরে গেছে। ওসব আমার এখানে চলবে না। আজ থেকে তোমার পিছনে আর একটা পয়সাও খরচ করতে পারব না।'

পরমানন্দ তবু স্থির ও নিশ্চল। পয়সার জন্য আর বাবার কাছে হাতটাত পাতেনি কয়েকদিনের মধ্যেই দু'একটা মাঝারি মাপের টিউশানি জোগাড় করে নিয়েছিল আর সেই থেকে বাবার সঙ্গে পরমানন্দের বণিবনাও নেই। ভোর বেলা বেরিয়ে যায় উড়োখইএর মতো! দুপুরে ফিরে খেয়ে দেয়ে নিটোল একটা ঘুমটুম দিয়ে পাঁচটার আগেই হাওয়া হয়ে যায়। ফেরে সদানন্দবাবু ঘুমিয়ে পড়লে পারতপক্ষে বাবাকে সে এড়িয়েই চলে। ও ভাবে, সুদে আসলে একদিন সব উশুল করে দেবে।

কিন্তু উশুল হয়নি। বরং ডিরেকটরদের চামচাদের পেছনে গোঁজামিল দিতে দিতে আর নিজের প্রসাধনের খরচ করতে করতে ইতিমধ্যে তার বাজারে বেশ দেনা হয়ে গেছে। টিউশানিতে চলে না। বন্ধুরা প্রত্যেকেই চাকরী পেয়ে গেছে। তাই পরমানন্দের নিরানন্দ দুপুর আর কাটে না। বিষণ্ণ বিকেলে ইদানীং সোমাও প্রায় অনুপস্থিত।

সোমা প্রথম প্রথম অনুযোগ করত। দুঃখিত হতো। এখন ও হাল ছেড়ে দিয়েছে। বরং আজকাল ভাবী নায়ককে নিয়ে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করতে ছাড়ে না।

সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে অভিনয় কায়দায় সেটা দূরে ছুড়ে ফেলে দেয় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু আর বৌবাজার ক্রশিং পার হয়ে চকিতে পাশের স্টীল গুডসের দোকানের শোকেসে নিজের পূর্ণবয়ব দেখে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। সাড়ে বারোটা। অসীমের সঙ্গে কাল রাত্রেই কথা হয়েছিল। 'একটার মধ্যে আসিস। আমি কিন্তু তারপর আর থাকব না।'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক একটার মধ্যেই পৌঁছব। দরকার ত আমার।'

দশটা টাকা অসীম ধার দেবে বলেছিল। আপদে বিপদে অসীমই এখনও তাকে ফিরিয়ে দেয় না। কে জানে হয়ত ভাবী নায়কের জন্যে এখনও তার মহানুভূতি রয়ে গেছে কিনা। আর সব বন্ধুরা ত ধাপ্পাবাজ। ভয়ে আর কেউ পরমানন্দের সঙ্গে

নীং দেখাই করে না। পাছে সে ধার চেয়ে বসে।

'শ্-শালা, নায়ক হয়ে গেলে ওরকম হাজারটা দশপাঁচে মারো লাথ্। বন্ধু না ী। সব শালা স্বার্থপর আর বেইমান।'

বন্ধুদের উদ্দেশে বেশ কটুক্তি করতে করতে পরমানন্দ হেঁটে চলে।

চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ। এরি মধ্যে রোদে গা জ্বালা করে। পরমানন্দ রোদ থেকে য়ায় ফুটে চলে আসে। সে সব সইতে পারে। কিন্তু দৈহিক ধকল অথব বর্জকালিমা তে পারে না। বাড়িতে দুধ আসে অল্প। রুগ্না মায়ের জন্য সংসারের বাড়তি দ্দ। কিন্তু প্রায় সবার অলক্ষ্যে পরমানন্দ সরটুকু তুলে নেয়। মুখের চামড়াটা ম রাখা ভীষণ প্রয়োজন। একটা আলগা কমনীয়তার জোগান দেয় এই দুধের । কাজটা খারাপ হচ্ছে। তার জন্য সে অনুতপ্ত। তবে তৃপ্ত হয় এই ভেবে বার দাঁড়িয়ে নিই—তারপর তোমাকে দিনরাত দুধের পুকুরে ফেলে রাখব াৎ।

পকেটে হাত ঢোকায় পরমানন্দ। সোমার লেখা চিঠিটা হাতে ঠেকল। চলতে তে আর একবার পড়ল সে। দু লাইনের বক্তব্য। মুখস্ত হয়ে গেছে। 'জরুরী কার। অনেক কথা আছে। তোমার আমার মধ্যে একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন। টার মধ্যে মেট্রোর নীচে এসো।'

ব্যাস। ভাঁজ করে চিঠিটা পকেটে রাখল সে। একটা বোঝাপড়া. কি বোঝাপড়া তে পারে ? পারে হয়ত। আগের দিন সোমা বলেছিল, 'এ ভাবে ত আর চলে না !'

'কি চলে না ?'

'বোঝ না ?'

'না, মানে—'

'বিয়ে না করলে একটা ছেলের হয়ত চলে যেতে পারে। কিন্তু একটা মেয়ের ক্ষ—,একটু চুপ করে থেকে সোমা বলেছিল, 'বাড়িতে ছেলে দেখেছে। প্রায় রেই পছন্দ—'

'তোমার ?'

'আমার ? আচ্ছা বলত আর কতদিন এভাবে বসে থাকব ? আমি যে নিতান্তই টপৌরে মেয়ে—

'তার মানে তোমারও ইচ্ছে আছে।'

সোমা আর কোন উত্তর দেয়নি। মাথা নীচু করে বসেছিল। এবসময় পরমানন্দ লছিল, 'চল, বাড়ি যাওয়া যাক।'

বি কম পাশের পর পাঁচ বছর। পরমানন্দ পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় ভাবে চাকরীটা ন নিলেই ভালো হত। আজ বন্ধুরা এড়িয়ে যায়। বাড়িতে মা বাবার ধিক্কার আর না। বোনেদের এখনও বিয়ে হয়নি। তাদের অনুকম্পার দৃষ্টি। সোমার য়িনী মনোবৃত্তি। অথচ পরমানন্দ কাউকে কোন দোষ দিতে পারে না। কেননা কে নায়ক হতেই হবে। লক্ষ লক্ষ টাকায় ঝনাৎ শব্দ আর গগনশালী নাম ! আজ ফেকলু পরমানন্দ—ভোটের সুপারিশে পাওয়া প্রায় জীর্ণ টেরিলিন শার্টপ্যান্টপরা

অতি সাধারণ। কেউ তাকে চেনে না। সোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে গিয়ে বন্ধুর অফিসে ধর্না দিতে হচ্ছে দশটা টাকার জন্য। কারণ তার পকেটে এখন দশটা পয়সার বেশি আর কিছু নেই। ছাত্র পড়ানোর টাকা পেতে এখনো সাতদিন—। লক্ষ লক্ষ টাকা যেদিন পকেটে আসবে সেদিন—।

পরমানন্দ আর ভাবতে পারে না। জি পি ও এসে গেছে। জি পি ও'র বড় গো ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল। একটা বাজতে দশমিনিট। টাকাটা পেয়েই সো মেট্রো। সোমার সঙ্গে বোঝাপড়া। বোধহয় শেষ বোঝাপড়া অথবা অন্যকিছু কিন্তু সবার আগে দরকার দশটা টাকা।

জি পি ও ছাড়িয়ে একটা বেসরকারী অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। অফি চাকরী না করলেও এসব তার চেনা পথ। লিফটের সামনে এসে বেল টিপল লিফটে চড়ে আয়নায় একবার নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে নিল। উঃ যা গরম! মুখ লাল হয়ে উঠেছে। রুমাল বার করে মুখটা ঘসে নিল। লম্বা করিডোর পার হ রিসেপসান টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুখী পায়রার মত ঘাড় ঘুরিয়ে সুন্দর রিসেপসানিস্ট তার দিকে স্লিপ প্যাডটা এগিয়ে দিল। নামটাম লিখে বেয়ারার হা সেটা চালান করে পাখার নীচে সোফায় গিয়ে বসল। ঘামে ভেজা কলারটা পেছনদি ঠেলে দিয়ে আঃ শব্দে আরাম নিল। আচ্ছা, কি বলতে পারে সোমা? বিয়ের স ঠিক হয়ে গেছে? আর দেখা হবে না? অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু পরমানন্দ ভেঙ্গে পড়বে না। দশটা টাকার অন্তত আটটা টাকা খরচ করবে সোমার জন্য দিল তার আছে। একজন বিরহী নায়কের মত শেষ মুহূর্তে নায়িকার কাছ থেকে অসামান্য ঔদার্য দেখিয়ে চলে আসবে। কয়েকটা নাটকীয় সংলাপ মনে মনে আউড়ে নিল বার কয়েক। শেষ দেখা হিন্দী ছবির নায়কের মত ঘাড় বেঁকিয়ে সোমা সে বিদায় দেবে চোখের কোণে দুফোঁটা মুক্তোর মত জলের টলটলানি রেখে। কথায় কথায় জলটল আনা সে আজকাল বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। কেন না গ্লিসারিণ দিয়ে কান্নাটা সে ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না। তারপর···

'অসীম বাবু ত আজ নেই আয়া।'

'অ্যাঁ!' পরমানন্দ প্রায় আৎকে উঠে বসল। 'সে কি, আমায় যে আজ আস বলেছিল। তুমি ভালো করে দেখেছ?'

বেয়ারাটা পরমানন্দর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল—'জি, হাঁ।' বোধহয় আ কোন খাতিরের ইচ্ছে তার নেই। তাই সে নিজের টুলে গিয়ে বসল!

মেট্রোর উল্টোফুটে গাছের নিচে নিজেকে অত্যন্ত আড়ালে রেখে পরমানন্দ দেখ সোমা ঠিক দুটোয় মেট্রোর নীচে এসেছে। তার জন্যে অপেক্ষা করেছে আধঘণ্টা ঘন ঘন ঘড়ি দেখে এক সময় বাসে উঠে ফিরে গেছে। আর তারও অনেক পরে পরমানন্দ অনেকদিন আগের সিনেমায় দেখা এক বিষণ্ণ বিরহী নায়কের মত প্যান্টের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে সামনের দিকে মাথা ঝুঁলিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তার মনে হতে লাগল ক্যামেরা তাকে মিডশটে ফ্রেমআপ করে রিভারস্ জুমে কুইক ট্রাক ব্যাক করে ফ্রিজ হয়ে গেল।

চাণক্য সেন

প্রথম গল্প প্রসঙ্গে / চাণক্য সেন

আমার ছোট-গল্প লেখার ইতিহাসটা সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। আমার আরও মনে আছে, "জয়ন্ত্রী" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গল্প এক ব্রাহ্ম বান্ধবীকে খুব উষ্ণ আশা নিয়ে পড়তে দিয়েছিলাম। গল্পটিতে "গিয়েছিলুম" "করেছিলুম" ইত্যাদি "ছিলুম" ব্যবহৃত হয়েছিল। গল্পটি পড়ে আমার বান্ধবী একটি চিরকুট পাঠিয়েছিলেন। তাতে শুধু একটি অক্ষর লেখা ছিল ঃ "হালুম।"

সেই বান্ধবীও ঐ গল্পের মতই হারিয়ে গেছে। তার নামটা খুব মনে আছে আমার, স্মৃতিও, কিন্তু তিনি কোথায় কেমন আছেন তা বহুদিন "মালুম" নেই।

ষাট দশকে আমার কনিষ্ঠ ভাই আদিত্য সেন দিল্লীতে "ইন্দ্রপ্রস্থ" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করে। বছর তিনেক চলেছিল "ইন্দ্রপ্রস্থ", বেশ একটু সুখ্যাতিও অর্জন করে নিয়েছিল। আদিত্যের চাপে পড়ে আমি "ইন্দ্রপ্রস্থে" কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছিলাম, তার মধ্যে "বিরাট পাহাড়, বিশীর্ণা নদী" প্রথম।

এ গল্পটি লেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম একটি মেয়ের অভিজ্ঞতা থেকে। বিশীর্ণা ঝর্ণার মতই সে মেয়েটি খরস্রোতা। স্বল্পবিত্ত পরিবারের কন্যা, প্রত্নতত্ত্বে এম. এ. পাশ করে কাজের সন্ধানে রয়েছে। এমন সময় দিল্লীতে সেকালের এক বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও কলাবিশারদ তাকে একটা চাকরী পাইয়ে দেন। চাকরীটা দক্ষিণ ভারতে; প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন, আমিও যাচ্ছি। এখানে তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে একেবারে কাজে বসিয়ে দিয়ে আসব। মেয়েটি রাজী হল, এবং যাত্রার সময় রেল স্টেশনে গিয়ে দেখল, বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁর এবং ওর জন্যে একটা 'কূপে' নিয়ে বসে আছেন। মেয়েটি স্টেশন থেকে পালিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

এমন কিছু অসাধারণ কাহিনী নয়, কিন্তু, মনে পড়ছে, মেয়েটি যখন আমাকে উত্তেজিত হয়ে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিল, তার কথাগুলি আমার কল্পনায় এই গল্পটি এঁকে দিয়েছিল।

জার্মান নাগরিক হাইনরিক স্যুট্‌জ কয়েক বছর ছিল ভারত-প্রবাসী। যাবার আগে নিয়ে গেছে বুকে করে ভারতবর্ষের এক টুকরো রহস্যময় ছায়া। তার কথা আপনাদের বলি।

ওর একটা চিঠি এসেছে কলোন থেকে ক'দিন আগে। অনেক গুরু-গম্ভীর বক্তব্যের পরে চিঠির শেষপ্রান্তে লিখেছে, সুজাতার বিয়ের খবরে সুখী হলাম। ওর ঠিকানা দাও নি, তাই অভিনন্দন পাঠাতে পারলাম না। দেখা হলে বোলো, আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল তার নতুন জীবনে।

সুজাতাকে বলেছিলাম। সে আমার সহকর্মিণী, এক কলেজে। নতুন-পাওয়া স্বামীর প্রেমে ডগমগ হয়েও মুহূর্তের জন্যে সুজাতা একটু উদাস হল। তারপর স্বভাব-সুলভ দুষ্টুমি চোখে এনে মৃদু হেসে বলল, "আপনার মারফত আমিও একটা বাণী পাঠাবো নাকি?"

"রক্ষে করো। দৈত্যের দৌরাত্ম্য আমার দুঃসহ।"

"ঐ দেখুন। শুরু করলেন আপনার দাঁত-ভাঙা বাংলা। আমি একটা মোলায়েম জবাব আশা করেছিলাম।"

আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছেন। ভেবেছেন হাইনরিক ও সুজাতার গভীর প্রেম হয়েছিল। হয়তো ভেবেছেন, হাইনরিক বিয়ে করতে চেয়েছিল সুজাতাকে, সুজাতা রাজী হয় নি, আর হাইনরিক মনের দুঃখে বনে, অর্থাৎ কলোনে গেছে। কিংবা হয়তো ভেবেছেন, সুজাতাই ধপাস করে হাইনরিক স্যুট্‌জের ভালোবাসায় পড়ে গিয়েছিল, বেচারা পালিয়ে বেঁচেছে।

এসবের কোনওটাই কিন্তু হয় নি। হয় নি বলেই তো কাহিনী। যা হয় তা হারায়। যা হয় না, তা রয়।

আপনাদের মধ্যে সুরুচি সুভদ্র যদি-বা কেউ থাকেন, হয়তো বলে উঠবেন, কেন বাবা, এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে যাওয়া! তোমার হাইনরিক স্যুট্‌জ্ জার্মান, আমাদের সুজাতা বসু বাঙালী। জীবনের পাকচক্রে তাদের মধ্যে কী হল, বা না হল, তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কেন?

মুজতবা আলি হলে বলতেন, হক্ কথা। কিন্তু কি জানেন, কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপা
নিয়ে যদি মাথা না ঘামান, তাহলে সকাল-সন্ধ্যা আপনার মাথা ধরবে, এবং প্রসঙ্গত
গল্প-উপন্যাস রচিত হবে না। সুতরাং হাইন্‌রিক-সুজাতা-সংবাদ পাঠ করুন, হয়তো এক
আধবার চমক লাগতেও পারে।

তার আগে, আসুন, হাইন্‌রিক স্যুট্‌জের একটু পরিচয় দি। হঠাৎ দেখলে মনে হ
পালোয়ান। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। মাথায় বেশ চকচকে গোল টাক, চতুর্দি
পাতলা লালচে চুলের হালকা বেড়া। প্রশস্ত ললাটে চিন্তাশীলতার গভীর রেখা। চো
নীল, দু'টুকরো শরতের আকাশ; নাকটা আচমকা চাপা, চওড়া চোয়াল, চ্যা
চিবুক। সুদর্শন নয় কিন্তু বিরাট দেহে ব্যক্তিত্বের গম্ভীর ব্যঞ্জনা। মনোমতো পরিবে
পেলে গল্প করতে ভালোবাসে।

ভারতবর্ষে এসেছিল সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-প্রসারের কোনও একটা প্ল্যানের পরিচাল
হয়ে। কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক। না, ঠিক চাকরী নিয়ে আসে নি
দু বছরের প্ল্যান কার্যকরী করবার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল। অফিস ছিল দিল্লী শহরে
কিন্তু আসল কাজ বিহার ও মাদ্রাজে, মাটির নীচে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বে
ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মাটির গর্ভ থেকে হারিয়ে-যাওয়া অতীতকে টেনে বার করতো
আট-দশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দু মাস ধরে চলতো অতীত অন্বেষণ। ফিরে এসে দিল্লী
মাসখানেক কাটিয়ে আবার নতুন দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তো।

আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল প্রথম সাক্ষাতে। প্রত্নতত্ত্বে নিরাগ্রহ আমি; পাথর আম
কাছে নীরব, হাইন্‌রিকের কাছে অত্যন্ত সরব, সঙ্গীতময়। এক বন্ধুর অনুরো
হাইন্‌রিকের ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছিলাম এক গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায়। গলফ্ লিঙ্ক-এ সাজানে
গোছানো ফ্ল্যাট, যদিও হাইন্‌রিক একা মানুষ, এবং প্রায়ই বাইরে থাকে। শোব
ঘর, বসবার ঘর, একটা ঘরে হাইন্‌রিকের ব্যক্তিগত দপ্তর। তাছাড়া খাবার
আছে, বেশ বড় একটা বারান্দা আছে, এবং ঘন সবুজ লন আছে। হাইন্‌রিক আমাে
শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত দপ্তর-ঘরে বসাল। মাঝখানে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, খানকয়ে
চেয়ার, আর সর্বত্র নানা ধরনের পাথরের মূর্তি, ফলক, লিপি এবং আমাদের কা
বোবা, অর্থহীন, ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড। ঘরটা ছোটখাটো মিউজিয়ম।

আমার পাথর দেখে একঘেয়ে, কিন্তু মানুষটাকে কেমন ভালো লাগল। একে
অমন জাঁদরেল চেহারার পুরুষ বড় একটা দেখা যায় না (দিল্লীতে, লক্ষ্য করে থাকবে
জাঁদরেল স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক বেশি, পুরুষগুলি সবাই কেমন মিনমিনে, দপ্ত
বড়কর্তা, বাড়িতে স্ত্রীশাসনে ক্ষীণপ্রতাপ); তাছাড়া মানুষটার মুখে-চোখে প্রচ্ছন্ন সরল
আমাকে সহজে আকর্ষণ করল। টেবিলের ঠিক ওপরে বড় ল্যাম্প-সেডে চড়ুই প

শচন্তে বাসা বেঁধেছে। আমার নজর পড়তে হাইন্‌রিক ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল। বলল, "ঘরে পাখির বাসা শুভকরী, আমার মা বলতেন। ক'দিন আগে চারটে ছানা হয়েছে। রোজ সকালে মা ওদের উড়তে শেখায়।"

আমরা বিয়ার খেতে খেতে গল্প করছিলাম। আমার বন্ধু দর্শনের অধ্যাপক, সুতরাং ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য প্রচার করতে ভালোবাসেন। তিনি হাইন্‌রিককে বোঝাচ্ছিলেন ভারতবর্ষ কিসে কত বড, য়ুরোপকে কোন কোন ক্ষেত্রে তার অনেক দেবার আছে।

হাইন্‌রিক নীরবে শুনছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা তার অসীম. সে অতীত তার কাছে বাঙ্ময়। রোজ সে তার কথা শোনে, তার ডাকে ছুটে যায় সুদূর বিহার ও মাদ্রাজ, মাটি খুঁড়ে সে অতীতকে উদ্ধার করে। ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যের কথা শুনতে তার ক্লান্তি নেই। কিন্তু দার্শনিক মাত্রেই ক্ষীণদৃষ্টি, এবং আমার বন্ধুও তাই, তিনি উত্তেজিত বক্তৃতার জের টেনে আনলেন অতীত থেকে জলজ্যান্ত বর্তমানে, এবং প্রমাণ করতে লেগে লেগেন ভারত, তার অদলীয় পররাষ্ট্রনীতি, প্রজ্বলিত গান্ধীবাদ ও চমৎকারী গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র নিয়ে বিশ্বের দরবারে কতখানি মহান। আমি দেখতে পেলাম হাইন্‌রিকের প্রকাণ্ড মুখখানায় একটা প্রচণ্ড হাই রেখাপাত করছে।

দার্শনিক বন্ধুর দর্শনে এ-সব সামান্য জিনিস আসার কথা নয়। তিনি বলে চললেন ভারতবর্ষ নির্লোভ তাই সে সবাকার সাহায্য পাচ্ছে, ভারতবর্ষ কারুর নেতৃত্ব করতে নারাজ, তাই শক্তিমান দেশগুলি বিপদে পড়লে বার বার তার শরণাপন্ন। য়ুরোপ-আমেরিকার কোলাহলমুখর সভ্যতার বাইরে ভারত তার নিজের মাহাত্ম্যে সোজ্জ্বল, দারিদ্র্য নিয়েও বিত্তবান. ক্ষুধা সত্ত্বেও পরিতৃপ্ত, অভাব নিয়েও পরিপূর্ণ।

হাইন্‌রিক দু'বোতল বিয়ার শেষ করে তৃতীয় বোতল খুলতে খুলতে প্রথম মুখ খুললো। বলল, "আপনি যা বলেছেন সব ঠিক, ডাঃ পাল। তবে, ব্যবহারিক জীবনে আমাদের অভিজ্ঞতা একটু আলাদা।"

উৎসাহ পেয়ে প্রশ্ন করলাম, "আপনার অভিজ্ঞতাটা একটু বলবেন?"

হাইন্‌রিক একগাল হাসল। "সামান্য অভিজ্ঞতা", বলল আস্তে আস্তে। "শুনতে চান বলতে পারি। তবে এমন কিছু নয়। এবং কিছু মনে করবেন না।"

আমি বললাম, "সামান্যতেও অনেক বড কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। স্পষ্ট করে বলুন, মনে করার মতো মেয়েলি মন আমাদের নয়।"

হাইন্‌রিক জবাব দিল, "তা বোধহয় ঠিক নয়। আপনারা বড সহজে বেশ কিছু মনে করে বসেন। কোনও বিদেশী আপনাদের দেশ নিয়ে সমালোচনা করলে বড্ড সহজে চটে যান।"

আমার চট করে ক্যাথারিন মেয়ো থেকে বিভর্লি নিকল্‌স্ মায় জর্জ ক্যাম্বেল পর্যন্ত মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, ফস্টারের 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' নিয়েও আমরা গুমরে মরেছি।

একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, "অভিযোগ মেনে নিচ্ছি। আমরা হলাম নতু
অনুরাগী যুবতীর মতো। সামান্যেই অভিমান করে বসি। কিন্তু, কথা দিচ্ছি
আপনার স্পষ্টভাষণে প্রীত হব।"

হাইন্‌রিক স্যুট্‌জ্‌ হাসিটি বজায় রেখে বলল, "আমার বক্তব্য এমন কিছু নয়
এখানে এসে একটা ভ্যালেট জাতীয় লোকের দরকার হল। আপনাদের দে
মানুষের দাম কম, তাই মানুষ সহজে মানুষের সেবা কিনতে পারে। কয়েকটি লো
এল কর্মপ্রার্থী হয়ে, তার মধ্যে যার পকেটে সবচেয়ে বেশি প্রশংসাপত্র ছিল তাকে নিযু
করলাম। বছর ত্রিশ বয়স হবে, শিখ সর্দার, চমৎকার চেহারা। বেশ সুন্দর ভুল ইংরে
বলে, কথায়-বার্তায়, কাজে-কর্মে ক্রটিহীন। একা মানুষ আমি, ওর হাতে টাকা তু
দিয়ে নিশ্চিন্ত। এমনি করে মাস ছয়েক কাটল। প্রথম দিকটায় দিল্লীতে থাকা হ
বেশি; এর মধ্যে মাস চারেক এখানেই ছিলাম। একদিন হঠাৎ ভ্যালেট মশাই কা
ইস্তফা দিলেন। বললেন, দেশে যাবার জরুরী তলব এসেছে। অনুরোধ করতে আ
একটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র লিখে দিলাম।"

সে বিদায় হবার দু'দিন পরে একজন লোক এসে হাজির। কি ব্যাপার?

"না, আমার কাছে রুটি, ডিম, মাখন ইত্যাদির জন্যে পঞ্চাশ টাকা পাওনা!"

"সে কি? সন্তোখ সিং তো সবই নগদে কিনেছে?"

"সে বলল, আজ্ঞে না, বহুদিন সে এক পয়সাও দেয় নি।"

"তবে আপনি বাকী জিনিস দিয়ে গেছেন কেন?"

চোখ বড় বড় করে লোকটি বলল, "সে কি কথা! সাহেবের কাছে টাকা থাকা
যা, ব্যাঙ্কে রাখাও তাই!"

আশ্চর্য হলাম। তার পঞ্চাশ টাকা আমার কাছে "ব্যাঙ্কে" আছে! এর প
এলো মুদি, মাংস-ওয়ালা, মায় মদের দোকান থেকে প্রতিনিধি। সর্বসমেত শ' তিনে
টাকার জিনিস সন্তোখ সিং কিনেছে, একটি পয়সাও দেয় নি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আপনি কি করলেন?"

"কি আর করবো? সন্তোখ সিং-এর সন্ধান করে সন্তোষজনক কিছু নিশা
পেলাম না। টাকাগুলি দিয়ে দিলাম।"

"অবশ্য এক একটা ব্যাপার দিয়ে আপনি আমাদের বিচার করতে পারেন না।
দার্শনিক বন্ধু প্রতিবাদ করে উঠলেন।

"নিশ্চয় না," মানল হাইন্‌রিক স্যুট্‌জ্‌। "কিন্তু গল্পটা পুরো শুনুন। মাস দু
পরে আমি ফিরে এসেছি এখানে, এবং সৌভাগ্যক্রমে, আর একটি চাকর পেয়েছি
একদিন এক পুলিস অফিসার এসে হাজির। অবাক হলাম, আমি পলাতক ওয়া
ক্রিমিনাল নই। নাৎসী জেলে কাটিয়েছি পুরো পাঁচ বছর। কিন্তু পলাতক ওয়া
ক্রিমিনাল হলেও ততটা আশ্চর্য হতাম না যতটা হলাম পুলিস অফিসারের অভিযো
শুনে। সন্তোখ সিং নামে এক ভারতীয় নাগরিক থানায় গিয়ে নালিশ করেছে পুরো
ছ'মাস আমি তাকে মাইনে দিই নি।"

হাইন্‌রিক স্যাটজ্‌ কথাগুলি বলোছল হেসে হেসে, একটুও রাগ বা তিক্ততা না দেখিয়ে। মনে হচ্ছিল সে পুরোপুরি উপভোগ করছে আমার দার্শনিক বন্ধুর অস্বস্তি।

আমি বেশ মজা পেয়ে বললাম, "বুদ্ধিমান লোক বটে আপনার সন্তোখ সিং। কূটনীতিতে হাত পাকালে রাষ্ট্রদূত হত। প্রতিরক্ষার সবচেয়ে বড় পন্থা আক্রমণ।"

হাইন্‌রিক হাসতে হাসতে বলল, "তখন একটু রেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে মনে হল সাবাস লোক। টুপি তুলে সম্মান দেখানোর উপযুক্ত।"

দার্শনিক বন্ধু ঘোষণা করলেন সন্তোখ সিং ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধি নয়।

হাইন্‌রিক একবাক্যে মেনে নিল। "নিশ্চয় নয়। সন্তোখ সিং তো নয়ই, এমন কি ডাক্তার সুবেদারও নয়।"

"ডাক্তার সুবেদারটি আবার কে হল?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"একজন সুচিকিৎসক। এখানে আসবার পরেই আমার জ্বর হল। হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনে গলায় ব্যথা হয়ে সামান্য জ্বর। একজন নতুন-চেনা আমেরিকান বললে সুবেদারকে ডাকো। এ পাড়াতেই সুবেদারের ক্লিনিক, তাতে আরও সুবিধে। সুবেদার এল এবং খ্যাঁচ করে আমার দেহে সূঁচ ফুটালো। তিনটে ইনজেকসন দিয়ে বিল পাঠাল সত্তর টাকার।"

"বলেন কি?" এবার দার্শনিক বন্ধুও আঁৎকে উঠলেন।

"তিন দিনের ভিজিট ষাট টাকা, ওষুধের দাম দশ টাকা।"

"এ যে রাহাজানি!"

"আমি তখন কিছুই বুঝি নি। টাকাটা দিয়ে দিলাম। পরে আর একটি জার্মান ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম ডাঃ সুবেদারের ভিজিট পাঁচ টাকা। নতুন বিদেশী পেয়ে চারগুণ আদায় করেছে।"

দার্শনিক বন্ধু এবার রীতিমত বিব্রত হলেন। হাইন্‌রিক উঠে এসে তার পাশে বসল। বলল, "ডাঃ পাল, আপনি লজ্জা পাবেন না। বিদেশীদের সবাই এক-আধটু ঠকাতে চায়। আপনাদের দেশে এ প্রকৃতিটা হয়তো একটু বেশি। আমরা প্রত্যেক পদে ঠকবার জন্যে তৈরী হয়ে আছি। ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের ঘুর-পথে নিয়ে গিয়ে বেশি টাকা আদায় করে, দোকানী আমাদের দেখলে জিনিসের দাম চড়ায়, চাকর-আয়া আমাদের কাছে এলে তাদের মূল্য বেড়ে যায়। দরজির দোকানে আমরা বেশি পয়সা দি, যেমন দি ফলের দোকানে, রুটির দোকানে। লোকে বোধহয় ভাবে, আমাদের পয়সা বেশি, বুদ্ধি কম। হয়তো ভাবে, ওরা আমাদের যুগ যুগ ধরে লুটে খেয়েছে, এবার সুযোগ পেলে, আমরাই বা কেন এক-আধটু জুলুম করবো না! তার মানে এই নয় যে ভারতবর্ষের সবাই এ ধরনের। আপনারা অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত এবং দয়াবান। তবে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলির চেয়ে এমন কিছু আলাদা নন! আপনারাও ভাগী, আপনাদেরও লোভ আছে, আপনারাও দরকার হলে মিথ্যে বা অর্ধসত্য বলেন। জাতীয় স্বার্থে আপনারা লড়াই করেন, ব্যক্তিস্বার্থে অন্যায় করেন। মানুষ সব দেশেই সমান দুর্বল, আবার সমান মহান।"

হাইন্‌রিক স্যাট্‌জ্‌কে ভালো লাগলো প্রধানত তার চরিত্রের সরস বলিষ্ঠতায়। অ
বড় মানুষটার মধ্যে ছোট ছেলের সারল্য, আবার গম্ভীর দৃঢ়তা। বিশেষ আকর্ষণ
তার কৌতুকবোধ। সব কিছুতেই সে কৌতুক খুঁজে পায়। রঙ্গ করতে ভালবাসে
এ কৌতুক ও রঙ্গে ব্যঙ্গের লেশমাত্র নেই। হাইন্‌রিক হাসতে পারে। শুধু পরকে
নিয়ে নয়। নিজেকে নিয়েও।

হাইন্‌রিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমে উঠল। শহরে এলে আমার খোঁজ করত
টেনে নিয়ে যেত তার ফ্ল্যাটে। নয়তো গল্পে জমে যেতাম আমার বাসাতে। দিল্লি
জনাকীর্ণ এক পাড়ায় আমার দু-কামরা দরিদ্র নিবাস, হাইন্‌রিকের ফোর্ড গাড়ি বাড়ি
সামনে দাঁড়ালে, ভারী বেখাপ্পা দেখাত। কিন্তু হাইন্‌রিক বলত, আমার কাছে এ
সে তৃপ্তি পায়! "তুমি ভারতীয়ের বেশে, ভারতীয় পরিবেশে আমাকে গ্রহণ ক
ডাল-তরকারী-মাছের ঝোল খেতে দাও, আমার ভালো লাগে। তোমাদের দে
যেটা সবচেয়ে দুঃসহ তা হচ্ছে য়ুরোপের ম্লান অনুকরণ। পৃথিবীর আর কোনও দে
এতটা কিন্তু নেই।"

আমার ছা-পোষা গৃহিণী যে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে ওর সঙ্গে আলাপ করেন তাতে
হাইন্‌রিক খুব খুশি! এসেই বলবে, "আজ কি খাবো? আপনার সেই আলু-পে
আছে তো!"

আমাকে বলে, "বিঘোষিত-বগল, পচারিত-পেট, কর্তিত-কেশ, রক্তাক্ত-ঠোঁ
মেয়েদের চেয়ে তোমার এই সলজ্জ কমনীয় স্ত্রীকে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে
আমরা স্বাধীন ভারতে আসি ভারতবর্ষকে দেখবো বলে, য়ুরোপের একটা বটতল
সংস্করণ দেখবার লিপ্সা আমাদের নেই।"

জার্মান-চিত্ত ভাবপ্রবণ। য়ুরোপে বড় বড় ভাবধারা—মার্টিন লুথার থেকে কাল
মার্ক্স—এসেছে জার্মানী থেকে। হাইন্‌রিক স্যাট্‌জ্‌কে আমি জয় করে নিলাম 'ক্ষুধি
পাষাণ' শুনিয়ে। প্রথম দিন যখন গল্পটা তার কাছে অনুবাদ করে বলে গেলাম,
বিহ্বল, আত্মহারা হল। অতীতের আহ্বান সদাই তার বুকে বাজছে; 'ক্ষুধিত পাষা
তার কাছে মূর্ত অতীত হয়ে উঠল। গল্প শেষ হলে একটা কথাও সে বলতে পার
না। পরের দিন এসে আবার শুনতে চাইল। আমি যখন পড়তে লাগলাম, "তু
কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী। তুমি কোন শীতল উৎসের তী
খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে
তোমাকে কোন বেদুইন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো, মাতৃক্রোড় হইতে ছি
করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কো
রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন বাদশাহের ভৃ
তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবন-শোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়
সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহা
দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস!..." হাইন্‌রিক কেমন অস্থির হয়ে উঠল, অ

বড় মুখখানা ব্যথায় মেঘাক্রান্ত আকাশের মতো থমথম করতে লাগল। যখনই সে আসত, তাকে একবার গল্পটা পড়ে শোনাতে হত। বাংলায় পর্যন্ত সে চাইত শুনতে, এবং শুনে শুনে, কয়েকটা বাংলা শব্দ তার আয়ত্ত হয়ে গেল।

একদিন বলল: "জানো, আমি কবি বা লেখক নই, কিন্তু মাটি খুঁড়ে অতীতের অন্ধকার পথে চলতে চলতে আমারও বার বার মনে হয়, অতীত মৃত নয়, জ বন্ত! প্রত্যেকটি পাথর আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে ডাকে! আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে জীবন্ত পুরী, প্রাণময় পুরুষ-রমণী! দেখতে পাই মণিমুক্তাখচিত রাজদরবার, কানের কাছে শুনতে পাই কলগুঞ্জন। মনে হয় আমার চতুর্দিকে প্রাণময় সব দেহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের অনেক কথা কইবার আছে, বলছে না। মাঝে মাঝে শুনতে পাই সুমিষ্ট কলহাস্য, আবার অব্যক্ত বেদনার রুদ্ধ রোদন। পরমুহূর্তে আমাকেও যেন কোনও মেহের আলি চিৎকার করে বলে, হটো, সরে যাও, সরে যাও, সব মিথ্যে, সব ঝুট হ্যায়!"

আমাকে নীরব দেখে হাইনরিক বলল, তোমাদের টাগোর ঠিক বলেছেন। সব পাষাণই ক্ষুধার্ত। তৃষ্ণার্ত। সজীব মানুষ দেখলে সে ক্ষুধার তৃষ্ণার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।"

সুজাতা বসুর বিছানায় হাইনরিক স্যুট্‌জ্‌ একটা রাত কাটিয়েছিল। পাষাণ এত তের ক্ষুধার্ত পরিবেশে।

রোগা ছিপছিপে মেয়ে, গায়ে মাংসের একান্ত অভাব। অথচ মুখখানা আশ্চর্য ভরপুর ও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। ছোটখাটো রোগা দেহ, একরাশি কালো চুল, সপ্রতিভ বুদ্ধি-প্রাচুর্য, এই হল একবাক্যে সুজাতা বসু। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে প্রত্নতত্ত্বে এম. এ. পাস করেছে, হাইনরিক স্যুট্‌জ্‌-এর অতীত-উদ্ধার দলে ভর্তি হয়েছে। তার সঙ্গে গেছে বিহার, মাদ্রাজ। হাসিখুশি মেয়ে কথাবার্তায় ভারী চৌকস, কাজে মন আছে, সুন্দর গান করে। দলের মধ্যে সহজে চোখে পড়ে। হাইনরিকেরও পড়লো।

সে চোখ সন্তুষ্ট শিক্ষকের। হাইনরিক পাহাড়, সুজাতা বিশীর্ণা নদী। হাইনরিক শিক্ষক, সুজাতা ছাত্রী। হাইনরিক পঁয়তাল্লিশ, সুজাতা একুশ। হাইনরিক স্বামী ও পিতা, সুজাতা কুমারী। হাইনরিক জার্মান। সুজাতা বাঙালী।

তবু সেতু আছে। হাইনরিকের মতো সুজাতাও প্রত্নতত্ত্বে পাগল। তাকেও অতীত ডাকে, কথা বলে। পাষাণের ক্ষুধা তারও প্রাণে বাজে। প্রত্নতত্ত্বে পাগল, তাই সুজাতা হাইনরিকের ভক্ত। তার অসাধারণ জ্ঞান এবং অতিশয় বিনয়ে সুজাতা মুগ্ধ। হারানো ইতিহাসকে মাটির গর্ভ হতে টেনে বার করার যে-নেশা হাইনরিককে পাগল করেছে, সে-নেশাকে সুজাতা শ্রদ্ধা করে। স্বাধীন ভারতে জ্ঞানের নেশায় ভয়ানক ঘাটতি; অধ্যাপকরা হয় নোট লেখেন, নয় সরকারী দাক্ষিণ্য লাভের উমেদারী করেন, তাই এই বিদেশী অনুসন্ধানীকে সুজাতার ভালো লাগে আরও বেশী।

মাটির তলায় সুপ্ত পাথর পেলে হাইন্‌রিক পৃথিবী ভুলে যায়, তার সে সব-ভোলা ভাব সুজাতার অন্তর স্পর্শ করে।

হাইন্‌রিক আমাকে পরিচয়ের দিন বলেছিল, "বিদেশী আমরা, ঠকবার জন্যে তৈরী হয়েই থাকি।"

ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার দিনও বলে গিয়েছিল, "আর কিছু না, সুজাতার কথা ভাবলে মনে হয় একটু যেন ঠকে গেলাম।"

"আমাদের কবি বলেছেন, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।"

"কিন্তু দারিদ্র্য?"

"আরও বলেছেন, ধুলোয় অবহেলিত হয়েও তারা পূর্ণের স্পর্শ বহন করে।"

"তোমরা হচ্ছ অসংশোধনীয় রোমান্টিক," হাইন্‌রিক একগাল হেসেছিল।

মাদ্রাজ শহর থেকে কিছু দূরে একটা অতি পুরাতন সভ্যতার দ্রব্যসম্ভার খুঁজতে নিযুক্ত ছিল হাইন্‌রিক ও তার দল। সুজাতা দলের অন্যতমা।

দ্রাবিড় সভ্যতার এ নিদর্শনগুলো উদ্ধার হলে মহেনজোদরোর চেয়েও প্রাচীন আর একটা সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যাবে। হাইন্‌রিক মেতে আছে সন্ধান-নেশায়। মেতেছে সবাই। সুজাতাও। অনুসন্ধান ইতিমধ্যে আশাতীত পুরস্কৃত হয়েছে, তাই উত্তেজনা সবার মধ্যে সমান সংক্রামিত। হাইন্‌রিক আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত মূক পাষাণের কথা ফোটাবার সাধনা করছে। মাটির নীচে পাওয়া গেছে বড় শহরের ভগ্নাবশেষ, একটি প্রাচীন রাজপুরীর আভাস। পাওয়া গেছে কয়েকটি অতি রমণীয় নারীমূর্তি। তাদের একটি নিয়ে হাইন্‌রিক ধ্যানমগ্ন। তার ধারণা এ কোনও রাজকুমারী। অনেক সাধনায়ও তার মুখে কথা ফোটাতে পারছে না। তাকিয়ে আছে তন্ময় হয়ে পাষাণ রাজকন্যার পানে। অপূর্ব সুষমায় ভরা মুখখানা। তন্বী দেহ সুনিপুণ হাতে গড়া। হাইন্‌রিক বারবার হাত বোলাচ্ছে তার গালে, কপালে, কৃষ্ণ পয়োধরে, ক্ষীণ কটিদেশে, সুগঠিত জঙ্ঘায়। বলছে, কথা কও, কথা কও। তুমি কে? কী তোমার ইতিহাস? আমাকে বল, আমি যে শোনার অপেক্ষায় বসে আছি।

রাত অনেক; হাইন্‌রিক বসে আছে তার তাঁবুতে পাথরের রাজকন্যা নিয়ে। পাশের তাঁবুতে ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। কাজের সঙ্গে চলছে হাসি-গল্প, তার রেশ ভেসে আসছে হাইন্‌রিকের তাঁবুতে। হঠাৎ সে শুনতে পেল মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত। চলে এল অতীত থেকে বর্তমানে। রাজকন্যাকে সযত্নে সরিয়ে রেখে ক্লান্ত দেহ টেনে নিয়ে গেল পাশের তাঁবুতে।

গাইছিল সুজাতা। হাইন্‌রিককে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করল, কিছু পেলেন? হাইন্‌রিক মাথা নেড়ে বলল, না। তারপর হেসে ফেলল। করুণ সে হাসি। বলল, "কিছুতেই কথা বলছে না রাজকন্যা। তবে, বলবে। আজ না হয় কাল।"

"আপনি কিছু খেয়ে নিন," সুজাতা বলল।

হাইন্‌রিক রাজী হল। "আজ আর কাজ নয়। খাবো, তোমাদের গল্প আর গান শুনবো।"

"রাজকন্যার নেশা কেটেছে?" প্রশ্ন করল সুজাতা।

"এবার কাটবে," হেসে জবাব দিল হাইনরিক।

খেল ওদের সামনে বসে। পান করল পুরো আধ বোতল হুইস্কি। তারপর বলল, "এবার গান হোক।"

গান জানে। কিন্তু সুজাতা সহজে রাজী হল না। সর্ত করল, হাইন্‌রিককেও গাইতে হবে। "বেশ, বেশ, আমিও গাব," রাজী হলই হাইন্‌রিক। "এই খোলা মাঠে কোনও সভ্যতা তাতে বিনষ্ট হবে না।"

"বরং একটা লুপ্ত সভ্যতা জেগে উঠতে পারে," চটুল জবাব করল সুজাতা।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলল গল্প, গান। গাইল সুজাতা, গাইল ছেলেমেয়েরা সবাই একসঙ্গে, আর মোটা কর্কশ গলায় গান ধরল হাইন্‌রিক। গাইতে গাইতে বড় একা নিঃসঙ্গ মনে হল নিজেকে। পাষাণ রাজকন্যার সঙ্গে দিনের পর দিন কাটিয়ে যে উত্তাপ লাগেনি গায়ে, তার জন্যে মন ক্ষুধার্ত হল। অত বড় দেহটার মধ্যে শিরশির বয়ে গেল ব্যথার স্রোত। হাইন্‌রিকের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল।

এক সময় আসর ভাঙল। যে যার তাঁবুতে গেল ঘুমুতে। ছেলেদের জন্য দুটো তাঁবু, এক-একটায় দুজন। সুজাতার জন্যে একটি। হাইন্‌রিকের জন্য আর একটি।

তাঁবুতে ফিরে সুজাতা হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে সামান্য প্রসাধন করল। লণ্ঠনটা স্তিমিত করে শুতে যাবে, এমন সময় পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল হাইন্‌রিক। অবাক হল সুজাতা। হাইন্‌রিকের পরনে স্লিপিং স্যুট, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মুখে জমাট গাম্ভীর্য।

"আপনি? কিছু কাজ আছে?"

"আছে। আসতে পারি?"

"নিশ্চয়। আসুন।"

হাইন্‌রিক এল, এবং এসে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরল।

প্রথমটা ভয়ানক বিস্মিত হল সুজাতা। বিরাট দেহে সে যেন হারিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখল হাইন্‌রিকের চোখে জমাট নীল বরফ। কঠিন দুটো প্রকাণ্ড বাহু তাকে

পিষে ফেলেছে বিরাট বুকে। সুজাতা ভয় পেল।

"কী করছেন আপনি।"

হাইন্‌রিক উত্তর দিল না। শুধু তার মুখ লেলিহান অগ্নিশিখার মতো সুজাতার সর্বশরীর আস্বাদ করতে লাগলো।

এক ফাঁকে টুপ করে সুজাতা হাইন্‌রিকের বন্ধন কেটে বেরিয়ে এল। সরে গেল তাঁবুর দরজায়। বলল, "এ কী বিশ্রী ব্যাপার? আমি চেঁচামেচি করলে আপনার মান থাকবে? এ সবের অর্থ কি?"

এবার হাইন্‌রিকের মুখে ভাষা এল। সে বলল, "একা থাকতে পারছি না সুজাতা। একা ঘরে হাজার হাজার পাষাণ রাজকন্যা আমার চতুর্দিকে নেচে বেড়াচ্ছে। নিরাবরণ তাদের দেহে পুরুষের কামনা ফল ধরেছে। অথচ কেউ আমার কাছে ধরা দিচ্ছে না।"

"তাই এসেছেন জীবন্ত নারীর খোঁজে?" সুজাতার কণ্ঠে তীব্র ধার।

সে ধার হাইন্‌রিককে কাটল না। "তোমার কাছে আমায় থাকতে দেবে, সুজাতা?" অসহায় বালকের মতো সে যেন কেঁদে উঠল। "আমার একটু ঘুম চাই। না ঘুমুলে আমি পাগল হবে যাবো।"

চুপ করে সুজাতা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "আপনি আমার বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আমি চেয়ারে বসে থাকবো।"

"না, না, না—" চিৎকার করে উঠল হাইন্‌রিক। "তাতে আমার ঘুম আসবে না আমি তোমাকে জড়িয়ে শোব। তোমাকে দেহ আমায় ঘুম পাড়াবে।"

"তার মানে?"

"তার মানে, আমি ঘুমুতে চাই। নারীদেহের স্পর্শ না পেলে আমার ঘুম আসবে না।"

আবার চুপ করে রইল সুজাতা। কিছুক্ষণ পরে বলল, "শুধু স্পর্শ?"

"অন্ততঃ শুধু স্পর্শ।"

সুজাতা এগিয়ে এল। আস্তে শুয়ে পড়লো বিছানায়! হাইন্‌রিককে বললে "আসুন। শুয়ে পড়ুন। দেখবেন, নিজের মান রাখবেন।"

"সে বিচিত্র রজনীর অভিজ্ঞতা হাইন্‌রিক আমাকে বলেছিল।

"আমি নেশাগ্রস্তের মতো সুজাতার পাশে শুয়ে পড়লাম। জড়িয়ে ধরলাম তাকে সে ছেড়ে দিল নিজেকে আমার বাহুবন্ধনে। ছেড়ে দিল, কিন্তু তবু নিজেকে ধরে রাখল শক্ত করে। হাত বুলালো আমার কপালে, গালে, মাথায়। তার ছোট দেহটি ঝরনার মতো বয়ে গেল আমার বিরাট পাহাড়-দেহের গায়ে গায়ে। তাকে বার বার আমি চুমু খেলাম। আমার লুব্ধ হাত দেহে বিচরণ করল। বাধা দিল না সুজাতা। শুধু মাঝে মাঝে বলল, এবার ঘুমোন। আমি ক্ষেপে উঠলাম, কিন্তু সে আমায় নিরস্ত করল। আমি তার কাছে ভিক্ষা চাইলাম, সে টলল না, আমি জোর করতে গিয়ে দেখলাম আমার চাইতে তার জোর বেশি। কুমারী সুজাতা কিছুতেই আমার দেহের আগুনে জ্বলল না। চেষ্টা করল আমার আগুন নিবুতে। এবং কী

আশ্চর্য. এক সময়ে সে আমাকে শীতল করে আনল। ক্লান্ত আলিঙ্গন থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রভাত হবার আগে সে আমায় জাগাল। তাকিয়ে দেখি, বসে আছে সুজাতা চেয়ারে, সারারাত ঘুমোয়নি। মৃদু হেসে বললে, "এবার আপনার তাঁবুতে যান"।

"আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম সুজাতার দিকে সে বলল, 'ভাল ঘুমিয়েছেন তো?' কথা এলো না মুখে, শুধু তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। দেহমন ঝরঝরে হালকা হয়ে গেছে সুপ্তিতে। তাবুতে এসে কাজে লেগে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সাধনা সফল হল। রাজকন্যার রহস্য ভেদ করার উত্তেজনায় ছুটে বেরিয়ে প্রথম গেলাম সুজাতার তাঁবুতে। দেখি, সে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে বিছানায়।"

"সুজাতার মতো মেয়ে কেবল ভারতবর্ষেই বুঝি সম্ভব," বলেছিল হাইনরিখ স্ট্রাট্‌জ্‌। "এ ঘটনার পরও দু'সপ্তাহ আমরা ওখানে ছিলাম। সুজাতা সেই যেমন আগে ছিল তেমনি রয়ে গেল। কোনও পরিবর্তন দেখলাম না তার ব্যবহারে, কথাবার্তায়। আমার সঙ্গে একা বসে অনেক কাজ করল। ঘুণাক্ষরে বুঝতে দিল না সে কি ভেবেছে, কি ভাবছে। আগে যেমন চলত, তেমনি চলল আমাদের শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্ক। আমায় একটা সুযোগও দিল না মাপ চাইতে। তার ছোট শীর্ণ দেহের, ঢলঢলে বুদ্ধিদীপ্ত মুখের পানে তাকিয়ে মনে হল, সে রাত্রির ঘটনাটা যেন সত্যি নয়, আমার স্বপ্ন, আমার মায়া।

দিল্লী ফিরে আসতে আমাদের কাজ শেষ হল। সুজাতার এবার ছুটি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান কাজ সে করেছে। তাকে আমি বড় একটা সার্টিফিকেট দিলাম। বিদায় নিতে এল সুজাতা আমার অফিসে। তার কাজের প্রশংসা করলাম। বিনীত কৃতজ্ঞ হাস্যে সে তা গ্রহণ করল।

"তুমি এবার ছুটি নিচ্ছ?" প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ। একটা কাজ পেয়েছি য়ুনিভার্সিটিতে।"

"খুব ভালো। অধ্যাপক দাতার তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

"জানি। শুধু আপনাকেই রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করেছিলাম। আপনি আমার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আপনার সুপারিশে কাজটা আমার হল। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার ধন্যবাদ জানবেন।"

"আমিও তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ, সুজাতা।"

"কেন?"

"তুমি আমার সম্মান রেখেছে।"

"ও, তাই।"

"কথা বাড়াল না সুজাতা। যাবার সময় হল তার। আমার ইচ্ছে হল চেপে ধরি

ওকে। হাত বাড়ালাম বিদায় করমর্দনের। সুজাতা আনত হয়ে ভারতীয় কায়দায় আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

"সুজাতা চলে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে ভাবলাম, আশ্চর্য এই মেয়েটি! কিন্তু মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, হাইন্‌রিক তুমি ঠকেছ।"

আমি বললাম, "তার নাম পুরুষ।"

চিত্তরঞ্জন মাইতি

প্রথম গল্প প্রসঙ্গে / চিত্তরঞ্জন মাইতি

গাঁয়ের স্কুলের ছাত্র। দশম শ্রেণীতে পড়ি। ইতিমধ্যে কবি হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে পরিচয় সারা স্কুলে। কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। তাঁর ওপর একখানা কবিতা লিখে কলকাতার একটি কিশোর পত্রিকায় পাঠান হয়েছিল। পত্রিকাটির নাম 'কিশোর বাংলা'। পাছে কবিতাটি না ছাপে তাই এক বন্ধুর বুদ্ধির ওপর ভরসা করে আমার পিসিমা পঙ্কজা মাইতির নামে কবিতাটি পাঠান হল। ছাপা হয়ে গেল কবিতা। শুধু ছাপা নয়, সম্পাদক খুশী হয়ে তারিফ করে চিঠি লিখলেন। আরও নতুন নতুন কবিতা পাঠাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

প্রথম ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখে সেদিন ভাল করে খেতেই পারিনি। বন্ধু বললে, তোর নাম থাকলে লেখাটাই বেরুত না। মেয়েছেলের নাম দিতে বলেছিলাম বলে ছাপার অক্ষরে লেখাটা দেখতে পেলি।

অভিমানে লাগল। এবার কাউকে না জানিয়ে, না পড়িয়ে ছোটদের রূপকথার গল্পটি লিখে ফেলে নিজের নামে পাঠিয়ে দিলাম সেকালের সেরা শিশু-পত্রিকা শিশুসাথী'তে। মাস দু'এক পরে একখানা চিঠি এল সম্পাদকের দপ্তর থেকে, তোমার লেখাটি মনোনীত হয়েছে, যথাসময়ে ছাপা হবে।

ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। প্রতিমাসে প্রতিবেশীর বাড়ী গিয়ে শিশুসাথীর পাতা উল্টোই, কিন্তু আমি নেই। বেশ কিছুকাল প্রতীক্ষার পর সকরুণ একখানি পত্র লিখলাম সম্পাদকের উদ্দেশ্যে। আমরা গ্রামের ছেলে বলে কি তিনি এমন করে উপেক্ষা করলেন।

কোন উত্তর নেই। বছর দু'এক পরে ডাকঘর থেকে একখানা বই এল আমার নামে। খুলে দেখি স্বনামে আমার প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। যদিও ইতিপূর্বে কিশোর বাংলা পত্রিকায় আমার নিজের নামে আরও একটি দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তবু গদ্য রচনা হিসেবে এটিই আমার প্রথম সৃষ্টি।

অনেক পরে কলকাতায় পড়তে এসে বিনয় গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে শিশুসাথী অফিসে আমি পরিচিত হই। সম্পাদক হিসেবে আশুতোষ ধর মশায়ের নামে থাকলেও বিনয়বাবুই সম্পাদনার কাজ করতেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। সামান্য গাঁয়ের ছেলের আকুল প্রতীক্ষার সকরুণ চিঠিখানা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেছিল বলে সযত্নে তিনি সেটিকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জেনেও তুলে রেখে দিয়েছিলেন।

খালে বিলে ঝিলে
ঝোপের আড়ালে
লাল ডুরে শাড়ি গায়
বন্য ঝুমকো দুলিছে মৃদুল বায়,

নিঝুম দুপুর
সকরুণ সুরে
'দিদিগো খোকালো' ডাকি
হারানো দিদিরে খুঁজে ফেরে ঘুঘুপাখি।

এই যে এক টুকরো কবিতা, এরই মাঝে লুকিয়ে আছে এক বিষাদ-বিধুর কাহিনী। সেই কাহিনীটি আজ শোনাব।

তখন ভারতভূমি ছিল অনার্য-অধ্যুষিত। পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে কান্তারে ঘুরে ফিরত অনার্য নরনারীর দল। তাদের সুঠাম নিকষ কালো দেহকে ঘিরে রইত বল্কল আর পশুচর্ম। বন্য মধু আর অর্ধদগ্ধ মৃগ মাংস ছিল তাদের আহার্য। তাদের পিপাসার নীর যোগাত গিরি নির্ঝর। বৃক্ষ-কোটর আর পর্বতগুহা তাদের রক্ষা করত শীতাতপ থেকে। তারা তখন সবে পাথরের অস্ত্রগুলোকে মসৃণ করতে শিখেছে, দল বেঁধে ঘোরার প্রবৃত্তিও তাদের মনে একটু একটু করে জেগেছে।

এমন করে তারা একদিন ভারতের পাহাড়ে জঙ্গলে আপনাদের বনরাজ্য স্থাপন করল। সর্দারও হ'ল নির্বাচিত।

তাদের এই ঘর বাঁধবার যখন বিপুল আয়োজন চলেছে সহসা কোথা হতে এ'ল এক দারুণ বিপর্যয়। অনার্য রাজের সীমান্তে এ'ল এক গৌরবর্ণ জাতি, দীর্ঘতনু ঋজুদেহ সজ্জিত। চর্মনির্মিত আচ্ছাদনী ফেলে তারই মাঝে কি এক বিপুল ষড়যন্ত্র চলল তাদের।

কোথা হতে এ'ল সারি সারি দারুনির্মিত রথ, অশ্বের দল টেনে আনল সেই রথরজ্জ। কঙ্করময় পথে পথে বেজে উঠল রথচক্রের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি। দিকে দিকে ঘোষিত হল এক নব জাতির আগমন। বনান্তরাল হতে অর্দ্ধনগ্ন অনার্যের দল উঁকি মেরে দেখল। তারা সহ্য করতে পারল না অনার্যপুরে এই নবাগতদের অনধিকার প্রবেশ।

সেদিন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকার টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল শিলা-ঘর্ষিত অগ্নিতে। বনে বনে শুষ্ক ডালপত্রে জ্বলে উঠল আগুন। সেই অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসল অনার্যদের মন্ত্রণাসভা।

স্থির হ'ল, নিশাকালেই তারা করবে আক্রমণ। একত্রিত হ'ল অনার্য নরনারী বাল, বৃদ্ধ, যুবা, হাতে নিল মসৃণ পাথরের অস্ত্র আর অমসৃণ শিলাখণ্ড। বিচিত্র শব্দে বনান্তর উঠল কেঁপে, শিলায় শিলায় উঠল প্রতিধ্বনি। ভীত, ত্রস্ত, বন্য মৃগযূথ ছুটে চলল বন হতে বনান্তরে।

বহুকালব্যাপী দুপক্ষে হ'ল তুমুল সংগ্রাম। সে সংগ্রামের ফলাফল যে কি হ'ল তা ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে। সহস্র অনার্যের রক্তে রঞ্জিত হ'ল শিলাস্তূপ। রক্তপ্রবাহ ছুটল গিরি-নির্ঝরিণীর স্রোতধারায়। দলে দলে বন্দী হয়ে অনার্যেরা চলল বন-সীমান্তে আর্য-শিবিরে।

বিচার-সভায় আর্যরাজ বসেছেন, বন্দী অনার্যের দল অদূরে শৃঙ্খলিত চরণে রয়েছে দাঁড়িয়ে। বিচারে নিষ্পত্তি হয়ে গেল, অনার্যের দলকে হতে হবে আর্যদাস। নির্যাতনের নমুনায় অনেকে বরণ করল দাসত্ব। যাদের দাস হতে বাধল তারা দিল শির। সর্বশেষে এ'ল অনার্য সর্দারের পালা। পাশে তার দাঁড়িয়েছিল কন্যা মহুয়া, পুত্র ভল্লু। বৃদ্ধ সর্দার তাদেরকে করল আশীর্বাদ। কেঁপে উঠল তার ওষ্ঠ, মুখে জেগে রইল দৃপ্ত তেজ। অনার্য সর্দার শির দিল তবু শের দিল না।

মহুয়ার মৃত্যুর আদেশ দিতে গিয়ে আর্যরাজ ক্ষণকাল থেমে গেলেন। ইঙ্গিতে প্রহরীর দল মহুয়াকে নিয়ে গেল আর্যলীলাপুরে। বুকে তার জড়িয়ে রইল ভল্লু।

ভল্লুকে কেড়ে নেওয়ার বহু চেষ্টা করা হ'ল, কিন্তু শিশু সে। দিদির কোলেই বেড়ে উঠেছে এতকাল, শক্ত করে সে জড়িয়ে রইল মহুয়ার দেহ। রাজা ক্রূর হাসি হেসে ভল্লুকে যেতে দিলেন মহুয়ার সাথে।

নিঝুম রাত্রি। পাহাড়ের গায়ে বহুক্ষণ চন্দ্রালোক ছড়িয়ে পড়েছে। জ্যোৎস্নায় স্নান করে নিয়েছে শিলাখণ্ডগুলি। পাগল রজতকিরণ ঝরে ঝরে পড়ছে বনবীথির শিরে আর নির্ঝরিণীর ধারায় ধারায়। আধো আলো, আধো আঁধারে বনভূমি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মৃগযূথের আর্ত-চীৎকারে কম্পিত হ'ল বন-জ্যোৎস্নার ধারা। শ্রান্ত মহুয়ার তন্দ্রা ভেঙে গেল। শিবিরের বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। মৌল ফুলের মাতাল গন্ধরেণু বাতাসের উপর ভর করে ঝলকে ঝলকে ভেসে চলেছিল। পাহাড়পুরে কোথায় যেন একটানা সুরে সঙ্গীত বেজে চলেছে।

মহুয়া ফিরে তাকাল ভল্লুর পানে। ঘুমের ঘোরে ভল্লুর পুরু পুরু ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। মহুয়া ভাইটিকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল বুকে। এস্ত পাদচারণে বেরিয়ে কেঁপে এ'ল শিবিরের বাইরে। তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীর দল টের পেলনা তাদের পলায়ন।

বনে বনে ঘুরে বেড়ায় মহুয়া, ভাইটিকে সারাক্ষণ জড়িয়ে রাখে বুকে। বন্য মধু খায়, জলপান করে ঝর্ণায় নেমে, আশ্রয় নেয় পর্বতগুহায়।

এদিকে আর্যপুরে সাজল প্রহরী। ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল মহুয়ার সন্ধানে।

সেদিন নিঝুম দুপুর। পর্বতের গায়ে প্রখর সূর্য ঢেলে দিয়েছিল তার অগ্নিরশ্মি। গুহায় থেকে ভল্লুর পেল জলতৃষ্ণা। মহুয়া ভল্লুকে একা রেখে বেরিয়ে গেল জলের সন্ধানে। অদূরেই ছিল মৌচর ঝিল। ঝল্‌মল্‌ করছে তার জল। মহুয়া ঝিলে নেমে অঞ্জলিভরে পান করে নিল।

সহসা বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠল অশ্বখুরধ্বনিতে। রাজার সেপাহী পর্বত গুহায় আবিষ্কার করল পলাতক সর্দারপুত্র ভল্লুকে। শিশুর রক্তে সেদিন চমকে উঠল শিলাখণ্ড।

ঝিলের কূলে দাঁড়িয়ে মহুয়া সব দেখল। চকিতে ঝাঁপ দিল ঝিলের অথৈ জলে

র্ত সে হয়ে গেল একটা ঝুম্‌কো ফুল। ঝোপের মাঝে অতি সংগোপনে সে নিজেকে ডাল করে রাখল।

এদিকে ভল্লুর ছোট প্রাণটুকু দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা পাখীতে রূপান্তরিত যে গেল।

'দিদিগো—কোথালো?'—ডাকতে ডাকতে সে হারানো দিদির খোঁজে উড়ে চলল নে বনান্তরে।

সে পাখীটিকে সবাই জানে। তাকে ডাকে ঘুঘু বলে। নিঝুম দুপুরে যখন বিদিক্ থম্-থম্ করে, চরাচর তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে, তখন গাছে গাছে ঘুঘু হারানো দিদিকে জে ফেরে।

স্কুল পালান দুপুরে পথ দিয়ে চলতে গিয়ে তোমাদের কারু সাথে যদি ঘুঘুর দেখা য় যায়, তবে তাকে বলো যে ঝোপের আড়ালে ঝুমকো ফুলটি তারই পথ চেয়ে স আছে।

(আমাদের গ্রাম্য প্রবচন রয়েছে যে ঘুঘুর ডাক বড় করুন, আর সেই ডাকে—দিদিগো, কোথালো?' সুরটিই ধ্বনিত হয়।)

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

১৮৮৬ সালে ফরিদপুরের খোর্দমেঘচামী গ্রামে জন্ম। বাবা, স্বর্গত কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত। মা, সৌদামিনী। ১৩৩১ সালে ২৯শে ফাল্গুন সংখ্যায় 'বিজলী' পত্রিকায় জগদীশচন্দ্র গুপ্তের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। গল্পের নাম, 'পেয়িং গেস্ট।' ছাপার অক্ষরে অবশ্য তাঁর প্রথম লেখা 'মির্জার স্বপ্ন দর্শন' নামে একটি অনুবাদ গল্প যেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়। ১৯৫৭ সালে জগদীশচন্দ্র পরলোকগমন করেন।
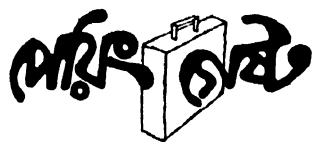
"প্রথম যখন বিয়ে হল
ভাব্‌লাম বাহা বাহা রে—"

এটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রণয়-সম্ভাবনার সূত্রপাতেই প্রিয়া আমার ভুল মুচড়ে ভেঙে :লেন। প্রিয়ার লজ্জা ভাসাবার কষ্ট আমাকে করতে হয়নি, কারণ তিনি লজ্জাটাকে ংস্কার মনে করতেন এবং সেটাকে নির্মূল করেই তিনি এসেছিলেন।

অতি অল্প সময় পরেই দেখলুম। প্রিয়া আমাকে উপার্জনক্ষম দেখতে যতটা গ্রহান্বিতা, উপার্জন করতে আমি সেই অনুপাতে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারিনি। এটা :টা অসামঞ্জস্য। অসামঞ্জস্যের যা অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের কোরক দাম্পত্যজীবনে ই ফলে গেল। একটা বিপ্লব ঘটল। তিনি যত ঠেলতে লাগলেন, আমি ততই চেপে তে লাগলুম, কাজেই সংঘর্ষণে আগুন জ্বলল, প্রিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করলুম। ঝগড়া াশাই পরক্ষণেই লঘুক্রিয়ায় গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তিনি কথার সুর ছাড়লেন না। দাদারা ার ওপর থাকলেও এবং জীবিকা সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হবার আবশ্যকতা না কলেও, বিদেশে গিয়ে টাকা রোজগার করে স্বতন্ত্র বাসা করে স্বস্ত্রীক একা বাস করার ধ্য যে একটা অবাধ আনন্দ আছে, প্রিয়া আমাকে অতঃপর সেই আনন্দের প্রলোভন খাতে লাগলেন।

জীবনের ষোলটি বসন্ত তিনি অনূঢ়া অবস্থায় পার করে এসেছিলেন। স্বতন্ত্র বাসায় মাকে নিয়ে একা থাকবার ইচ্ছার মূলে সেই ক্ষতিপূরণের অভিলাষ ছিল কিনা তা র অন্তর্যামী জানেন। আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলুম এই ভেবে যে ঁাকে দেশে :ে স্বাধীনতার তল্লাশে বিদেশে গেলে আমার যে সময়ের ক্ষতিটা হবে, উপার্জন না করতে পারি তবে সে ক্ষতির পূরণ হবে কি করে?—এই প্রশ্নটির সদুত্তর আমি পেলেও লেপ্টে থাকারই জয় হল, "দেখি" বলে সুর টেনে বেরিয়ে পড়লুম।

॥ দুই ॥

আমার বন্ধু ননী বলত, কাজের জায়গা কলকাতা। পকেটমারার ব্যবসা থেকে টজাল পর্যন্ত এবং মোসাহেবী বা বাজার সরকারী থেকে লাটদপ্তরের চাকরী পর্যন্ত—

অসৎ ও সংকাজের কেন্দ্র ঐ স্থানটি। ননী বয়সে বড়, বুদ্ধিমান এবং রোজগেরে সুতরাং তার কথা মেনে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে তার বাড়াতেই উঠলুম। উপার্জনের ক্ষেত্রের সন্ধান না পেলে 'স্বতন্ত্র' বাসার সন্ধান করা বৃথা।

দু'দিন অতিথিভাবে থেকে মাসিক একটা 'খরচ' দেবার কথাটা বলতেই ননী রাজি হয়ে গেল।

বললুম,—যৎসামান্য বারোটি টাকা, তবে যদি তার বেশী দেওয়া দরকার মনে কর তাতেও—

ননীর কাছে চক্ষুলজ্জার কোন কারণ আমার ছিল না। তাই টাকার কথা বলতে পারলুম, কিন্তু ননী শশব্যস্তে আমার মুখ চেপে ধরে কথা শেষ করতেই দিলে না।

একটা ঘরে বিছানা পেতে ফেললুম। ভাবলুম, কলকাতায় আহার এবং বাসস্থান মাত্র বারো টাকায়! বড জিতেছি।

সোল্লাসে এই খবরটা প্রিয়াকে দিলুম। লিখলুম, যাত্রা শুভক্ষণেই হয়েছে।

॥ তিন ॥

ছেলেবেলায় ভূষণ নামে একটা বিদেশী ছেলে আমাদের লেখার সাথী ছিল। খুব বলবান, কিন্তু হাঁ ছিল তার বড। এই কারণে তাকে একদিন হিডিম্ব রাক্ষস বলে কটুক্তি করে হেসেছিলুম। মনে মনে তার রাগ ছিল। কিছুদিন পরে একদিন স্নানের সময় সে প্রতিশোধ নিলে। ডুব সাঁতার কেটে খেলতে খেলতে একবার হঠাৎ ভূষণের গায়ের কাছে গিয়ে হুপ করে ভেসে উঠতেই সে ফস করে আমার ডানা দু'খানা ধরে ফেললে এবং রাক্ষসের মত হাঁ দানবীয় উল্লাসে আরও বিস্তৃত করে আমাকে নাচাতে সুরু করে দিলে'—একবার ডুবিয়ে ধরে, পরক্ষণেই টেনে তুলে আবার তখনি ডুবিয়ে ধরে। আমাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য তার ছিল না, মিনিটখানেক ডুবিয়ে ধরে রাখলেই সে উদ্দেশ্য অক্লেশে সিদ্ধ হত। জলের মধ্যে মুহুর্মুহু ওঠ-নামা করায় হাঁপিয়ে নাকে মুখে জল ঢুকে দম বন্ধ হয়ে সেদিন প্রাণ আমার ওষ্ঠপ্রান্তে এসে পড়েছিল। আজ ডাঙায়, ঘরে বসে, ঠিক সেদিনকার মতই প্রাণ আমার ওষ্ঠপ্রান্তে এসে পড়ল, ননী এবং তার স্ত্রীর আদর নাকেমুখে ঢুকে আমার দম বন্ধ করে দিতে লাগল। সে কী মি আদর, কী মিষ্ট আপ্যায়ন, কী মিস্ট সম্ভাষণ, কী মিষ্ট কথা, কী মিষ্ট ব্যবহার, আমা সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাদের কী তীক্ষ্ণ লক্ষ্য; যেন আমি তাদের দেশের শি রাজপুত্র, প্রাসাদ ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্যে তাদের কুটিরে খেলতে এসেছি, তারা তা সম্ভ্রম মিশ্রিত অগাধ আদরের মধ্যে দোলা দিয়ে দিয়ে আমার নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমারই সৌভাগ্যবশতঃ বহুপূর্ব হতেই এই নিয়ম চলে আসছে যে, যে নাচে সে-ও হাঁপায়। যে নাচায় সেও হাঁপায়। জাগতিক এই নিয়মের বশেই ননী এবং তার স্ত্রী হাঁপিয়ে উঠে আমাকে নাচাবার সেই অদৃশ্য রজ্জুটা ক্রমশঃ আলগা দিতে লাগলো।

ভাবলুম, বাঁচা গেল। অস্বাভাবিকতার ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে আমার যন্ত্রণার অবধি ছিল না, এখন স্বাভাবিক মানুষের মত, নিজের খেয়াল মতই নড়ে চড়ে স্বচ্ছন্দভাবে থাকতে পারব। বাড়াবাড়ি আদর যে পরাধীনতার শৃঙ্খল, এই মূল্যবান অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় করলুম।

কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার যে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য সত্য তা দড়ির টান কম পড়তেই বুঝতে পারিনি ; তবে বুঝতে বেশী বিলম্বও হল না। দিন পাঁচ সাত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগস্থলে কাটিয়ে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে পড়লুম।

ননীদের বাড়ীটা বনিয়াদি, কাজেই সেটা গলির গোলকধাঁধার মধ্যিখানে, স্যাঁত-সেঁতে অন্ধকারময় এবং দুর্গন্ধযুক্ত। উপরতলায় জল এবং বাষ্প পৌঁছিতে পারে না বলে ওরি মধ্যে একটু গন্ধহীন আর শুকনো। জল নীচের তলাতেই আবদ্ধ। দুর্গন্ধটা আর একটু অগ্রসর হয়ে সিঁড়ির পাঁচ সাত ধাপ পর্যন্ত সংগে সংগে উঠে আসে। অন্ধকার এই বাড়ীটার মতই আদি জিনিষ, কাজেই সে এই বাড়ীর সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করে।

বোধহয় আমারই খাতিরে প্রথম প্রথম উপরেই খাওয়া হত। দিন দশেক পরেই নেমে এলুম।

চা উপরে আসত, তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলুম, নামছি বেশ! দুদিন নীচে নেমেই খানিকটা ফিনাইল ঢেলে গন্ধটাকে নিস্তেজ করে দিলুম, কিন্তু তৃতীয় দিনে বোতলটা খুঁজে পাওয়া গেল না, দেখে মনে দার্শনিক ভাবের উদয় হল। তাহা এই—পণ্ডিতগণ বলেছেন সময় সন্তাপহারক, তাঁরা বলতে ভুলেছেন যে, অভ্যাস দুর্গন্ধাপহারক। পাপী আমি, নরককুণ্ডে বাস আমায় নিশ্চয়ই করতে হবে এবং সেটা গোলাপজল তৈরী নহে। সুতরাং অভ্যাসের দুর্গন্ধাপহারিকা শক্তি যদি এখন থেকে পরেরের জন্যে আমায় প্রস্তুত করে তোলে তবে তাতে আপশোষের কোন কারণই থাকে না, বরং ভালই হয়।

প্রতিক্রিয়া লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হতে লাগল।

ননী এবং আমি এক সঙ্গেই নীচে নেমে চা খেয়ে আসতুম।

দ্বাদশ দিনের দিন ননীর ছেলেটা নীচে থেকে ডেকে বললে,—বাবা চা হয়েছে, নেবে এস। হরেন কাকা পরে খাবে।

ননী নেমে গেল। কিছু পরেই আমারও ডাক পড়ল। গিয়ে দেখলুম ননী চুমুক দিয়ে চা খাচ্ছে, ঘরটি ঘিয়ে ভাজা সুজির গন্ধে আমোদিত।

আমি আসবার আগেই ননী হালুয়া খেয়ে সেরেছে মাত্র, গন্ধের দ্বারা তার নিঃসংশয় প্রমাণ হয় না। পাশের বাড়ীতে—

কিন্তু দেখলুম, (অবশ্য দৈবাৎ)—চায়ের পেয়ালা এবং রেকাবী ছাড়া তৃতীয় একটি পাত্র ননীর সম্মুখে স্থাপিত এবং সেই পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট মোহন ভোগের কণা।

এই প্রকার যে বাদ পড়ে, বাদ পড়ার মধ্যে তার একটা সহজ লজ্জার স্বরূপহীন সেতু হইত থাকে। আমি লজ্জা পেলুম।

হঠাৎ একদিন আমায় চা খেতে ডাকলে না।

চিৎ হয়ে শুয়ে ছাতের বনিয়াদি ঝুল দেখছিলুম, ননী কতক্ষণ পরে মুখ মুছতে মুছতে

এসে মিষ্টকণ্ঠে বললে—চা খেয়ে এস, ভাই। তোমার চা নিয়ে সেই তখন থেকে বসে আছে।

ঝুল দেখা বন্ধ করে লাফ দিয়ে উঠে পড়লুম, কারণ ডবল লজ্জা আক্রমণ করল বন্ধু পত্নী আমার চা আগলে সেই তখন থেকে বসে আছে, পেয়ালায় চা ঢালা রয়েছে এবং সেই তখন থেকে ঢালা থাকার দারুণ চা সুশীতল স্নিগ্ধ হয়ে আছে। ঢক ঢক করে এক চুমুকে অবিকৃত মুখে সমস্তটা চা নিঃশেষে পান করে একটা বিড়ি ধরিয়ে গরম বো করতে লাগলুম। সুশীতল চা তিন দিন খেতেই সর্দি লেগে গেল।

প্রতিক্রিয়ার এমন দ্রুত অবতরণ, অথচ তার মধ্যে কেমন একটা উপভোগ্য সব শৃঙ্খলা। দেখে খুসী হলুম।

ভাতের সঙ্গে তরকারীর সংখ্যা এবং পরিমাণ যথোপযুক্তই পেতুম।

অতীতের একটা দিনে ননী ব্যথিতসুরে অনুযোগ করে বলেছিল,—তুমি কি খেতে ভালোবাসো কিছুই ত' বল না, ভাই। অত যদি লজ্জা করে চল তবে ভারি দুঃখিত হব তখন ক্রিয়ার উত্থানের দিন, সেই দড়ি আমায় সমানভাবে নাচিয়ে চলেছে। ননী ব্যথিত সুর আমাকে আঘাত করল, গদগদ প্রাণে চার পাঁচটি প্রিয় তরকারীর না করে ফেললুম। ননী স্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে,—মোচার ঘণ্ট, ইলিশ মাছের কাঁটা দিয়ে শাক, কুচো চিংড়ির বড়া, লাউয়ের তরকারী, কই মাছ সহযোগে, আর একটা কি বললে?—

আমি বললুম,—সুক্তো।

ননী বললে,—হ্যাঁ সুক্তো। এই পঞ্চ তরকারী আমাদের বন্ধুটি ভালবাসেন মনে থাকে যেন।

তার স্ত্রী তখন এত জোরে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল যে মনে থাকবে, যে আমি ভেবেছিলুম, হাঁসের ডিমের ডালনার কথাটা না বলা ভাল হয় নি।

কিন্তু নিম্নগামী প্রতিক্রিয়ার স্রোতের মুখে পড়ে সব ভেসে গেল, ভারি জিনিষ মনে উপর দাঁড়াতে পারল না।

চায়ের ঐ ঘটনার পরদিন আমার বিশেষ প্রিয় তরকারী-পঞ্চের মধ্যে মোচার ঘণ্ট স্বাদের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে করতে আহারে বসে দেখলুম লেবুর এক টুকরো আমার পাতে দিতে ভুল হয়ে গেছে। নেবু জিনিষটা কলকাতায় বেশী দামে বিকা এবং আমার মুখরোচক, কিন্তু একখণ্ড চেয়ে নেওয়া হল না। চেয়ে নেওয়া আমা আসে না; দ্বিতীয়তঃ ভুলটা দেখিয়ে দিয়ে ননীর স্ত্রীকে লজ্জা দেওয়া শোভন হবে বলে মনে হল না। ভুলটা নিত্যই হতে হতে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

পরদিন প্রতিক্রিয়া একটা তবকারীকে স্পর্শ করল।

॥ চার ॥

ভাত আমি বেশী খাই না এবং পর্বতপ্রমাণ ভাত একেবারে ঢিবি বেঁধে থালায় দি আমার আহারে রুচি কমে যায়, আদরের দড়ি গলায় পরে একদা যখন নাচছিলুম, ত

একসময় লজ্জার মাথা খেয়ে ঐ কথা বলে ফেলেছিলুম। তখন কথাটার সুফল অনুমান করতে পারি নি।

ননীর স্ত্রী আমার রুচির দিকে বেশ লক্ষ্য রেখে সুবিবেচকর মত বেশ কম করেই দিত, কিন্তু এখন কাজের ভিড়ের দরুণ আমার আর ভাত লাগবে কিনা তা যাচাই করতে তার ভুল হতে লাগলো, অথবা অবসরের অভাব ঘটতে লাগলো। আজকাল ননী আমার আগেই খায়। ননীর সঙ্গে ননীর স্ত্রী অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত উপরে উঠে যায়, আমার আঁচাবার শব্দ পেলে তবে নামে। উপরেও কি এত কাজ! কখন যে সে কি করে—কি করবে তার কিছুই ঠিক নেই।

যাহা হউক, আমার লাজুক মুখচোরা স্বভাবটা একটা পরিবারের উপকারে লেগে গেল দেখে আমি তৃপ্ত হলুম।

প্রিয়াকে লিখলুম, –এখানে আহারাদির কোন প্রকার কষ্ট হইতেছে না। তজ্জন্য চিন্তার কারণ নাই।

শীত বাড়ল। এই দুরন্ত শীতে দুবেলা সমানে রান্না ননীর স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব। শীতের দিনে ডাল-তরকারী পচে ওঠবার আশঙ্কা নেই, কাজেই সন্ধ্যার পর চারটি চাল কোনমতে কায়ক্লেশে সিদ্ধ করে নিলেই ও-বেলাকার ডাল-তরকারী দিয়ে বেশ চলে যায়। দু'দিন চললেও, তৃতীয় দিনে আর চলল না। কিন্তু আমি বোধহয় প্রহ্লাদ শ্রেণীর জীব, কার ধ্যানে তন্ময় হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ভুলে আছি কে জানে। কষ্ট অনুভব করবার সামর্থ্যই আমার লোপ পেয়ে গেছে।

আমার জন্যে ও-বেলাকার ভাতই থাকতো। শীতের দিনে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ঘরে ভাত দিব্য বরফের মত শীতল হয়ে থাকতো, আমি সোনার মত মুখ করে তাহা আহার করতুম, ননীর স্ত্রী ননীর পাতের ওপর ধূমায়মান ফুলকো লুচি কাঠিতে বেঁধে এনে ছেড়ে ছেড়ে দিত। দুই গ্রাস ভাত মুখে তুলতেই আমার আঙ্গুলের ডগাগুলো কুঞ্চিত হয়ে কনকন করতো, সর্বাঙ্গ ভিতরকার হিমে সিরসির করতো, আর আমি অধোমুখে হেসে হেসে দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে ননীর সঙ্গে কলরব সহকারে আলোচনা করতুম।

আমি আশ্চর্য হলুম এই ভেবে যে আমি এত অল্পদিনের এই বনিয়াদি পরিবারের মনের মত মানুষ হয়ে গেলুম কি করে। আমার কোন কাজই এখন আর তারা পছন্দ করে না। আগে এক গ্লাস জলের জন্য আমি নীচে নামলে ননী রাগ করত। কেন? –চাইলে কি ওরা এক গ্লাস জল ওপরে দিয়ে যেতে পারে না? স্নান করে একদিন কাপড়খানা নিজেই কেচেছিলুম। ননী তাই দেখে আমাকে দু'টাকা জরিমানা করে টাকা আদায় করে তবে ছেড়েছিল এবং এমন কাজ আর করব না বলে শপথ করলে তবে টাকা ফেরত দিয়েছিল।

এখন আমি চা খেয়ে কাপ নিজেই ধুয়ে রাখি। কাপড় নিজেই কাচি, বিছানা নিজেই ঝাড়ি-পাতি, যে ঘরটাতে থাকি তা নিজেই ঝাঁট দি ইত্যাদি। কিন্তু ননীর সঙ্গে মিত্রতা আমার এমনই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে যে আমার কোন কাজে বাধা দিয়ে আর আমায় সে ক্ষুণ্ণ করতে চায় না।

প্রিয়াকে লিখলুম,—আমি সংসারে উপযুক্ত হয়ে উঠেছি। এখন সংসার পাতিতে যা বিলম্ব!

॥ পাঁচ ॥

পোনা মাছের ল্যাজের মত কাঁটার বালাই শিমূল গাছেও নেই। চুলের মত, সূচের মত, সোজা, বাঁকা নানা আকারের কাঁটায় ল্যাজ একেবারে ঠাসা। ভেজে দিলে কাঁটা চিবিয়ে ভেঙে-চুরে একরকম সহনীয় করে নেওয়া যায়, কিন্তু ঝোলে ঐ ল্যাজের কাঁটা একলব্যের পরে কুকুরের মুখের মত একেবারে নির্বাক করে দেয়। 'দেয়' মানে যারা আমার মত প্রহ্লাদ মার্কা মানুষ নয়, তাদের দেয়। আমার মুখ গহ্বর এবং জিহ্বা নৃসিংহদেব রক্ষা করেন কিনা সে সন্ধান আমি জানতুম না এবং পরীক্ষা করবার প্রয়োজন ইতিপূর্বে হয়নি; তবু পরীক্ষায় আমি সসম্মানে পাশ হয়েছি এই বনিয়াদি বাড়ীতে যত ল্যাজ এসেছে তার সবগুলির ভোক্তাই আমি, কিন্তু তার কাঁটা নৃসিংহদেবের কৃপায় ভোজবাজীর জ্বলন্ত অঙ্গারের মত আমার মুখের কিছুই করতে পারে নি। মাছের মাথার কথা স্বতন্ত্র।

অখাদ্য বিবেচনায় মাথার প্রতি লোভ আমার কোনদিনই নেই। ইলিশ মাছের পেটি?—রাম কহ। কই কহ। কই মাছের পেটি?—অসুখের ডিপো, পেটে গেলে রক্ষা থাকে না। ঐ সব নিদারুণ অখাদ্যের প্রতি আমার আন্তরিক বিতৃষ্ণার বিষয় আমি কখন সশব্দ ভাষায় প্রকাশ করি নি, কিন্তু দেখলুম প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

শীতের রাত্রে গরম লুচি এবং মাছের মাথার কালিয়া খেয়ে ননী সস্ত্রীক শুকিয়ে উঠতে লাগল। যা খেয়ে আমার একটু ভুঁড়ি দেখা দিল তা বলেছি।

প্রিয়াকে ভুঁড়ির খবরটাও দিলুম।

॥ ছয় ॥

এইবার উপসংহারের মুখে এসে যা বলব তা শুনে আপনারা আমায় অকৃতজ্ঞ, ঘৃণ্য দুষ্টুবুদ্ধি, অভদ্র, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ ইত্যাদি যার যা মুখে আসবে তাই বলে গাল দেবেন ত? আমি বারণ করছি, দেবেন না। আপনাদের প্রত্যক্ষ সম্মুখে বসে কেউ কখনো ঘৃতে ভাজা তপ্ত লুচি মাছের মাথার কালিয়া দিয়ে খেয়েছে কি? আপনারা শীতের দিনের চৌদ্দ ঘণ্টার কড়কড়ে ভাত চৌদ্দ ঘণ্টার বাসি তরকারী সহযোগে গলাধঃকরণ করতে করতে সম্মুখবর্তী সেই লোকটার কুণ্ঠাহীন লুচিভক্ষণ দেখেছেন কি? শীতের প্রাতে যখন এক পেয়ালা ধূমোসারী উষ্ণ চায়ের তৃষ্ণায় সমস্ত দেহমন হা হা করতে থাকে তখন সুশীতল চা পান করেছেন কি? কাজের ভিড়ের দরুণ আপনাকে ভার্ধেক দিয়ে কেউ রান্নাঘর ছেড়ে অন্তর্ধান হয়েছে কি? এইসব ঘটনা জীবনে যদি ঘটে থাকে তবে আপনারা আমায় মার্জনা করবেনই। যদি না ঘটে থাকে তবে আমার

কু-কথা বলবার আগে, বেশী নয়, এক পেয়ালা ঠাণ্ডা চা শীতের প্রাতে খেয়ে দেখবেন। দেখবেন মনে তখন দুর্দান্ত কৌতুকেচ্ছার উদয় হয় কিনা।

॥ সাত ॥

মৎস্যের মস্তক ভক্ষণ দেখতে দেখতে একদিন কৌতুক প্রিয়তা হঠাৎ কেমন অসহ্য হয়ে উঠল। ভাবলুম, মাথা খাওয়া বন্ধ করতে হচ্ছে।

আপনাদের মধ্যে মনস্তত্ত্ববিদ যদি কেউ থাকেন তবে তিনি হয়ত ভুরু তুলে টেনে টেনে বলবেন, এ-টা বাপু, তোমার কৌতুক প্রিয়তার নয়, রাগের কথা। হাসছ বটে কিন্তু তোমার অন্তর জ্বলছে।

উত্তরে আমি বলব এখন জ্বলছে না, তবে জ্বলেছিল একদিন। প্রিয়া আমাকে যে স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছেন তারই সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেলা একটার সময় ক্ষুধায় অন্ধকার দেখতে দেখতে বাড়ি ঢুকে যেদিন দেখেছিলুম আসনের সামনে থালার উপর ভয়ানক কালো কি একটা জিনিষ স্তূপীকৃত করা আছে, আর আমার পায়ের হাওয়া লেগে তার ওপর থেকে উড়ে গিয়েছিল লাখখানেক মাছি, আমার অন্তর জ্বলেছিল সেইদিন—আর পণ্ডকারী মাছির বিরুদ্ধে এখন জ্বলছে না। যাক।

অনেক মাথা ঘামিয়েও মাথা খাওয়া বন্ধ করবার একটা পন্থা মাথায় এলো না। কিন্তু হাল ছাড়লুম না। মাছের মাথা খেও না বলে স্পষ্টবাক্যে নিষেধ করতে যাওয়া পাগলামী। মাছের মা পুত্র-কন্যার কল্যাণ কামনায় এ নিষেধ করতে পারে, তাতে অসঙ্গতি-দোষ ঘটে না।

আমি মাছের কে?

তাপ্রাণ চেষ্টায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন একটা কৌশল মনে এসে গেল—ঠিক ভোরবেলায়। তারিখটা মনে আছে ২রা জানুয়ারী। তারিখটা মনে থাকবার একমাত্র কারণ এই যে লেপের মধ্যে মুখ নিয়ে তখন খুব খানিকটা হেসেছিলুম। কেউ কেউ বলতে পারেন, ঐ তারিখটা মনে রাখবার মধ্যেই, বাপু, তোমার প্রতিহিংসার শিখা লক লক করছে। কিন্তু আমি বলবো, দোষান্বেষীর এ আবিষ্কার সাপের খোলসের মত আসল জিনিষ নয়।

কাল বিলম্ব না করে লেপের মধ্যে কাগজ, পেন্সিল নিয়ে একটা মুসাবিদা করে ফেললুম, এবং সেই সকালবেলাই ছাপাখানায় গিয়ে পাঁচশ' 'কপি'র অর্ডার দিয়ে এলুম।

কাগজ লাল কালিতে ছাপা হল, কারণ লাল রং বিপদের নিশানা। একটা খোট্টা ছোকরাকে আট আনা বখশিস দিয়ে বেলা সাড়ে আটটার সময় ছাতুবাবুর বাজারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলুম। ননীর বাজারে যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে সে কাগজ বিলি করতে লাগল।

ননী বাজার নিয়ে এল। মাছের ন্যাকড়ার গিঁট খুলতেই রুই মাছের এতবড় একটা মাথা গড়িয়ে পড়ল। সেদিন মাথাটা পড়ল আমার পাতে।

আহারান্তে হুঁকো টানতে টানতে ননী বললে,—আমার সার্টের পকেটে লাল

কালিতে ছাপা একখানা কাগজ আছে বের করত।

করলুম।

ননী বললে, পড়। বড় আশ্চর্য কথা লেখা আছে। দিন দিন বিজ্ঞানের যে রকম উন্নতি হচ্ছে তাহাতে খাওয়া দাওয়া সব ছাড়তে হবে দেখছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—কোথায় পেলে এ কাগজ?

—একটা খোট্টা ছোঁড়া বিলি করছিল, একখানা দিলে। যখন বাজার নিয়ে আসছি তখন ব্যাটা দিলে।

ঐ 'নিয়ে'র ওপর বিরক্তিপূর্ণ একটা ঝোঁক দেখায় পরিষ্কার বোঝা গেল, বাজার নিয়ে আসবার সময় না দিয়ে যদি বাজারে ঢোকবার সময় কাগজখানা সে দিত তবে অত বড় মাথাটা আজেবাজে খরচ হত না।

গলা চড়িয়ে পড়তে লাগলাম—

"বিজ্ঞাপন।"

গড়দ্বারা স্বাস্থ্যোদ্ধার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

আমাদের স্বাস্থ্যহানির যতগুলি স্থূল এবং পরিহার্য কারণ লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে মৎস্যই প্রধান। মৎস্য অশেষ অনিষ্টের আকর। মাংস অপেক্ষা মৎস্য দুষ্পাচ্য। আমরা মাংস খাইলে তৎসঙ্গে দুগ্ধ খাই না, কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে মৎস্য সম্বন্ধেও এই সতর্কতা অবলম্বণীয়। মৎস্য খাইবার পর দুগ্ধ পান করিলে উভয়ের সংযুক্ত ক্রিয়া বিষতুল্য হয়।

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক জিনিষ মৎস্যের মাথা। প্রসিদ্ধ জার্মাণ ডাক্তার ভণ ক্রুটেনবর্গ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মৎস্যের মাথার প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রায় ৮০ হাজার জীবাণু বাস করে। ঐ জীবাণুগুলি মৎস্য ভোজীর বিবিধ রোগের মূল কারণ। ২৪ ঘণ্টা জলে সিদ্ধ করিলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জীবাণুগুলি মরিয়া যায় বটে কিন্তু সবলগুলি জীবতই থাকে। মৎস্যের মাথার ঘি খাইলে দৃষ্টিশক্তি সবল হয় এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত। ডাঃ ভণ ক্রুটেনবর্গ উল্টাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ পদার্থে দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়, স্নায়বিক দৌর্বল্য বৃদ্ধি পায় এবং পাকস্থলীতে এক প্রকার রস সঞ্চার হয় যাহার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া গুরুতরভাবে বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

(স্বাক্ষর) টি, পি, গাঙ্গুলি, এম-এস্-সি, এম-ডি,

পরিচালক, গড়দ্বার স্বাস্থ্যোদ্ধার সমিতি।

আমি পড়া শেষ করে তাচ্ছিল্যভাবে বললুম, -বাজে কথা।

ননী মাথা নেড়ে বললে,—উঁহুঁঃ। জার্মাণরা বাজে কথা বলে না।

আমি বললুম,—তা-ও বটে।

ননীর পত্রে জানলুম, এখনও সে লুচি খায়, তবে মাছের মাথা বাড়িতে আনা ত্যাগ করেছে।

জরাসন্ধ

জরাসন্ধ / স্মৃতিচারণ

আজ থেকে তিপান্ন বছর আগে ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় একটা গল্প লিখেছিলাম। বলা বাহুল্য, স্বনামে। তার নাম 'ঘৃণার দান'। হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে বা তখনকার ছোটখাট স্থানীয় পত্রিকায় দু-চারটে কলমের আঁচড় বাদ দিলে ঐটাই আমার প্রথম লেখা, প্রথম গল্প তো বটেই। তারপর কবে কোথায় সেটা হারিয়ে গেল। আর খুঁজে পাইনি।

গল্পটার পিছনে মানসিক পটভূমি কী ছিল এতদিন পরে সঠিক বলা কঠিন। একটা আভাস দেওয়া যেতে পারে।

তখন এম. এ. পাশ করে গেছি। ঘাড় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা নেমেছে, কোন কাজকর্মের ভাব এসে চাপেনি। প্রকৃতি শূন্য সহ্য করে না। তাই বোধহয় সাহিত্যের ভূত এসে ভর করল। বয়সটা তো স্বপ্ন দেখার বয়স। প্রথম—ভবিষ্যতের স্বপ্ন, অর্থাৎ একটা কিছু অবলম্বন, যা ধরে দাঁড়াতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। আর একটা স্বপ্নও লাগে ঐ সঙ্গে। তার নাম নারী-চেতনা। একটি নারীর সঙ্গ এবং তার হৃদয়ের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান। দুদিকেই নৈরাশ্যের ছায়া। চাকরি নামক বস্তুটি একান্ত দুর্ঘটনা, মাথা খুঁড়েও জোটানো কঠিন, আর নারী নামক ব্যক্তিটি তার চেয়েও দুর্লভ, বিশেষ করে একটি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের জীবনে। আজকের মত অন্তঃপুরের বাইরে সমাজের নানা স্তরে তারা ছড়িয়ে পড়েননি। স্কুল কলেজে ছেলেমেয়েদের সহপঠন তখন অকল্পনীয়। পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে যারা আসতেন—সংখ্যায় অতি নগণ্য—তাদের আসন ছিল ছেলেদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে অধ্যাপকের পাশে। তাঁরই সঙ্গে প্রবেশ, তাঁরই সঙ্গে প্রস্থান।

আমার মাথায় তখন এক দুষ্টবুদ্ধি চেপে বসেছে। ছোটখাট কাগজ নয়। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। পাঠিয়ে দিলাম 'বিচিত্রায়', তখনকার দিনে প্রখ্যাত এবং অভিজাত পত্রিকা।

আমার ঠিকানা লেখা টিকিট আঁটা খাম ছিল গল্পের সঙ্গে। জানতাম, ফেরত তো আসবেই। কিন্তু এল না। তার বদলে এল একখণ্ড 'বিচিত্রা'। কয়েক পৃষ্ঠা পরেই 'ঘৃণার দান'।

॥ ১ ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি পরীক্ষাতেই বাগ্দেবীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলাম। শেষবারে এমন কোপবৃষ্টি হইল যে, তাহার চাপে নামটা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর কাঠায় গিয়া ঠেকিল। আত্মীয় বন্ধু দলে দলে দুঃখ জানাইয়া গেলেন। কিন্তু যাহার জন্য জানাইলেন। সে মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হয় নাই। সে দেখিল, ঘাড় থেকে দেবী যমনি নামিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনিব আসিয়া চাপিবেন, এ আশঙ্কা রহিল না, কেননা, থার্ড ক্লাস এম-এ, বাংলা দেশের পারিয়া। চাকরির সভায় তাহাদের হুঁকা বন্ধ। সুতরাং যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও কিছু নেই। একেবারে অবাধ, উন্মুক্ত মুক্তি।

দ্বিপ্রহরের সুখনিদ্রার পর দক্ষিণের খোলা মাঠের দিকে তাকাইয়া এই কথাই ভাবিতে ছলাম। অজয় আসিয়া কহিল, আর কেন? আবার যাত্রা শুরু হোক। আর একটা group তো আছে।

বলিলাম, ঠিক বলেছ, যাত্রা শুরু করবো।

বন্ধু খুশী হইয়া কহিল, বেশ বেশ। কি নিচ্ছ তা'হলে?

সুটকেস আর একটা বিছানা।

কি রকম?

বলিলাম, যাত্রাটা এবার আর ভাবরাজ্যে নয়, একেবারে খাস ভারত রাজ্যে।

বন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, বল কি, এযে শুকনো কাঠে ফুল। অর্থনীতির মরুভূমিতে কাব্যের ফোয়ারা।

অজয়ের দোষ নাই। দেশ ভ্রমণটা যে নিছক কাব্য রোগের লক্ষণ এ ধারণা আমারই। এজন্য। একবার কোন্নগর যাওয়া ছাড়া, হাওড়া ষ্টেশনের ওধারে আর কখনো পা দিই নাই। কেননা, এই রোগের উৎপাত সম্বন্ধে আমার গদ্য পিপাসু মন চিরকালই একটু বেশী সজাগ। অবশ্য কাব্যকে অবহেলা করি নাই। ইংরাজী সাহিত্য পরীক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, পড়িয়াছি। আর বাংলাও যে একেবারে পড়ি নাই তাহা নয়। মাঝে মাঝে চয়নিকার পাতাও উলটাইয়াছি। তবুও এ কথা সত্য যে আমার বর্তমান ভ্রমণ লিপ্সাটি আর যে কারণেই হোক, কবিত্বের তাড়নায় নয়।

শুভকর্মে বাধা চিরকালের নিয়ম। মাতাঠাকুরাণী বাঁচিয়া ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র। নিঃসন্তান এবং ধনবান মাতুলের স্নেহে ও অর্থে মানুষ হইয়াছি।

অথচ এতকালেও কেন যে তাহাদের একটা দাসী আনিয়া দিই নাই, তাহার কো
যুক্তিযুক্ত কারণ আমিও খুঁজিয়া পাই না। তবু এতদিন পরীক্ষার ওজর ছিল। কি
এবার মা আসিয়া যখন একসঙ্গে একেবারে গুটি পাঁচ ছয় সুপাত্রীর খোঁজ দিয়া বসিলেন
মাথা চুলকানো ছাড়া অন্য উত্তর জুটিল না। অবশেষে অনেক অনুনয়ের পর কিছুদিনে
ছুটি মঞ্জুর হইল।

বিবাহ-সম্বন্ধে এই অরুচি বা আতঙ্ক আধুনিক তরুণ সম্প্রদায়ে একাধিক ক্ষেত্রে
দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, অমুকের মন যে বিবাহে বিমুখ, তাহার কারণ বিবাহে
কেন্দ্রটির দিকে সে উন্মুখ। আবার সে সৌভাগ্যও জুটিল না। কাব্য লক্ষ্মীর মত র
মাংসের লক্ষ্মীও আমার মনোমন্দিরের বাহিরেও রহিয়া গেলেন, বাহিরে থাকিয়া
রেহাই পাইলেন না। সময়ে অসময়ে সে অভিনন্দন লাভ করিলেন তাহাকে আর যা
হোক প্রীতি বা শ্রদ্ধা বলা চলে না। তাহার কারণও ছিল। চার বৎসরের অর্থনী
বিদ্যা আমাকে দেখাইয়াছে, প্রায় অর্দ্ধ সংখ্যক বুভুক্ষু অথচ অকর্ম্মণ্য উদব অপর অর্দ্ধে
দুয়ারে হাত পাতিয়া আছে বলিয়াই দেশের এই শোচনীয় দারিদ্র্য। দেশী এবং বিদেশ
বিশেষজ্ঞগণ যেদিন আমাদের hoarded wealth (মাটি চাপা ধন) পরিমাণ লইয়
ঝগড়া বাধাইলেন, আড়াইশ কোটি কি তিনশ কোটি-আমি প্রথম দলেই সায় দিলুম এব
বুঝিলাম, এই সাড়ে ষোল কোটি বিলাসিনীর গয়না জোগাইতে হয় বলিয়াই ভারত
মূলধনের অভাব, ব্যবসায়ের দৈন্য, বেকার সমস্যা, দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু, ম্যালেরিয়া ও জ
প্লাবন। তারপর ম্যালথাসের ভূত যে আমাদের ঘাড়ে চাপিবার উপক্রম করিয়াছে
তাহার মূলেও এই নারী। অথচ ইহারাই আবার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রের জন্য সভামঞ
দাঁড়াইয়া তারস্বরে বক্তৃতা করে, আর তাহার সভাপতিত্ব করে পুরুষ। Institu
সেনেট হলের সভায় শ্রীমান অমুক চন্দ্র ভিড়ের চাপে পিষিয়াই মরিলেন। আর শ্রীম
অমুক দেবীর পাঁচখানা আসন আগে থাকিতেই রিজার্ভ। এম-এ ক্লাসের ছাত্রী হইতে
চেয়ার টেবিল, আর ছাত্রদের জন্য ভাঙা বেঞ্চিতে ঠেলাঠেলি। একজিবিসনে
থিয়েটারে, ট্রামে, বাসে, রেলগাড়ীতে, ভাঁড়ার ঘরে, দোকানে, দেব-মন্দিরে-সর্বত্র এ
মহিলা পূজা। পুরুষ জাতির এতবড় কলঙ্ক আর কিছু আছে? আমার এই মত য
স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছি, বন্ধুগণ আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও তাঁহাদের মত অস্প
রাখেন নাই। কিন্তু তাহার ফল দাঁড়াইয়াছিল উল্টাই। তাই মা যখন বলিলে
"পশ্চিমে যাচ্ছিস, ওদিকে ভালো মেয়ে পাওয়া যায়। কয়েকটির খোঁজও আছে। দে
আসিস না?" তাঁহাকে মিথ্যা আশ্বাসটা আর দিতে পারিলাম না।

॥ ২ ॥

রেলগাড়ীর ভিড় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং অস্বস্তি খুবই হইয়াছিল। বি
ভিড়ের মধ্যে বিজাতীয় প্রাবল্যটা আরোও দুঃসহ লাগিল, মনে হইল যেন সমস্ত স্ত্রী
বাংলা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বোঝাই করিয়া পশ্চিমে চালান হইতেছে। নিরুপায়

মুখখানা যথাসম্ভব হাঁড়ির মত করিয়া বসিয়াছিলাম। একটা কি Station গার্ড, থামিতেই আর দুইজন। একটি তরুণী তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে নিয়া উঠিলেন। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র এ কথা নাকি বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় বলিয়াছেন। অতএব একটি চশমাপরা যুবক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। তরুণীটি তাঁহার শূন্যস্থানের জন্য শূন্য ধন্যবাদ দিয়া পিতাকে সেখানে বসাইয়া দিলেন। গাড়ীতে অন্যতম যুবক যাত্রী আমি। এবার উঠিবার পালা আমারই, একথা যেন স্বতঃসিদ্ধের মত সকলেই একরকম মানিয়া নিয়া আমার দিকে চাইলেন। ইহার পরে আমার ওঠা একেবারেই অসম্ভব হইল। তরুণীটি আমার দিকে একবার তাকাইলেন। সে দৃষ্টি কিসের জানি না। তবে মিনতির নয়। খানিকটা যেন কৌতুকের মতই লাগিল। তিন চার স্থল হইতে তাঁহার বসিবার আহ্বান আসিল। যুক্তকরে প্রত্যাখান করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং ঠিক আমার সম্মুখেই কাহার একটা ট্রাঙ্ক ছিল, তাহার উপরেই বসিয়া পড়িলেন। আমি পা দুইটা একটু টানিয়া নিলাম। মহিলাটি একটু হাসিয়া কহিলেন, আপনার একটু অসুবিধা হবে, কিছু মনে করবেন না।

আমি না হাসিয়াই কহিলাম, না, কোনটা না? অসুবিধা, না মনে করাটা?

আমি বলিলাম, অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে। তবে কিছু মনে করবে না।

কারণ জানতে পারি কি?

প্রস্তুত ছিলাম না। কহিলাম, ঠিক জানিনা। বোধহয় আপনার অনুরোধ।

ওঃ। বলিয়া টানা চক্ষু দুটি আরো একটু টানিয়া জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ হইলেও ইচ্ছা কখনো হয় নাই। ইহাদের কথা বলিবার রীতিনীতি তেমন জানিনা, তবু ইহাকে কেমন অদ্ভুত ঠেকিল। বয়স বোধ হয় উনিশ কুড়ি। রূপ বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমার নেই। তবে মোটের উপর তিনি সুন্দরী। বিশেষ করিয়া, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যে জিনিষটি অত্যন্ত বিরল, তাঁহার মুখে একটা বুদ্ধির জ্যোতি ছিল। কতকটা সেই কারণে তাঁহার এই সাবলীল সহজ ভাবকে অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি পশ্চিমে যাচ্ছেন এই প্রথম। তাই নয়? বলিলাম, হাঁ। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, কি করিয়া জানিলেন। কিন্তু পাছে ছোট হইতে হয়, তাই চাপিয়া গেলাম। আবার প্রশ্ন হইল, কোথায় যাবেন? ষ্টেশনের নাম বলিলাম।

সেখানে কে আছেন?

কেউ না।

বেড়াতেই যাচ্ছেন তো?

বলিলাম, হুঁ।

গাড়ীর মধ্যে একবার চাহিয়া দেখিলাম প্রায় সমস্ত চক্ষুই এইদিকে কতক বিস্ময়ে, কতক ঈর্ষায়, কতক বিরক্তিতে। মহিলাটির সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি কখনো

জানালার বাহিরে চাহিতে ছিলেন কখনো একটু বাঁকা চোখে আমায় দেখিতেছিলেন একবার মনে হইল, একটা চাপা হাসি তাঁহার ওষ্টে গণ্ডে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

একটা ছোট স্টেশনে গাড়ী থামিতেই, মহিলাটি উঠিয়া ডাকিলেন, বাবা, ও বাবা তাঁহার বাবা ঝিমাইতেছিলেন, চমকিয়া শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। 'এদিে এসো' বলিয়া মেয়েটি হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আপনি উঠছেন না যে?

আমি জানালা দিয়া কষ্টে ষ্টেশনের নাম পড়িয়া দেখিলাম, তাহার গন্তব্য স্থান বটে। কিন্তু স্থানটির চেহারা দেখিয়া এবং বিশেষ করিয়া এই সঙ্গিনীটির কল্যাণে নিজে অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া নামিবার মত ইচ্ছা বা জোর খুঁজিয়া পাইলাম না। সম ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া কেন যে এটিই চোখে পড়িল এবং কে কিছুনা জানিয়াই একটা টিকিট কিনিয়া বসিলাম, তাহার একটু ইতিহাস ছিল। শুনি ছিলাম নামকরা স্বাস্থ্যনিবাসগুলি এ সময়ে এক একটি রীতিমত মহিলানিবাস হই উঠে। সেই জিনিষটি এড়াইবার জন্যই এমন একটি স্থান খুঁজিয়া নিয়াছিলাম, যাহা নামটা এক টাইম টেবল ছাড়া আর কাহারও কাছেই শুনি নাই। তখন কে জানি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা থাকিলে পোড়া শোল মাছও জলে পালায়। কাহার মুখ দেখিয়া বাহি হইয়াছিলাম।

ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া মেয়েটি নামিতে নামিতে মৃদুস্বরে কহিলেন, গাড় কিন্তু এখানে সারাদিন থাকে না। চাহিয়া দেখিলাম সুমুখেই একটা কুলী দাঁড়াইয়া আছে সে যেন সমস্ত চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি দিতে আসিয়াছে। জানালা দিয়া বাক্স বিছা তাহারি হাতে তুলিয়া দিয়া নামিয়া পড়িলাম। পিছনে হইতে একগাড়ী লোকের চা হাসি আর চাপা রহিল না। সমস্ত রাগ পড়িল ঐ মেয়েটার উপরে। দেখিলাম, তেম করিয়া এখনো মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। স্ত্রীলোক না হইলে—।

ষ্টেশনে আর একটিও বাঙালী যাত্রী নাই, অন্যান্য যাত্রীও অত্যন্ত কম আত্মগোপন করিব সে পথও বন্ধ। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একরাশ বিনয় এবং কৌতূহল নি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় উঠবেন?

একটি ঝাঁজের সঙ্গেই বলিলাম, উঠবো যেখানেই হোক এক জায়গায়।

ভদ্রলোকটি যেন থতমত খাইয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে আবার কহিলেন, আপন কোন আত্মীয় আছেন?

বলিলাম, না, একটা হোটেল টোটেল দেখে নেবো।

তিনি স্নেহের সঙ্গে বলিলেন, ওসব তো এখানে কিছু নেই। ছোট জায়গা। আমরা তিন ঘর মাত্র বাঙালী, আর সব ছাতুখোর।

কন্যাটি চাপা গলায়, অথচ আমাকে শুনাইয়া কহিলেন, বোধ হয় ষ্টেশন হ'য়ে থাকবে।

ভদ্রলোক নিতান্ত সরল এবং সত্যকার সহানুভূতির সঙ্গে কহিলেন, ওঃ তাহলে বড্ড অসুবিধা হ'বে। তা' এ বেটাদের যে আলোর ব্যবস্থা ষ্টেশন ভুল করা কিছু ম আশ্চর্য নয়। বলতে কি, দেখুন, আমার এই মা-টি না থাকলে আমারও ঠিক

অবস্থাই হ'ত। যাক্‌গে, কি আর হ'য়েছে? চলুন এই গরীবের বাড়ী। যা জোটে, রাতটা কোনরকমে কেটে যাবেই।

চলুন, বলিয়া অগ্রসর হইলাম। কিন্তু কণ্ঠস্বরে রাগ চাপা রহিল না।

॥ ৩ ॥

নিজেকে গরীব বলিয়া ভদ্রলোক যে একটি বৈষ্ণব বিনয়ের সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, পরদিনই তাহা বোঝা গেল। বাড়িটি ছোট। কিন্তু তাহার প্রতি অঙ্গে, এবং তাহার ভিতরকার জীবনযাত্রার প্রতি ছন্দে যে ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি দেখিলাম। তাহা মোটেই ছোট নয়। সকাল বেলা যে সব ভৃত্যের দল আমাকে সাহায্য করিতে আসিল, তাহাদের কাছে শুনলাম, ইহার নাম সুবোধচন্দ্র রায়। পূর্ব্ব বাংলায় কোথায় বড় জমিদার ছিলেন। ভ্রাতৃ বিচ্ছেদে সব বিক্রী করিয়া এখানে আসিয়া আছেন। এখন থাকিবার মধ্যে এই সুলতা। ইহারও সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। বর বিলাতে পড়িতে গিয়াছে। শেষের খবরটায় বুকের ভিতরটা যেন কেমন একটু নড়িয়া উঠিল। ভাবিলাম, এ আবার কি? পরক্ষণেই খুব খানিকটা হাসি পাইল। সুলতা আসিয়া কহিল, ঘুম ভাঙল? হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলাম না। তাহার দিকে খানিকটা নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলাম। কি জানি, এই কিছুক্ষণ আগের বুক কাঁপার সঙ্গে ইহার যোগ ছিল কিনা। তাহার সাজগোজের বিশেষত্বটা বেশ লাগিল। মেয়েদের এ-সব খুঁটিনাটি কখনো চোখে পড়ে নাই। আজ পড়িল। আমার এ ভাবান্তর বোধ হয় তাহার চক্ষুও এড়াইতে পারে নাই। কহিল, কি ভাবছেন?

বলিলাম, কই কিছুই না।

আপনার বুঝি ঠাণ্ডা চা খাওয়া অভ্যাস?

বলিলাম, ঠাণ্ডা গরম কোন চা'ই খাওয়ার অভ্যাস নেই।

কেন, মেয়েরা করে বলে? কিন্তু আজ আমি করিনি। আপনি নিরাপদে খেতে পারেন। বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ইহার ব্যবহারে বিস্মিত হইবার মতো আর বিস্ময় ছিল না। তবু কেমন খটকা লাগিল। একি আমার নারী বিদ্বেষ লইয়া ঠাট্টা? কিন্তু সে খবর ইহাকে কে দিল? কিছুক্ষণ পরে কহিল, আপনি আজই যাচ্ছেন তো?

প্রশ্নটা অদ্ভুত। কহিলাম, হ্যাঁ।

ন'টা ৪৩ মিনিটে আপনার গাড়ী।

বলিলাম, তাতেই যাবো।

কিন্তু ১১টার আগে আমাদের রান্না হয় না।

সে না হ'লেও চলবে।

আপনার চলতে পারে কিন্তু আমাদের চলবে না।

বলিলাম, কেন?

অতিথি অভ্যাগতকে না খাইয়ে যেতে দেওয়া ভদ্রলোকের নিয়ম নয়। বলিয়া তেমনি হাসিয়া চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই কর্তার ঘরে আমার ডাক পড়িল। অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কহিলেন, আমার সুবল থাকলে আজ তোমার মতই হ'ত। সুতরাং তোমাকে বাবা 'তুমি'ই ডাকবো। তুমি যখন বেড়াতেই বেরিয়েছ, তখন কিছুদিন এইখানেই থেকে যেতে হবে। এ জায়গাটাও বেশ। আর আমারও একজন কথা ব'লবার লোক পাবো। সজাতির মুখ তো এখানে বড় একটা দেখা যায় না। হাঁ আরো শুনলাম, তুমি অর্থনীতির এম-এ। আমারও বাবা ঐ জিনিষটার ওপর বড় ঝোঁক কিন্তু অনেক কথাই বুঝতে পারিনে। বুড়োবয়সে কিছুদিন তোমার ছাত্র হ'তে লোভ হ'চ্ছে।

কহিলাম, তা' বেশ।

আশ্চর্য্যময়ীর আরো একটা পরিচয় পাওয়া গেল। আমি অর্থনীতির এম-এ, এ খবরটাই বা ইহার কানে আসিল কি করিয়া?

দুপুরবেলা প্রায়ই অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতি আলোচনা হইত। সেদিন যুদ্ধপীড়িত ইউরোপের মুদ্রাপ্রমাদ সম্বন্ধে বিশদভাবে বক্তৃতা করা গেল। বৃদ্ধ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন, সুলতাও ছিল। শেষ হইলে পিতা গর্ব্বভরে কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন কিরে কেমন? সুলতা যেন ধ্যানে ছিল। চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া নিয়া কহিল, হ্যাঁ, এ ছাই আবার লোকে পড়ে, আর ঘটা ক'রে বক্তৃতাও করে, বলিয়া উঠিয়া গেল। বৃদ্ধ যেন আহত হইলেন। কহিলেন, ওর কথায় কিছু মনে ক'রোনা বাবা। ও ঐ রকম পাগলী। ওর মায়ের যাবার পর থেকে ও-ভাবটা ক্রমে বেড়েই চলেছে।

বলিতে বলিতে সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির উপর কোন দূরাগত স্মৃতির ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, কিন্তু এটা আমি ঠিক জানি, অরুণ, ও সব কথাই বুঝেছে। আমার চেয়ে ভালোই বুঝেছে।

সেদিন সুবোধ বাবুর শরীর ভালো ছিল না। দুপুরবেলা নিজের ঘরে বসিয়া মাকে চিঠি লিখিতেছিলাম। সুলতা একটা বই নিয়া প্রবেশ করিল। কহিল, কি লিখছেন? কবিতা?

হাসিয়া কহিলাম, হাঁ।

হাঁ কি রকম? আপনি কি মনে করেন কবিতা লেখা একটা অপরাধ?

মুখ না তুলিয়াই কহিলাম, অপরাধ নয়, অপব্যয়।

কিসের?

শক্তি এবং সময়ের।

মৃদু হাসিয়া কহিল, বটে? কিন্তু এই আমি বলে রাখলুম, আপনাকে আমি একদিন কবিতা লিখিয়ে তবে ছাড়বো। দেখি আপনার অর্থনীতির 'ডিমাণ্ড আর সাপ্লাই' কেমন করে রক্ষা করে।

তেমনি হাসিয়াই জবাব দিলাম, তাই যদি হয়। সেদিন আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলবো না।

দেখা যাবে—বলিয়া কাছে আসিয়া কহিল, কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে?

বলিলাম, আপনার জেনে লাভ?

মাকে? ও! আমার কথা লিখবেন না?

বলিয়াই যেন অপ্রস্তুত হইল। চাহিয়া দেখি সুন্দর মুখখানা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে। একটু কৌতুক লাগিল, বলিলাম, কি লিখবো? মুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া নিয়া কহিল, লিখবেন, এ রকম লক্ষ্মীছাড়া নির্লজ্জ মেয়ে আর দেখিনি। এর জ্বালায় দিনগুলো নেহাৎ তিক্ত হ'য়ে উঠেছে।

লিখিতে লিখিতে বলিলাম, হুঁ, তারপর?

বাঃ আপনি সত্যিই লিখছেন নাকি? না-না ছিঃ।

কলম রাখিয়া বলিলাম, তবে থাক্।

হঠাৎ যেন বহু দূর থেকে অপূর্ব্ব কণ্ঠে কহিল, সত্যি, মাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

এই চপলা মেয়েটি একমুহূর্তে এমন হইয়া যাইতে পারে ভাবিতে পারা যায় না। অনেকক্ষণ পরে আবার ছিন্ন সূত্রে ফিরিয়া গিয়া কহিল, কই, আপনার চিঠি শেষ করুন। কবিতা শোনাতে হবে।

বলিলাম, শোনাতে না শুনতে?

কেন?

প্রথমটি হ'লে নমস্কার। আর দ্বিতীয়টি, তা যখন বলছেন, আচ্ছা আরম্ভ করতে পারেন।

বইটা বোধহয় চয়নিকা। যেখান সেখান থেকে পড়িয়া যাইতে লাগিল। তন্ময় হইয়াই শুনিয়া গেলাম। কিন্তু কি শুনিলাম, সুকাব্য না সুকণ্ঠ বলিতে পারিব না। 'কচ ও দেবযানী' পড়িতে পড়িতে শেষের দিকে সেই আশ্চর্য্য কণ্ঠ যেন ধরিয়া আসিতে লাগিল। শেষ না হইতেই বইখানা রাখিয়া দিয়া জানালা দিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কবিতা পড়িয়া তন্ময় হইতে অনেককে দেখিয়াছি। চিরকাল হাসিই পায়। আজ দেখিলাম, পাইল না। অনেকক্ষণ পরে আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, দেবযানীকে আপনার কেমন লাগে?

বলিলাম, অনেক দিন আগে একবার এটা শোনা গিয়েছিল। তখন রাগ হ'ত। আজ হাসি পাচ্ছে। একটু দয়াও হ'ল।

চমকিয়া উঠিল, হাসি পাচ্ছে! কেন?

বলিলাম, মেয়েটার বোকামি দেখে।

চাহিয়া আছে দেখিয়া আর একটু পরিষ্কার করিয়া কহিলাম, ওর মাথায় এটা ঢুকল না, কচ মস্ত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। এই সব ছিঁচকাঁদুনে প্রণয় ব্যাপারে মন দেবার তার সময় নেই।

সুলতা উঠিয়া দাঁড়াইল, এ সব আপনি সত্য বলছেন?

আপনার সন্দেহের কারণ?

দুই পা পিছাইয়া গিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, আপনার এতখানি অহঙ্কার কিসের জন্য, শুনি তো?

অদ্ভুত প্রশ্ন। তাহার চোখদুটি দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছিল। কহিল নিছক দেবযানীর ওকালতি বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না, একটু পরে আবার সে আসিল। আর এক দফার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, হঠাৎ অত্যন্ত সহজ হাসি কণ্ঠে কহিল, নাঃ আপনার অবস্থা খুব কাহিল নয়। প্রথম পরীক্ষাতেই পাশ করেছেন আমি একটু চমকে দেবার চেষ্টায় ছিলাম, নিশ্চয়ই ধরতে পারেননি ?

আমি জবাব দিব কি। 'হতভম্ব' হইয়া চাহিয়া রহিলাম, আবার কহিল, দেবযা সম্বন্ধে আমারও ঠিক ঐ ধারণা। কিন্তু লোকে কত চোখের জলই না ফেলে। যেমন—বাবা ডাকছেন বুঝি—যাই বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া চলিয়া গেল। আ মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, সুলতা তুমি অসামান্য বুদ্ধিমতী, কিন্তু তবু তুমি মেয়ে মানুষ লুকাইতে পার নাই। তোমার চোখই সব বলিয়া দিয়াছে।

সুলতা এবার যতদূর সম্ভব আমাকে এড়াইয়া চলিত। আবার যখন-তখন বি প্রয়োজনে আমার ঘরের পাশ দিয়া অকারণ দ্রুতপদে চলিয়া যাইত। কর্তার ঘা নিয়মিত আড্ডায়ও তাহাকে দেখা যাইত না। কিন্তু কোন কোন দিন বাহির হইতে দেখিয়াছি দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কথা বলিতে গেলে, যেন দেখিতে পায় না এমনভাবে চলিয়া যাইত। সেই করুণ চক্ষুদুটি মনে পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কে কাজেই মন দিতে পারিতাম না। আবার মাঝে মাঝে তাহাকে অত্যন্ত কঠো দেখাইত, যেন কাহার সঙ্গে লড়িতেছে। নারীহৃদয়ের রহস্য নিয়া কোনদিন মাথা ঘাম নাই। আজও মাথা অঘর্মাক্ত রহিল। কিন্তু কেন জানি না মনটা মাঝে মাঝে যে কোন অলক্ষ্য বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। ভয় হইত, কী এ ? শেষকালে কি সত্য কাব্যরোগে ধরিল ? অথবা সেই বড় রোগটায় ?

॥ ৪ ॥

কিছুদিন থেকে আর ভাল লাগছিল না। সেদিন ভোরে উঠিয়া ভাবিতেছিলা এবার তল্পী বাঁধা যাক। কিন্তু সেদিকেও যেন ঠিক মনটা সরিতেছিল না। হঠাৎ সুল আসিয়া হাজির, সাজগোজটা খুবই বিশেষ ধরণের। মুখে একটি সজীব হাসি অনেকদিনের মেঘলা ভাব কাটিয়া গেলে প্রভাত যেমন করিয়া হাসে তেমনি। মনা যেন ভরিয়া গেল। হঠাৎ মুখ থেকে বাহির হইল, বাঃ। একটু লজ্জিত হইল কহিলাম, আজ কী ?

আজ যে আমার জন্মদিন, শীগ্‌গির কাপড় পরে নিন, ঝর্ণার ধারে যেতে হবে হাঁটতে পারবেন তো ?

বলিলাম, না পারলে আপনিই তো আছেন। হাতটা বাড়িয়ে দিলেই চলবে।

একবার চাহিয়া দেখলাম। চোখাচোখি হইতেই দৃষ্টিটা নত করিল। এক ঝলক রক্ত চোখে মুখের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। একটু কাছে আসিয়া কহিল, জন্মদিনে আমাকে কি দেবেন বলুন তো ?

বলিলাম, কি চান আপনি ?

সে আমি কি জানি ?

বিপদে পড়িলাম। কাব্যের ভাষায় এ সব ক্ষেত্রে কি বলিতে হয় জানা ছিল না,·
একটু হাসিয়া কহিলাম, দেবার মত কিছুই তো দেখছিনে।

মনের ভেতরটা খুঁজে দেখুন, পাবেন।

হাসিয়া বলিলাম, কই, আমি তো পেলাম না। আপনি যদি পান নেবেন।

আমি ওরকম দান চাইনে। বলিয়া ছেলেমানুষের মত মাথাটায় একটু ঝাঁকুনি
দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মিনিটখানেক পরে কহিল, আচ্ছা আপনার জন্মদিন কবে ?

কহিলাম, জানি না।

অতিমাত্র বিস্ময়ে কহিল, জানেন না।

বলিলাম, জন্মালেই একটা জন্মদিন থাকে সে জানি। কিন্তু তার সন তারিখ
মনে করে রাখবার প্রয়োজন দেখিনে।

চক্ষু দুটি, যাহাকে বলে, বিস্ফোরিত করিয়া বলিল, জন্মদিনে উৎসব করেন না।

মানুষের জন্মটা কি এতই বড় যে তার জন্যে ঘটা ক'রে উৎসব করতে হবে। হাঁ·
ওসব মেয়েরা ক'রতে পারে। যাদের আর কিছু নেই, তাদের কাছে জন্মটাই একটা
[illegible]ল।

বলিয়া ফেলিয়াই অপ্রস্তুত হইলাম। অভ্যাসবশতঃ আমার মুখের মেয়ে শব্দটার
[illegible]বণের মধ্যেই যথেষ্ট বিদ্রূপ থাকে। সুলতা যেন আহত হইল। কিন্তু জ্বলিয়া
[illegible] না। আশ্চর্য্য করুণ চক্ষে আমার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে
[illegible] বাহির হইয়া গেল।

আধঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছি, ঝি আসিয়া জানাইল,
মণির অসুখ করেছে, তিনি যাবেন না বললেন।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইয়া ফিরতেই সুলতা আসিল। মুখখানা অত্যন্ত
[illegible]। একটা টাইম টেবিল বাড়াইয়া দিয়া কহিল, এটা আপনার। গাড়ীতে কুড়িয়ে
[illegible]ছিলাম। আর এর মধ্যে একটা চিঠি ছিল। আমি পড়েছি। বুঝতে পারছি,
[illegible]বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে, [illegible] বলিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। এই কুণ্ঠার সুরটা মনে
[illegible]লাগল। কিন্তু [illegible] করে? চিঠিখানা আমার এক বন্ধুর। [illegible]
[illegible]বিশেষ ইত্যাদি লইয়া বক্তৃতা করিয়াছে। বুঝিলাম, আমার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য
[illegible] পাইয়াছে। ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া আনিবার জন্য কহিলাম, পরের
[illegible] অন্যায়, একথা বোধ হয় আপনাদের শাস্ত্রে [illegible] বলে না।

হাত জোড় করিয়া কহিল, আপনি রাগ করবেন জানলে পড়তাম না। আমাকে
[illegible]করুন।

হায়রে, রাগ করিলাম। একটু পরে কহিল, আপনাকে অনেকদিন ধ'রে রেখেছি
[illegible] আপনার বাড়ীর সবাই নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছেন। আপনিও বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন।
[illegible] আপনার ক্ষতি হয়, সেটা আমরা চাইনে।

অতি বিনয়টা ভাল লাগিল না। একটু শ্লেষের সঙ্গে বলিলাম, লাভ ক্ষতি

বোঝবার বয়স আমার অনেকদিনই হ'য়েছে। সেটা আপনাকে কষ্ট ক'রে জানা হ'বে না।

আবার সেই সুর, আপনাকে এখানে নিয়ে আসাটাই ভুল হ'য়েছিল। এ রীতিমত ঝাঁজ দিয়া বলিলাম, তার প্রায়শ্চিত্তটা মনে মনে করলেই পারতেন। এই মেয়েলি ভদ্রতা সবার কাছে মিষ্টি নাও লাগতে পারে।

সুলতা হঠাৎ দীপ্তকণ্ঠে কহিল, আপনার একি রকম কথার ধরণ, শুনি? মেয়ে সম্বন্ধে একটু সংযত হ'য়ে কথা কইবেন।

একটু থামিয়া কহিল, জানি আমাকে আপনি ঘৃণা করেন। কিন্তু মনে রাখবে আমার পক্ষেও সেটা খুবই সম্ভব। নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখেছেন?

বলিয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

মুখের উপরে একটা মেয়ে স্পষ্টভাবে জানাইয়া গেল, সে আমাকে ঘৃণা ক কাহার উপর রাগ করিব? সেই বিক্ষত অন্তরের যে মূর্ত্তি আজ স্বচক্ষে দেখিলাম, তা উপরে আর অস্ত্র বসাইতে ইচ্ছা হইল না। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, কি করিয়া একটু হাসিও পাইল। ভাবিলাম, জাল তো আমি রচনা করি নাই। এ যদি—নাঃ। পরক্ষণেই নিজেকে শক্ত করিয়া কহিলাম, না হোক, তবু ছিঁড়ি হইবে। এই কুৎসিৎ, হৃদয়হ ন নারীবিদ্বেষীর দৃঢ় আকর্ষণ থেকে তাহাকে বাঁচা অতএব শুভস্য শীঘ্রম্। জিনিসপত্রগুলি এখানে ওখানে পড়িয়াছিল। সুটকে টানিয়া নিয়া তাহাই গুছাইতে লাগিয়া গেলাম।...অবশেষে পাইলাম কিনা ঘৃণা। মনটা যেন শেষ পর্যন্ত খুসীই হইল।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া ছিলাম। হাতের জামাটায় একটু টান লাগি ফিরিয়া দেখি সুলতা। কহিল, আপনি এত নিষ্ঠুর। একটু দয়া মায়াও নেই? অ দিকে একবার চেয়ে দেখুন তো? বলিয়া সুইকেস্‌টার ভিতর হইতে সমস্ত জিনি টানিয়া বাহির করিয়া রাখিয়া দ্রুত পায়েই চলিয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া রহিল মনটা যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্পর্শ লাগিল। কোন কথাই আসিল না। শুধু মনে মনে কহিলাম, দয়া মায়া আছে সুলতা। তোমার দিকে চাহি দেখিয়াছি। দেখিয়াছি বলিয়াই আজ যাইতে হইবে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর কর্তার ঘরে গিয়ে কহিলাম, কাল বাড়ি ইচ্ছা করি।

কর্তা যেন আঘাত পাইলেন। কহিলেন, কেন?

মিথ্যা বলিলাম, মায়ের শরীর ভালো নয়।

সুবোধবাবু একটা ভদ্রতাসূচক সহানুভূতিও জানাইলেন না। তাঁহার চি কিছুদিন এমন একটা সূত্র ধরিয়াছিল, আমার কথায় যাহাতে টান পড়িল। কয়ে ধরিয়া অনেক সময়ে ভাবী জামাতার সম্বন্ধে অনেক দুঃখের কথা আমায় বলিতেছি বিলাতে গিয়া সে যে তাঁহার মূল্যবান অর্থ এবং তাহার চেয়ে বড় নিজের মূল্যবান এমন করিয়া নষ্ট করিবে, ইহা তিনি ধারণাই করেন নাই। আজ সকালের ডাকেও বি প্রবাসী এক বন্ধুর পত্রে এমন সব কথা জানিয়াছেন, যাহা কিছুতেই ক্ষমা করা যায়

ার সে চিঠি পড়িয়াছিল স্বয়ং সুলতা। দুপুরবেলা হঠাৎ আমার ঘরে আসিয়া আজ তিনি
ামার নাম গোত্রাদি জানিয়া নিয়াছিলেন, এখন আমার চলিয়া যাইবার প্রস্তাবে
মস্ত মনটাকে এই দিকেই টানিয়া আনিলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা যাও।
চামার মামাকে আমি চিঠি লিখবো। কিন্তু তার আগে তোমার নিজের মতটা
কবার—। অবিশ্যি জিজ্ঞেস ক'রবার কিছুই নেই। তবু—।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কোন বিষয়ে?

সুলতা ঘরের এককোণে দাঁড়াইয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া কহিলেন, সুলতার
ম্বন্ধে।

জবাব দিতে গিয়া আমিও সেইদিকে চাহিলাম। সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।
কবার বুকটা কাঁপিয়ে উঠিল। বারকয়েক ইতস্ততঃ করিলাম। মনে পড়িল, আজই
ন্ধ্যাবেলায়—। না, কোনমতেই না। যে বিরোধ আজ আমার স্পর্শে তুমুল হইয়া
উঠিয়াছে, তাহাকে আর ঘনাইয়া তুলতে চাহি না। ধুলিলুণ্ঠিতা কাঙালিনীকে উঠাইতে
য়া স্পর্দ্ধিতা বিজয়িনীকে অপমান করিব না। জয় মাল্য তাহারি থাক। আমি
লাম। হঠাৎ চোখে পড়িল সুবোধবাবু তখনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।
নরকমে নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিয়া ফেলিলাম, আমার বিবাহ স্থির হ'য়ে গেছে।

সেই সুটকেস্‌টা আবার গুছাইয়া লইয়া সুলতাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে
াসিল, কহিল, আর আসবেন না?

মৃদু হাসিয়া কহিলাম, তোমার বিয়ের সময় চিঠি দিও। আসবো।

সহজভাবেই জবাব দিল, যাবার সময় এ খোঁচাটা না দিলেও পারতেন।

খোঁচা! খোঁচা কেন?

আমার ভাবী স্বামীকে আপনি জানেন। আর এও জানেন, তার সঙ্গে বিয়ে সুখের
য়ে নয়।

অত্যন্ত দুঃখ লাগিল। কিন্তু কিছু একটা বলিবার মত খুঁজিয়া পাইলাম না।

সুলতা কহিল, তবু সেই বিয়েই আমাকে করতে হ'বে; বাবা যাই বলুন। আমি
রা কারো দয়ার ভিখারী নই।

একটু থামিয়া আবার বলিল, আপনার উত্তরে আমি খুসীই হয়েছি, যদিও জানি
া মিথ্যা কথা।

আমি কহিলাম, সুলতা—

না না। আপনাকে আর কষ্ট করে এসে দয়া দেখাতে হ'বে না। হাসিতে
ষ্টা করিল। কিন্তু একী হাসি! চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, শুধু অভিমান নয়।
ই উদ্ধত কণ্ঠের অন্তরালে একটি প্রাণপণ ব্যর্থ চেষ্টার ইতিহাস আছে। কিছুক্ষণ পরে
ই আবার কথা কহিল। কাছে আসিয়া আমার চাদরের একটা কোণ ধরিয়া তেমনি
ন হাসিয়া কহিল, যাবার সময় একটু কবিত্ব করতে ইচ্ছা করছে।

কোন রকমে আত্মস্থ বরণ করিয়া কহিলাম, কি?

একটা আশীর্বাদও করলেন না?

কি আশীর্বাদ চাও?

এই আশীর্বাদ—যেন-যেন—না থাক্, বলিয়া হঠাৎ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সুট্‌কেসটা হাত রাখিতেই যেন তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত মুখ তুলিয়া চাহিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর, যেন আপনার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আমার একান্ত বুকের কাছটিতে সরিয়া আসিয়া অশ্রুভরা চোখদুটি চোখের উপর তুলিয়া দাঁড়াইল, কি একটা বলিতে চাহিলাম, পারিলাম না।

শুধু দুইহাতে তাহার মাথাটা বুকে উপর চাপিয়া ধরিলাম। তাহার সমস্ত দেহখানা কয়েকবার কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে, যেন সহসা চেতনা লাভ করিয়া ছুটির বাহির হইয়া গেল।

আমিও বাহির হইয়া পড়িলাম। শীতের জ্যোৎস্না শিশির ভিজিয়া কুয়াসার আড়ালে মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল এই জ্যোৎস্না, ইহার বুকে যেন রক্ত নাই। সদ্যমৃত সুন্দরীর অধরলগ্ন হাসির মত নিষ্প্রভ করুণ। হঠাৎ কোথা থেকে দুই চোখ ভরিয়া 'হু হু' করিয়া জল ছুটিয়া আসিল, তাহাই মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া পড়িলাম।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

১৯১২ সালে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম। কলেজে পড়াকালীন শ্রীনন্দী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কিছুদিন কারাবরণ করেন। জে ওয়াল্টার থমসন, দমদম এয়ার পোর্ট, দৈনিক আজাদ, যুগান্তর, জনসেবক পত্রিকায় যেমন চাকরি করেছেন তেমনি সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করে গেছেন পাশাপাশি, আজও তা অব্যাহত। জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামেও অনেক লিখেছেন তিনি।

প্রথম গল্প প্রসঙ্গে / জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

১৯৩১-৩২ সালের কথা। আই.এস.সি. ক্লাসে পড়ি। ছোট মফঃস্বল শহরে মানুষ। বাড়ির কাছেই একটা কাফেলা গাছের নিচে মস্তবড় টিনের ঘর একটা প্রেস ছিল সেখানে। হাতে টাইপ সাজান হত। হাতে মেশিন চালিয়ে নানারকম কাগজপত্র হ্যাণ্ডবিল প্রীতি-উপহার শ্রাদ্ধের চিঠি ইত্যাদি ছাপা হত আর সেই প্রেসেই ছাপা হত একটা পাক্ষিক পত্রিকা—নাম "প্রজা-বন্ধু" কাঠের ব্লকে কালি মাখিয়ে প্রজা-বন্ধু শব্দটা বসিয়ে দেওয়া হত। সেই প্রেসেই কাজ করে রোগা ছিপছিপে একটা মানুষ। সারাদিন মুখ বুজে টাইপ সাজাত। প্রজা-বন্ধু ছাপার ব্যাপারে ঐ মানুষটার উৎসাহই ছিল বেশি। বস্তুত আমার "জার্নেলিস্ট" গল্প তাকে দেখেই লেখা। ঢাকা থেকে শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ মহাশয়ের সম্পাদনায় সেদিন "বাংলার বাণী" নামে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরোত। ঐ আমার কাগজে "জার্নেলিস্ট" গল্পটি ছাপা হয়। কমার্শিয়াল কাগজে এই প্রথম আমার মৌলিক গল্প ছাপা হল। এর আগে অবশ্য আর একটা ছোট গল্প লিখেছিলাম। আমাদের কলেজের ম্যাগাজিনে গল্প বেরোয়। কিন্তু সেই গল্পের পাঠক কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই কারণে জার্নালিস্ট গল্পকেই আমি আমার প্রথম গল্প বলব। মনে আছে এক দুপুরে বাবার বৈঠকখানায় বসে গল্পটি লিখে ফেলেছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক সময় লেগেছিল। আজ অবশ্য একটা গল্প লিখে শেষ করতে আমার দু' মাসও চলে যায়। সেদিন কত সহজে এক একটা গল্প লিখে শেষ করেছি ভাবলে এখন অবাক হই। আরও মজা এই যে, সেদিনও আমি কলকাতা শহরের মুখ দেখিনি। অথচ বিশাল মহানগরীর এক রাতজাগা সাংবাদিককে নিয়ে একটা গল্প লেখার দুঃসাহস করেছিলাম।
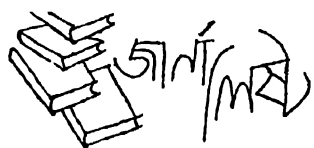
রাত্রি একটার পর প্রেসের আর কেহই বড় জাগিয়া থাকে না—দরকারও পড়ে। কিন্তু নুটবিহারীর চোখে ঘুম নাই। আলো জ্বালাইয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত গজের প্রুফ দেখিয়া যায়। ক্রমে কোলাহলমুখর মহানগরী শ্রান্ত হইয়া নিস্তেজ য়া আসে। এদিকের পাড়াটায় গাড়ির শব্দ, লোক-চলাচল কথাবার্তা সমস্ত নিঃশেষ য়া স্তব্ধ হইয়া পড়ে। দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার একঘেয়ে টিক্ টিক্ শব্দ এবং বিহারীর গলায় ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। হাঁপানীর রামটা নুটবিহারীর সারিল না—আর সারিবে না।

ক্ষণিক অবসাদ আসিয়া নুটবিহারীর দেহটা আক্রমণ করিতে চায়, কিন্তু পর মুহূর্তে ঝাড়া দিয়া ড্রয়ার টানিয়া একটুকরা তালমিশ্রি মুখে ফেলিয়া গলার কম্ফর্টারটা বেশ য়া জড়াইয়া আবার কলম বাগাইয়া ধরে। ভোরের দিকে সব কয়টা কপি ছাপানো য়া বাহির হইয়া আসিতে না আসিতে কাটিয়া ছাঁটিয়া ভাঁজ করিয়া হকারের পিঠে য়া দিয়া শেষে বাকি কাগজগুলা নিয়া ছুটে ডাকঘরে। মফঃস্বলের কাগজ বিদেয় য়া দিলে তবে স্বস্তি। কি নিদারুণ খাটুনিই না ও সহ্য করিতে পারে—আশ্চর্য্য!

ম্যানেজার দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলেন, সিজনটা ফুরোক্ বিহারীর মাইনে দুটাকা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

নুটবিহারী ওসব কথায় কান দেয় না। মাইনে বাড়ুক আর না বাড়ুক সে কাজ য়া যাইবে। একটা বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়া সে কাজে ঢুকিয়াছে অবশ্য ইহা ভাঙ্গিয়া কেও সে বলে না. তবে প্রেসের সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া রোজই সে প্রকাশ নুটবিহারী একটা কিছু পরে অর্থাৎ যথাসময়ে করিয়া বসিবে।

তাহার কাঠির মত হাত পা, হাড় বাহির-হওয়া পাঁজরে, গর্তে ঢোকা চোখ মুখ তদুপরি কেশ বিরল ছোট মস্তকের দিকে চাহিয়া টাইপিষ্ট বিপিন হাসি চাপিয়া থতে পারে না। নুটবিহারীর অনুপস্থিতিতে উচ্চহাস্যে সারা ঘর কাঁপাইয়া বলে, ওর পেপটিক দেহটা নিয়ে কত স্বপ্নই না দেখে—হা-হা। ওকে ক্ষয়ে ধরলো বলে—রা রাত, জাগা বাবা!

অবশ্য আড়ালে-আবডালে ম্যানেজারও অন্য রকম সুর ধরেন, হতচ্ছাড়া প্রুফ দেখবে তো ভুল করবে একশোটা। মাইনে তো ঐ সতেরো—কমানো আর যায় কতে তবু জেঁাকের মত আঁকড়ে আছে।

নাকের ওপর হইতে চশমা জোড়া তুলিয়া চাদরের খুঁট দিয়া মুছিতে মুছিতে শে আবার বলেন, বাজারটা মন্দা নয়ত ভাল একজন এক্সপার্ট হ্যাণ্ড—দেখা যাক। অত কম মাইনেয় সারাটা রাত্রি খাটে মন্দ কি।

সহ্য করিয়া ম্যানেজার উপস্থিত বিরক্তিটা হয়তো চাপিয়া রাখেন।

সকাল বেলা প্রিণ্টার প্রকাশ হাত মুখের কালি ধুইয়া মুছিয়া সবে একটু ধো তরস্ত হইয়াছে। বিপিন মুখের ভিতর ইয়া বড একটা নিমের ডাল পুরিয়া নিতা মনোযোগের সহিত দন্তধাবনের চেষ্টা করিতেছে। হঠাৎ একটা খট্ খট্ আওয়া ওদিক হইতে দ্রুত এদিকে আসিতেই প্রকাশ বলিল, নুটবিহারী।

—তা নয়ত কে, বেটাকে কদিন বলেছি ওহে একজোড়া ঠনঠনের চটিই নয় কি ফেল, সস্তা মার্কেট। শুনে কে। ও বলে ওর নাকি টাকার কি মস্ত দরকার পড একদিন। ব্যাটা খচ্চর—আরে মরতে তো বসেছিস্, ঐ আরশোলার মত দেহ কদিন আর। সত্যি খড়মের ফট্ফটিটা কানে ভারি বিশ্রী লাগে হে প্রকাশ, এই বলি বিপিন আপনার মাংস-বহুল বলিষ্ঠ বুকের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া পুনরায় নিমের ডা বাঁ গালে ঢুকাইয়া দিল। ইতিমধ্যে নুটবিহারী ছুটিয়া আসিল। চোখে মুখে একা ব্যস্ততার ভাব নিয়া বলিল, আঃ তোমরা সারাটা সকাল ঐ ঘষা-মাজাই শুধু করবে এদিকে কত কাজ। ডাক এখুনি এসে পডল বলে, তারপর দৌড়তে হবে এসোসিয়ে টেলিগিরাপের ফর্মাগুলি পূরণ করা এখনও হয় নি, না না হাস কেন প্রকাশ? অত ঢি চলে চলতি চলবে না……ফস্করে উঠে পড়। বক্সী বেটার কাণ্ডটা দেখলে, কত বা হারামজাদাকে ডেকে ডেকে গলা ফাঁটালাম টুঁ শব্দটি নাই, এই বলিয়া নুটবিহারী আ একবার খোলা দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া বারান্দাটা দেখিয়া লইল।

বক্সী অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কলে তৈল ঢুকাইয়া কালি মাখিয়া এটা ফাইফরমাস্ যোগাইয়া ক্লান্ত দেহে ওদিকের বারান্দায় একটু 'গড়া গড়ি' দিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। চোখে মুখে এককোঁটা জল ছিটাইয়া টলিতে টলি আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। আর যায় কোথায়। মুখ বাঁকাইয়া নাসিকা কু করিয়া নুটবিহারী আগাইয়া আসিল। বলিল, বাপু ছ' ছ টাকা মাস মাস, কম না জানোয়ারের দেহটা নিয়ে শিখেছ ঐ কুম্ভকর্ণের বিদ্যেটাই। যা যা এখুনি রেল অফিসে চোদ্দ রীম কাগজ পার্শেলে এসে ঠেকে আছে, বারে, দাঁড়িয়ে যে এখনো?

বক্সী জানিত যত তাড়াহুড়া নুটবিহারী করুক ইহার চার ভাগের একাং ব্যস্ততার প্রয়োজন আপাততঃ এই সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রেসটিতে নাই স্বয়ং ম্যানেজারই সে নির্ভয় দিয়াছে। সকালে যেন সে একটু ঘুমাইয়া নেয় এবং শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখি

কাজ করে। সুতরাং ত্বড়িদগমনের কোন লক্ষণই না দেখাইয়া সুস্থির পদক্ষেপ নিয়া ক্সী ঘর হইতে বাহির হইতেছিল অমনি নুটবিহারী মুখ ঝাম্‌টা দিয়া বলিল, পায়ে তোমার এরই মধ্যে রাত নেমেছে ?

বক্সী মনে মনে হাসিয়া চলিয়া গেল।

রাগিয়া বক্সীর উদ্দেশ্যে কথা ছুঁড়িয়া নুটবিহারী বলিল, আবার মিট্‌ মিট্‌ হাসি—দাঁড়াও কমপ্লেন আনবো, যত সব ইয়ে।

তারপর বিপিনের দিকে চোখ ফিরাইয়া নুটবিহারী বলিল, কৈ হে বিপিন দাঁত যায় এখনও নিবৃত্তি হলো না—

এমনি নুটবিহারী বিপিনের চক্ষুশূল তদুপরি ভারিক্কি চাল। লাভ দিয়া উঠিয়া বিপিন বলিল, কাজ করবার হয় তুমি করো গে বাপু। আমার টাইম আমি জানি—প আর একটা কথা বলো না।

অতবড় আকৃতিটির দিকে মুখ করিয়া সত্যিই আর একটি কথাও নুটবিহারীর মুখ দিয়া বাহির হইল না।

—না—না বলছিলাম বেলা হয়ে যায়, এই বলিয়া প্যান্‌ প্যান্‌ করিতে করিতে পিতনুটি চাদর দিয়া বেশ করিয়া জড়াইয়া পুনবায় খড়মের শব্দে ঘর এবং বারান্দা নিত করিয়া নুটবিহারী বাহির হইয়া গেল।

হাসিয়া প্রকাশ বলিল, বাপ্‌রে কি ভয়ই না ও তোকে করে বিপিন।

—করবে না, একশো বার করবে। তোদের মত নিম মুখো ত আর বিপিন দি নয়—আর গায়ের জোরটা ? এই বলিয়া বিপিন নিজের উচ্ছ্রিত বাহুটা গুটাইয়া নিয়া কলে চলিল মুখ ধুইতে।

প্রকাশ হাঁকিয়া বলিল, ওহে বিপিন সকালে নুটবিহারী কিছু খায়-টায় ত ?

অর্দ্ধপথে মুখ ফিরাইয়া বিপিন বলিল, শ্রীদুর্গা, ওই একটা পয়সার মুড়ি। পেটের খ তো অমনি আস্তানা গেড়েছে সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানি। খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, ও বে।

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। নিজের কামরার একপাশে দু'টি ইট পাতিয়া ঘড়ি ধরিয়া ন পেট ঘণ্টাকাল অঙ্গ চালনা করিয়া বিপিন সযত্ন-রক্ষিত কাঁচের গেলাসের মিশ্রিত বত টুকুতে শুধু চুমুক দিয়াছে অমনি ম্যানেজারের কণ্ঠ নিসৃত উচ্চ ধ্বনি আসিয়া ছিল, বিপিন কৈ—

তাড়াতাড়ি গেলাসটার মুখে কাগজ চাপা দিয়া কাপড়টা যেন তেন করিয়া একটা ড দিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজারের বাম বগলে কি একটা ইংরাজী বাদ পত্র। বিপিনের দর্শন মিলিতেই দাঁত খিঁচাইয়া বিশ্রী সুরে বলিলেন, হা করে য়ে কি দেখছ—ডেকে দাও নুটবিহারী কৈ। প্রকাশ কোথায় ?

প্রকাশ আফিসে ছিল না। নুটু ব্যানার্জ্জী ঘরের ভিতর ওদিকে খোলা জানালা দাঁড়াইয়া কি একটা যন্ত্র বিকল হওয়াতে ঘষিয়া ঘষিয়া সারাইতেছিল। ছুটিয় ম্যানেজার ঘরে ঢুকিলেন। ফস্ করিয়া বাম বগলের কাগজখানি একেবারে নুটবিহার মুখের ওপর বিস্তৃত করিয়া বলিলেন, এসব কি, এসব কি ?

প্রথমটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দুপা পিছাইয়া নুটবিহারী নিতান্ত মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। লাল কালির চিহ্নযুক্ত কাগজের একটি স্থান নির্দেশ করিয়া ম্যানেজা উচ্চৈস্বরে পড়িয়া যাহা শুনাইলেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, ইদানিং তাহাদের নূ প্রতিষ্ঠিত প্রেস হইতে যে দৈনিক কাগজটি বাহির হইতেছে ইহা ছাপার ভুল এবং অস্প অক্ষরে ভর্ত্তি, অবিলম্বে এই ত্রুটি বিচ্যুতি না সারিলে কাগজটির গ্রাহক সংখ্যা ত হ্র পাইবেই উপরন্তু শিশু বয়সেই 'বাংলাদূতের' পটল তুলিতে হইবে, যেহেতু যা কাগজের গ্রাহক হইয়া পয়সা ব্যয় করা এই দুর্দ্দিনে কোন ক্রমেই সমীচিন নয় ইত্যাদি……

পাঠ শেষ করিয়া ম্যানেজার বলিলেন, শুনেছ নুট ব্যানার্জ্জী, তুমি না বড়াই ক একশো লোকের কাজ এক হাতে সারতে পার ? ফল তো এই। কতদিন বলেছি চোখ দুটো নেও সরিয়ে। না না ওসব রাতকানা নিয়ে চলবে না বলে দিচ্ছি।

অবশেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় বিপিনকে লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চ ম্যানেজার বলিয়া গেলেন, প্রকাশকে দেখিও হে কাগজখানা, ও বেটাও কেমন গা ' দিয়েছে। নুটু ব্যানার্জ্জীর ভুলভ্রান্তি নিত্যই ম্যানেজার সহিয়া যান। ধারণা অত বেতনে অমন কর্ম্মঠ, অর্থাৎ গাধার মত খাটিতে পারে, একটি দ্বিতীয় নুটবিহারী পা অসম্ভব। কাজেই আজিকার উক্তিটা হঠাৎ একটু কর্কশ হইয়া পড়িতেই ম্যানে সচেতন হইয়া প্রকাশের ওপর আংশিক দোষ চাপাইয়া গেলেন।

তা হোক, অসময়ে এই ডাকাডাকিতে বিপিন ম্যানেজারের ওপর প্রথম হইয়া শেষে সমস্ত রাগটা ঢালিয়া দিল নুটবিহারী ওপর। ধাঁ করিয়া ছুটিয়া ি একটা ধাক্কা দিয়া বিপিন বলিল, মশায় কাজ নিজে করবেন ভুল, দোষ চাপা অন্যের ঘাড়ে।

নুট ব্যানার্জ্জী আকাশ হইতে পড়িল। একটা ঢোক গিলিয়া সভয়ে ব যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া বলিল, মানে ?

—মানে আবার কি, নিজের আই-ডিফেক্ট্, তার দরুণ প্রুফ্ দেখতে বব একশো ভুল, আর প্রায়শ্চিত্ত করবে বিপিন প্রকাশ। বাপু সাবধানে চলো।

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গট্ গট্ করিয়া বিপিন সরিয়া গেল। তদ্ধ একা দাঁড়াইয়া রহিল নুটবিহারী। ক্রোধে ক্ষোভে এবং অভিমানে বেচারার আটকাইয়া আসিল, না পারিল একটা কথা কহিতে না এক পা অগ্রসর হই সারারাত্রি জাগিয়া অত সতর্কতার সহিত কাজ করিয়াও কেন যে ভুলটা হয় নুটবিহ

বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ওর আই-ডিফেক্ট ? না কোনমতেই এ হইতে পারে না। নুটবিহারী বিশ্বাসই করিতে পারে না অত শীঘ্রই,—সবে ছত্রিশ বৎসর বয়সে দৃষ্টি তাহার কেমন করিয়া রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। উঃ, নুটবিহারী ভাবিতেছিল তাহার যে আরো বাঁচিয়া থাকিতে হইবে—আরও পঞ্চাশ বৎসর, ষাট বৎসর—একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া সে খাটিতেছে। নিজের সতেরো টাকা মাহিনার যথাসাধ্য বাঁচাইয়া ব্যাঙ্কে জমা দিয়া এই ছ'টা মাস সে শুধু ইহারই ভরসা করিয়া আসিতেছে যে, টাকা জমাইয়া সে জর্মেণী কি আমেরিকা যাইয়া জর্নালিজম্ শিক্ষা করিয়া আসিবে। দেশে ফিরিয়া একটা বিরাট খবরের কাগজের আফিস খুলিয়া বসিবে। ঠিক ওই ইংরেজী কাগজ ষ্টেট্সমেনের মত। কলে ছাপা হইবে কাটা যাইবে এবং কলেই ভাঁজ করিবে, প্যাকিং সারিবে—এমনি একটি বৃহৎ কারখানা। কল্পনার বিচিত্র রং-এ নুটবিহারী ভবিষ্যৎটাকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিতেছিল এতদিন। কিন্তু আজ বিপিনটার মুখে আই-ডিফেক্টের কথাটা শুনিয়া নুটবিহারী শিহরিয়া উঠিল। হয়ত ম্যানেজার জবাব দিয়া দিবেন যদি তাহাই হয় ? ভাবতেই যেন খাদে পড়িয়া নুটবিহারীর বুকখানা চুরমার হইয়া যায়। গ্যাসের তীব্র আলোয় রাস্তার ওপাশে টাঙ্গানো বড সাইনবোর্ডে লিখিত সবকয়টা অক্ষর যখন দুই চোখ যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়াও আর পড়া গেল না নুটবিহারী সত্যিই অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল কাল সকালেই ছুটিবে ওই বেলেঘাটার স্পেশালিষ্টের বাড়ি। কয় টাকা খরচ—তা হোক্। রোগের প্রথম হইতেই চিকিৎসা করা ভাল।

এই কথা ভাবিতে যেন এবার নুটবিহারী কিঞ্চিত আশ্বস্ত হইল। এবং ক্রমেই বিপিনের ওপর হইতে রাগটা কেমন আস্তে আস্তে উডিয়া গেল।

শীতটা কয়দিন বেশ কড়া হইয়া পড়িয়াছে বেলা নটা পর্যন্ত কুয়াশার ঘোরই থাকিয়া যায় পরে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যখন চারিদিকটা পরিষ্কার হইয়া নির্ম্মল রৌদ্রে উদ্ভাসিত হইয়া যায় ভারী আরাম বোধ হয়। চেয়ার টানিয়া বারান্দায় যে এককোঁটা রৌদ্র আসিয়া পডিয়াছিল তাহাতেই দুই পা মেলিয়া দিয়া নুটবিহারী বিজ্ঞাপনের একটা নোটিশ লিখিতেছিল। ডান হাতে কলম। কোঁচডের খুঁটায় মুড়ি—তাহাই আদায় নুনে মিশাইয়া বাম হস্তের সাহায্যে কফের প্রকোপ এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছিল। ডাক্তারের আদেশ ; দেহটা রক্ষা করিতে হইবে। অনেক দিন বাঁচিয়া নুট ব্যানার্জ্জীকে বৃহৎ ক্ষেত্রে নামিতে হইবে। আজকাল তাই শরীরের প্রতি যত্নের ক্রটি নাই। নুটবিহারী চশমা লইয়াছে অবশ্য ফ্রেমটা পিতলের। রাত্রে ঘণ্টা দেড়েক ঘুমাইয়া নেয়, সকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল মার্কা একটা সিরাপ-বাসক পর্য্যন্ত আনিয়াছে।

হঠাৎ গলার কম্ফটারটা পশ্চাৎ দিক হইতে কে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। হতভম্ব নুটবিহারী ঘাড বাঁকাইয়া দেখিল কানাই। দারুণ মুখভঙ্গী করিয়া কানাই বলিল, দিন দিন দেখছি ব্যানার্জ্জী মশায়ের মেজাজ গাছ বেয়ে উঠ্ছে—

আকাশে না ঠেকলে হয়। শেষটায় গরীবের এই আড়াই টাকা দামের জুটফ্লানেলের বস্তুটির প্রতি নজর পড়িল!

লজ্জিত হইয়া নুটবিহারী মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল! সাড়া পাইয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল বিপিন।

—কি হে কানাই?

বিপিনের চোখে মুখে উৎকট কৌতুকের ছাপ। তাহার ভীষণ আকৃতিটির ভয়াবহ মূর্ত্তিটা কল্পনা করিতে নুটবিহারীর গলার জল শুকাইয়া গেল।

নুটবিহারীর ছিদ্র। বিপিন বলিল, একটা পয়সা নিজের গাঁট থেকে খস্‌বে না আবার বাবুগিরির সখ—হেঁ হেঁ বাপ্‌ পার ঐ প্রকাশকেই চোখ রাঙ্গাতে, কানাইর কম্ফর্টার গলায় জড়াতে বেটা কৃপণের যক্কি!

অপমানের খোঁচাটা নিত্যিকার মতো আজও নির্ব্বিবাদে নুটবিহারী হজম করিয়া যাইত, ফস্‌ করিয়া মনে পড়িল বয়েস তাহার আজও সাঁইত্রিশে পড়ে নাই। তবে কিসের ভয়—কেন কাপুরুষের মত একটা টাইপিষ্টের কাছে নুটু ব্যানার্জ্জী কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবে?

রোগ দুর্বল দেহটা তুলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল। একরত্তি ডিস্‌পেপসিয়া ভোগা মানুষটির এত বড় ঔদ্ধত্য ব্যায়ামবীর বিপিনের অসহ্য। দু'পা আগাইয়া একটা ধাক্কা মারিতেই নুটবিহারী টেবিল শুদ্ধ উল্টাইয়া মেজেয় গড়াগড়ি। চশমা জোড়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। দোয়াতে কালি-কোঁচড়ের আদা-মুড়ি— কাগজের 'তা' প্রভৃতি চারিদিকে উড়িয়া-ছড়িয়া পড়িয়া একেবারে ছ' ছত্রিশ। পড়িয়া গিয়া ব্যানার্জ্জী আর্তনাদ করিয়া উঠিতেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল বক্সী, প্রকাশ এবং তৎপশ্চাৎ স্বয়ং ম্যানেজার। কয়দিনের ছুটি নিয়া ম্যানেজার কি একটা জরুরি ব্যাপারে এলাহাবাদ রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। চার্জ্জ বুঝাইয়া দিতে আসিয়া সমস্ত দেখিয়া চক্ষুস্থির। বিপিন চালাক ছেলে। ফস করিয়া বলিল, ঘুম পাওয়ায় নুটবিহারী চোখ ঢুলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল ইতিমধ্যে সে আসিয়া ঠেলা দিতেই নুটবিহারী রাগের মাথায় উঠিতে গিয়া টেবিলের কোণে চাদর জড়াইয়া এই অভাবনীয় কাণ্ড।

কানাই ঘাড় ফিরাইয়া মুখে কাপড় দিল।

ম্যানেজার বক্সীকে আদেশ করিল ব্যানার্জ্জীকে ঘরে নিয়া শোয়াইতে। যাইবার সময় বার বার বলিয়া গেলেন যেন আঘাতের জায়গায় একটু টিংচার আইডিন লাগাইয়া দেয়।

প্রকাশ, কানাই, বিপিন সকলেই স্ব স্ব কাজে চলিল।

বিপিনের মিথ্যা কথাটাই এতক্ষণ নুটবিহারীকে আঘাত করিতেছিল বেশী, মাথার আঘাত যদিও সামান্য।

আর ঐ চশমা জোড়া! ফুঁপাইয়া নুটবিহারী এবার কাঁদিয়াই ফেলিল। বক্সী ধরিয়া আস্তে আস্তে ব্যানার্জ্জীকে ঘরে নিয়া বসাইল।

প্রসঙ্গটা এমন করিয়াই নির্বিবাদে চাপা পড়িয়া যায়।

কয়দিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে কাহারও সহিত নুটবিহারীর উচ্চবাচ্য হয় নাই। ম্যানেজার আজ পর্য্যন্ত এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। দুপুর বেলা বিপিন তাহার নির্জন কামরায় বসিয়া প্রকাশের সঙ্গে কি ফিস ফিস পরামর্শ আঁটিল। কানাই এবং বক্সী গিয়াছে ম্যাটিনিতে।

নুটবিহারী তাহার বিছানায় শুইয়া আপন মনে একলা ঘরে গভীর মনোযোগের সহিত একটা জর্ণালিজমের বাংলা তর্জ্জমা পড়িতেছিল, সহসা প্রকাশ আসিয়া দরজায় উঁকি দিল।

একটা উদ্বেগ এবং দুঃখের ছাপ বেশ করিয়া মুখের ওপর মাথাইয়া আস্তে আস্তে আসিয়া প্রকাশ বিছানার একধারে বসিল। শেষে বলিল, ম্যানেজার চিঠি লিখেছেন,—লিখেছেন তোমার নামেই মনে কিছু কোরোনা নুটুভাই—কোলিগ্ ত? তবে শোন পড়ি।

এই বলিয়া প্রকাশ একটা খামের ভিতর ভাঁজকরা কাগজ বাহির করিল। খামের ওপর নুটু ব্যানার্জ্জীর পুরা নাম। তবে দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতার দরুণই বোধকরি ডাকঘরের ছাপ তাহাতে আছে কি না নুটবিহারীর চোখে পড়িল না। মুখে বলিল. পড়ে যাও।

চিঠি খুলিয়া প্রকাশ যাহা পড়িল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি এই যে, কাজের বহুল ক্ষতি হওয়ায় নুটু ব্যানার্জ্জীকে আর রাখিবার ইচ্ছা নাই। একজন এক্সপার্ট হ্যাণ্ড নিয়া আগামী কল্য সন্ধ্যার ট্রেনে ম্যানেজার কলিকাতা পৌছিবে সিট্ যেন ভেকেট্ করিয়া দিয়া নুটবিহারী ইতিমধ্যে অন্যত্র উঠিয়া যায়।

শুনিয়া নুটবিহারীর গোটা দেহটা কেমন অবশ হইয়া গেল চিঠির কাগজ ভাঁজ করিয়া পকেটে পুরিয়া প্রকাশ উঠিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে বলিল, সব ঠিকঠাক করে ফেল—বিছানাপত্র বেঁধে-ছেঁদে—ওকি কাঁদছ কেন? আর কত কাজ আছে সংসারেনুটুদা। আমারই কি আর এই ছাই কাজটা ভাল লাগে—কখোনো না। নাও দুঃখু করো না।

প্রভৃতি বলিতে বলিতে প্রকাশ বাহির হইয়া গেল। সেই একটায় নিঃসাড়ে পড়িয়া থাকিয়া নুটবিহারী দুপুরটা কাটাইল। চোখের ওপর ইতিমধ্যে প্রকাশ আসিয়া নিজেই পরম সুহৃদের মত বিছানা পত্র গুটাইয়া বাঁধা ছাদা শেষ করিয়া চাহিয়া রহিল। না পারিল উঠিয়া বসিতে না শব্দটি করিতে।

সাড়ে-পাঁচটা বাজিয়া যাইতেই একঠোঙ্গা খাবার লইয়া আসিয়া প্রকাশ বলিল. কিছু খেয়ে নেও, তারপর উঠে পড় নুটুদা।

ওদিকে হইতে একটা ঝাঁঝালো গলার আওয়াজ আসিল বিপিনের। বলিতেছিল ম্যানেজার আর্জ্জেন্ট টেলি করেছেন রাত্রি আটটায় পৌছবেন আজই—রুম্‌ও এর আগে খালি করা চাই।

টলিয়া টলিয়া নুটবিহারী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা ঘোড়ার গাড়ী বারান্দার ওদিকে দাঁড়াইয়াছিল। ধরাধরি করিয়া মালপত্রগুলা প্রকাশ নিজেই গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিয়া বলিল, চল নুটুদা আর দেরি নয় পৌনে ছটার ট্রেনের বড আর বাকী নেই।

পাশের মনোহারী দোকানের মোহিত হাঁকিয়া বলিল, নুটুবাবু কোথায় চল্লেন (হঠাৎ ?

বারান্দা হইতে বিপিন একটা ভাঁজ-করা নীল কাগজ দেখাইয়া বলিত ব্যানার্জ্জীমশা'র বোর কলেরা—এই ত বাড়ী থেকে টেলি করেছে।

বিপিনের কথাটা গাড়ীর শব্দে নুটবিহারীর কানে গেল না। প্রকাশ সঙ্গে চলিত আপাততঃ নুটবিহারীকে এই বেকার অবস্থায় দেশের টিকিটই কিনিয়া দিবে নুটবিহারী হা-না কিছুই বলিল না। মাথাটি দরজার একপাশে ঠেকাইয়া গাড়ী এককোণে জড়ের মত পড়িয়া রহিল। ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

সাধক-সন্ন্যাসী সাহিত্যিক তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ১৩০৯ সালের ৬ই ফাল্গুন কোলকাতার জোড়াসাঁকোর প্রখ্যাত মুখোপাধ্যায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম, স্বর্গীয় [illegible] মুখোপাধ্যায়। স্কুল কলেজ / ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে পরিব্রাজক হিসেবে ঘুরেছেন দেশ বিদেশে। গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী [illegible] পরমহংসজি কালীঘাটের মাতৃকাশ্রম প্রণবসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ [illegible] সঙ্গে অনেক স্থান পরিভ্রমণ করেছেন। [illegible] মাতাজীর আশীর্বাদ ও সাহিত্যে প্রেরণা লাভ করেন।

একটি মর্মান্তিক ছবি / তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

প্রায়ই ভেসে উঠত আমার চোখের সামনে। রাতের বেলা তো বটেই, দিনের আলোয় চোখ চেয়েও কখনও কখনও দেখতে পেতুম যেন। এ ছবি আমাকে অস্থির করে তুলত। কেন এমন হয় বুঝে উঠতে পারিনি। ছবি কিন্তু প্রকৃত ছবি নয়, বাস্তব সত্য ঘটনা। তার সঙ্গে জড়িত আমিও একটু।

ঘটনাটা পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের কুয়োকে ঘিরে।

আমার মনে চোখে যখন এই দৃশ্য আনাগোনা করছে বেশি করে বারে বারে, ঠিক সেই সময়ই বন্ধুবর হরিনাথ দে আমাকে আমার অভিজ্ঞতার বিষয়ে লিখতে বিশেষভাবে অনুরোধ করে। যুগান্তরের 'বিশ্বাস করুন আর নাই করুন' কলমে। স্নেহভাজন শ্রীমান বুলবুল মুখার্জিও ওই একই কথা বলে।

ওদের কথায় আমার মন সায় দেয়নি। লেখার ইচ্ছেও করেনি। আমার গুরুদেব পূজনীয় পিতাজী মহারাজকে (শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ) মনের অবস্থা জানাতে তিনি তখুনি লিখতে আদেশ করেন। পিতাজী মহারাজ শ্রদ্ধেয়া শ্রী শ্রী দেবী-শক্তি মাতাজীর কথা স্মরণ করিয়ে দেন—'তোমাকে লিখতে হবেই'।

আমি লিখে যুগান্তর সাময়িকীর তখনকার সহসম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অফিসে গিয়ে দেখা করি। উনি লেখাটি খুব যত্ন করে নেন। তিন চারদিন বাদে রবিবারের যুগান্তরে ছাপার অক্ষরে দেখি আমার লেখা। এটা ১৯৬০ সালের কথা। লেখাটি বহু পাঠক-পাঠিকার মুখে মুখে ঘুরেছিলো অনেকদিন।

স্নেহভাজন শ্রীমান গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষের অনুরোধেই আমার প্রথম লেখার অনুভূতির কথা লিখতে বাধ্য হয়েছি। লেখকদের প্রথম গল্প ও অনুভূতির কথা নিয়ে একটা সংকলন বই কোথাও বেরিয়েছে কিনা অন্তত আমার জানা নেই। এটা তার মহৎ প্রচেষ্টা। প্রত্যেক লেখকের প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ভবিষ্যতের খ্যাতনামাদের অখ্যাতদিনের লেখা পৌঁছে দেওয়া কম আনন্দের কথা নয়। এ ব্যাপারে শ্রীমান গৌরাঙ্গ প্রসাদকে প্রশংসা করতেও একটা দ্বিধা আসে তার কাজ অনেক অনেক প্রশংসার ওপরে। তার সৎ চেষ্টা সার্থক হ'ক।

জমীদ সিংয়ের চোখেমুখে একটা উৎকণ্ঠ-বেদনার ছাপ। তার জমাট বাঁধা চাপা কথা সব উজাড় করে দিতে লাগল। জমীদ সিং বলছে। আমি শুনছি। জমীদ সিং বলছে, ভাবতে পারিনি, এক বছরের ভেতর এরকম অঘটন ঘটে যাবে। একটা অশান্তি ছায়ার মতো পেছু নিয়ে চলেছে। ছাড়বার নাম নেই। সারা জীবনে কখনো ছাড়বে কিনা তাই সন্দেহ!···বিয়ে করলুম বড় ঘরের মেয়ে। বংশের নামডাক খুব। আমাদেরই প্রায় সমান সমান। দেশের আজাদী আনতে ওদের কোন পূর্বপুরুষকে ফাঁসির মঞ্চেও উঠতে হয়েছিল এক সময়। মেয়েটি রূপে গুনে নেহাত কম যায় না।

প্রথমে আমার বিবি আমায় খুব আদর যত্ন করতো। একেবারে অকৃত্রিম। আমাদের দেশে ঘরে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেলো—এমন বৌ নাকি আজ অবধি কারো হয়নি এ গাঁওয়ে। স্ত্রী গর্বের খুশিতে বুক দশ হাত হয়ে উঠতো।

আমি তো বৌয়ের রূপে গুণে হাবুডুবু খেতে লাগলুম। বিয়ের মাস পাঁচেক বেশ সুখে কাটলো। আমি বৌ ছাড়া থাকতে পারিনে, বৌ-ও আমায় ছাড়া অস্থির হয়ে ওঠে। বন্ধু-বান্ধবদের চক্ষুশূল হলুম আমরা দুজনে—আমি আর বিবি।

ব্যবসা ছেড়ে কতদিন আর বাড়ি বসে থাকা যায়? মন না চাইলেও, বাবার তাগিদে আসতে হল অমৃতসরে। জালিয়ানওয়ালাবাগের কাছের বাড়িটা তখন সবেমাত্র কেনা হয়েছে। সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। কাজে মন বসে না। কাজ ছেড়ে মাঝে মাঝে আসতে লাগলুম গাঁওয়ের বাড়িতে। সকলের হাসাহাসি, বিবির লজ্জা লজ্জা ভাব, আমারও তাই। মা সব ব্যাপার দেখে শুনে অগত্যা বিবিকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। মুখে না বললেও, মনে হচ্ছিলো, কতোক্ষণে নিয়ে যাই। যাক্‌, আমরা যুগলে জালিয়ানওয়ালাবাগের বাড়িটায় এসে উঠলুম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

দিন আমাদের বেশ হাসি খুশি গল্প-গুজবে কেটে যেতে লাগলো। দুজনেই আনন্দে ডগমগ। আর তিন চার মাস বাদে বিবি মা হবে। কত নতুন নতুন রঙিন স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলুম আমরা আমাদের ভাবী সন্তানের সুখ সুবিধের জন্যে।

একদিন বিবিকে নিয়ে বাগে বেড়াবো ঠিক হল। সন্ধ্যেবেলা দুজনে চলেছি। বাগের প্রবেশ পথে এসে বিবি চমকে উঠলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। অনুসন্ধিৎসু

দৃষ্টি বিবির। তার চোখ দুটো চৌকিদারের মুখের ওপর আটকে পড়েছে চৌকিদারেরও বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি বিবির ওপর। আমি আবার বিবিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললুম বাগের ভেতরে। কিন্তু বিবির কেমন অন্যমনস্ক ভাব পেছনে চেয়ে দেখি, চৌকিদার একদৃষ্টে লক্ষ্য করছে বিবির গতিপথ। আমার যে কিরকম কিরকম ঠেকলো। চৌকিদারের দিকে কটমট করে তাকালুম। জানিয়ে দিলুম এটা অশোভন। সে বোধহয় লজ্জা পেয়ে চোখ ফেরালো অন্য দিকে বিবিকে জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার বলতো? তুমি অমন হয়ে গেলে কোনো? ওকে কী চেনো?

একটা যে কিছু অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে গেলো চক্ষের নিমেষে, বিবির চাউনিতে কিন্তু সে সব কোন লক্ষণই খুঁজে পাওয়া গেলো না। সহজ ভাবেই জবাব দিল বিবি কই! কী ব্যাপার। কাকে চিনি? কী বলছো কিছু বুঝতে পারছিনে তো।

আমি স্তম্ভিত। আমার চোখকে বিশ্বাস করবো, না করবো না। মনে হল, এ বিবিকে নিয়ে এতদিন ঘর করছি, একি সেই বিবি!

বাগের কুয়োর ধারে আসতে বিবির অস্থিরতা বেড়ে উঠলো। বিবির চনমনে চাউনি চারধারে। রকম সকম দেখে ভাবলুম, আমারই কী নেশা টেশা হল নাকি কিন্তু নেশা তো কখনো করিনি। তবে?

কৌতূহলী মন পেছনে দৃষ্টি ফেরায়। দেখলুম, চৌকিদার অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে গাছেদের আড়ালে রেখে। ওর হাবভাব আমার খুব ভালো লাগলো না আমার মনে একটা সন্দেহের দোলা লাগলো বিবির আর চৌকিদারের চালচলনে—কে জানি বিয়ের আগে, কখনো কী ওদের মন নেওয়া দেওয়ার পালা ছিলো, না এ অমৃতসরে আসবার পর কখন কোন অবসর ফাঁকে প্রণয় পর্ব গড়ে উঠেছে? কিন্তু নিয়ে এখানে কিছু বলাবলি করলে, খানদানির বেইজ্জতি হবে। ফেরাই ভালো বিবিকে বললুম, চল!

কে কার কথা শুনবে! বিবি নির্বিকার! কুয়োর দিকে একভাবে দৃষ্টি। তা কোন ধারে খেয়াল নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতো ভাবছিলুম, ততো বাগ আ কুয়োর কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে পড়ছিলো—স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাক ভারততীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ, বাগের পবিত্র কুয়োর এক সময় ও'ডায়ারের নির্দেশে বুলেট বৃষ্টির তাড়নায় কত নিরীহ মানুষ আত্মবিসর্জন দিয়েছিলো। খানিকটা তন্ময়তা এসে গেছিলো আমার। আ যাও, আ যাও ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলুম। বিবির কণ্ঠ

বিবি কাকে ডাকলো? চৌকিদার একেবারে বিবির পাশে দাঁড়িয়ে। এইস দেখে শুনে ধারণা হল, নিশ্চয়ই বিবি চৌকিদারকেই ডেকেছিল। গজরাতে লাগলু আমার সামনেই এত বড় স্পর্ধা!

অবিশ্যি তার সঙ্গে ইন্ধন জোগাতে লাগলো আরো আরো ঘটনা। একদি বাড়িতে এসে দেখি, বিবি নেই। ওপর নীচে প্রত্যেক ঘর মায় বাথরুম পর্যন্ত একেবা

তোলপাড করেও পাত্তা পেলুম না। শেষে কী মনে হল, ছাদে উঠে পড়লুম। অবাক হয়ে দেখলুম, বিবির নিমেষ নিহত দৃষ্টি বাগের প্রবেশ পথে—যেখানে চৌকিদার।

মনে হল দুটোকে একসঙ্গে শেষ করে দি একেবারে। খানদানির বেইজ্জতি করতে বসেছে এই জানানা। দি ছাদ থেকে নীচে ফেলে ওই চৌকিদারের সামনেই। যাক্, কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে নেমে এলুম।

রাতে নানান উৎকট চিন্তা পেয়ে বসলো। চোখের পাতা থেকে ঘুম পালিয়েছে। চুপ করে চোখ বুজে পড়ে আছি। একটা খসখসানি আওয়াজ হল। ভাবলুম, আবার কী ব্যাপার! দেখলুম বিবি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছু নিলুম, হাতে-নাতে বিবির অভিসারকে ধরে একটা হেস্তনেস্ত কববার জেদ চাপলো।

বিবি সেই নিশুতি রাতে বাগের প্রবেশ পথে এসে থমকে দাঁড়ালো। চৌকিদার তখুনি সেখানে উপস্থিত হল। দুজনে একসঙ্গে ভেতরে চলে গেলো। রাতে বাগে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু চৌকিদারের ওই বে-আইনী কাজের মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। এইটাই আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেলো। রাগে হাত নিশপিশ করে উঠলো। সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় টগবগ করে ফুটতে লাগলো।

আমি গোঁভবে চলেছি ওদেব অনুসবণ করে করে।

কুয়োর ধারে এসে দাঁড়ালো বিবি। পেছনে চৌকিদার। বিবির কণ্ঠ ভেসে আসতে লাগলো—অতিকরুণ—হৃদয়-নিঙরানো আকুতি মেশানো। মনে হল সেখানে কোনো খাদ নেই, কপটতা নেই—একেবারে সরলতায় পূর্ণ 'আ যাও' 'আ যাও' ডাক।

আবেগভরা গলায় চৌকিদারের সহানুভূতি উপচে পড়ছে। সে বলছে—বহিন!

আমার ভাবরাজ্য সব ওলটপালট হতে লাগলো। আমি কেমন হয়ে গেলুম। রাগের মাথায় একটা কষে চড় বসিয়ে দিলুম চৌকিদারের গালে। আশ্চর্য হলুম, চৌকিদারের চোখের কোণায় জলেব ফোঁটা টলমল করে উঠলো। তবু সে কোনো প্রতিবাদ করলে না। খালি তার ভেজা গলায় বললে, বাবুজী। কসুর মাপ কীজীয়ে। মাথা নীচু করে চৌকিদার চলে গেলো। কিন্তু বিবির কান্না আর থামলো না। একভাবেই কেঁদে চললো। চৌকিদারের বিষয় অনেক ঘুরিয়ে ফিবিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কুয়োর কাছে কাকে ডেকেছে সে কথাও। কিন্তু বিবি নিরুত্তর। কিছু জিজ্ঞেস করা মানেই হয়ে দাঁড়ালো তাকে কাঁদানো। নতুন ন্যাকামিতে বিতৃষ্ণায় মন অশান্ত হয়ে উঠতে লাগলো। এই ব্যাপার নিয়ে একটু একটু করে সন্দেহের দানা জমাট বাঁধতে শুরু করে দিল। বললুম, ঘর যাও। জরুর তুমহারে ঘরমে ও একরোজ আয়েঙ্গে।

একটু পরেই বিবেক ফিরে পেলুম আমি। আমার মাথা তখন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে 'বহিন' কথাটা নিয়ে। কী ভুল করলুম আমি না জেনে। অনুশোচনার দংশনে অতিষ্ঠ করে তুললো।

আমি দৌড়ে চৌকিদারের কাছে গেলুম। আমাকে দেখে ভয়ে ভয়ে চৌকিদার সরে যেতে লাগলো। তার হাত ধরে ক্ষমা চাইলুম। বিবির কাছেও। কিন্তু বিবি হয়তো শুনলো না কিছু। একটানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেন কাঁদছে, কাকে ডাকছে ও, চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুম। সে যা বললে, সে এক অতীতের মর্মস্পর্শী কাহিনী।

বারো-তেরো বছর আগে, একবার একটি বছর আটেকের মেয়ে তার ঠাকুমার সঙ্গে বাগে বেড়াতে আসে। ঠাকুমা কুয়োর কাছ বরাবর এসে কান্না চাপতে পারেনা। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। মেয়েটি হকচকিয়ে যায় ঠাকুমার অবস্থা দেখে। ঠাকুমার কান্নার কারণ জানতে চায় সরল প্রাণের শিশু বারে বারে। ঠাকুমা কথার মোড় ঘোরাতে গিয়ে সত্যি ব্যাপারের কতকটা হের-ফের করে বলে, কুয়োর ভেতর তোর ঠাকুর্দা রয়েছে, তাই ডাকছি তাকে। মেয়েটি ঠাকুমার কথাটি মনোযোগ দিয়ে শোনে। তার কণ্ঠে আকুতি ফুটে ওঠে। ঠাকুমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে—ঠাকুর্দা তবু আসছে না কেন? ঠাকুমা উত্তর দেয়, নাতনকে বোঝায়—তুমি ডাকলেই আসবে। মেয়েটি ঠাকুমার একথা বিশ্বাস করে নেয়। ঠাকুমার কান্না থামাতে আর ঠাকুর্দাকে কুয়ো থেকে ডেকে তুলতে কী তার আকুলি বিকুলি। কী আপ্রাণ চেষ্টা অতটুকু মেয়ের।

যারা বাগে ছিলো সেদিন, কেউই চোখের জল চাপতে পারে নি। অতি কষ্টে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিলো।

তারপর সেরকম প্রায়ই ঘটতে লাগল। মেয়েটি প্রায় রোজই আসত। কুয়োর কাছে মুখ নিয়ে একটানা ডাকত, 'আ-যাও। আ-যাও'। সেই একান্ত ডাক শুনে মনে হত সত্যিই বুঝি কেউ কুয়ো থেকে উঠে আসবে।

সে দৃশ্য চৌকিদারের মনে বসে গেছলো। আজ এতদিনেও ভুলতে পারিনি—মেয়েটির সেই সজল-স্বপ্নালু চোখ দুটিকে। তাই প্রথম সেদিন দেখলো এই বহিনকে সে, তখন তার স্মৃতি উথাল-পাথাল করে উঠলো। সে, দেখেছিলো, সেই আট বছরের মেয়ে—অবোধ শিশু, তার সরলতা, তার ঠাকুর্দার জন্যে কাতরতা, ঠাকুমাকে শান্তি দেবার চেষ্টা।

বাবুজী ভুল বুঝে, রেগে গিয়ে আঘাত করেছিলেন। সে বলতে চেয়েছিলো, অতীত কথা—এ মেয়ে সে-ই কি না, কেমন কেমন মনে হচ্ছে যেন তার! কিন্তু সে সুযোগ সে পায়নি মোটেই।

অবসাদ মন নিয়ে, বিবিকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরলুম। তারপর আর কোনোদিন আটকাইনি বিবিকে। আটকালে বিবির অস্বস্তি বাড়ে। সে প্রায় প্রতি রাতে যায় বাগে—সজ্ঞানে নয়, ঘুমন্ত অবস্থায়। তার অন্তরের আহ্বান জানায় কুয়োর অন্তরালদের। চৌকিদার তাকে বোঝায়, বাড়ি ফিরিয়ে দেয়। ওই ভাবেই চলছে এখন।

একটা যন্ত্রণাকাতর দীর্ঘ নিশ্বাস ঝরে পড়ে জমীদ সিংয়ের।

জমীদ সিংয়ের মুখে সব শুনে মনটা আমার ব্যথায় ভরে উঠলো। আগ্রহভরে জানতে চাইলুম তোমার বিবিকে কিছু বুঝিয়ে বলে দেখেছো?

জমীদ সিংয়ের উত্তরে বেরিয়ে আসে হতাশার সুর—ঘটনা ঘটে যাবার পর বিবির কিছু মনে থাকে না। জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে শুধু।

কোনো চিকিৎসা করিয়েছো ?

ডাক্তার বদ্যি-রোজা কিছু বাদ নেই। কিছুতেই কিছু হল না। একটা উদাস মেলে ধরে জমীদ সিং।

জমীদ সিংকে বললুম, মাঝে মাঝে দেখা কোরো ! চিন্তা করে দেখি, কোনো য় পাওয়া যায় যদি। স্তোক-বাক্যই দিলুম তাকে নিরুপায় হয়ে।

মাস তিনেক বাদে জমীদ সিং এসে হাজির।

কী খবর ?

ছেলে হয়েছে, নেমন্তন্ন।

মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। কই এখনো তো মনমরা ভাব যায়নি জমীদ য়র। জিজ্ঞেস করলুম, বিবির শরীর ভালো তো ?

জমীদ সিংয়ের নির্বিকার মুখে নির্লিপ্ত উত্তর—সেই আগেকার মতো।

নেমন্তন্নে গেলুম। অনেক রাত হয়ে গেলো। সে রাতে রয়ে গেলুম ওদের তে। জমীদ সিংয়ের বিবির সঙ্গে পরিচয়ে মুগ্ধ হলুম। সত্যিই এরকম মানুষ চর নজরে পড়ে না। এর সব ইতিহাস জানি বলেই অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লুম। এদের কোনো সাহায্যেই লাগলুম না আমি, বন্ধুর একটুও উপকার করতে লুম না। জমীদ সিংয়ের বিবির কী সারবার কোন উপায়ই নেই ? কেবল এই না ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো। শুনলুম, এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দেশে গেলেও ওই অবস্থা। তবে এখানে রাত্তিরে বাগে আর ওখানে পথে। টানি বেড়ে গেলো। কী করা যায়, কী করা যায়, মাথার মধ্যে ঘুরতে লো।

হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজে ধড়ফড় করে উঠে পড়লুম। জমীদ সিংয়ের বিবি য়ে যাচ্ছে। একটা আচ্ছন্ন ভাব তার। বাচ্চাটা বিছানায় শুয়ে মাঝে মাঝে উঠছে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলুম, যখনই বাচ্চা কাঁদে, তখনই দ সিংয়ের বিবির পা দুটো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার চলা শুরু হয়। র কান্না, আবার থামা। বড় অদ্ভুত ব্যাপার ! অথচ বিবি যে এটা তাব সারে করে চলেছে, তা মনে হল না। কেননা, সে বাচ্চার দিকেও ফিরেও ছ না একবার।

আমার মাথায় চট করে একটা মতলব এসে গেলো। বাচ্চাটাকে হাতিয়ার ল কেমন হয় ? দেখা যাক না একটা চেষ্টা করেই। যেই ভাবা সেই কাজ। দ সিংকে না জানিয়েই একটা কাণ্ড করে বসলুম। আমি একেবারে পড়ি মরি করে কম লাফিয়েই বিবির সামনে এসে হাজির হলুম। তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। হাত দুটো জোরে ঝাঁকুনি দিলুম। একটা ধাক্কা খেয়ে যেন শিউরে উঠলো বিবি। চমক লো। নিশ্চল পাথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। বাচ্চাটাকে তার চোখের নে তুলে ধরে জোরে জোরে বলতে লাগলুম, চেয়ে দেখ দিকিনি ভাবী কে এসেছে ! তুমি রোজ ডাকো, সে-ই কি না ? দেখো ভাবী, দেখো,—তুমি আগে দেখোনি

বিবি চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাচ্চাটার মুখের দিকে অপলক চোখে কি দেখ খানিক। আচমকা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে বাচ্চাটাকে। বুকে নি করে চেপে ধরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। পিছন ফিরতে দেখলুম, দূরে দাঁড়ি জমীদ সিং দেখছে সব। এই ভাবেই বোধহয় তার বিবিকে সে নেপথ্য থেকে রাখতো রোজ।

জমীদ সিং এগিয়ে এলো। আমায় জড়িয়ে ধরলে। তার জলভরা চোখে এ নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির আলো।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

প্রথম গল্প প্রসঙ্গে / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প বলতে 'রসকলি'কেই স্বয়ং রচয়িতা প্রথম গল্প হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে গল্পটি কল্লোল-এ প্রকাশিত হয়।

পরবর্তী কালে ন'টি গল্প নিয়ে সে গল্প-গ্রন্থ সেখানে স্থান পায় এই রসকলি। গ্রন্থটি ১৩৪৫ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হয় এবং সেই গ্রন্থ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন তারাশঙ্কর। 'রসকলি' প্রসঙ্গে স্বয়ং কথাশিল্পী বলেছেন, "রসকলি আমার প্রথম গল্প। রসকলি হাতে লইয়াই সাহিত্য-অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। দশ বৎসর পূর্বে ১৩৩৪ সালের ফাল্গুনের 'কল্লোলে' গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটির প্রতি আমার একটি মমতা আছে। আজ দশ বৎসর পরে কবিগুরুকে উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প লইয়া গল্প বাছিতে বসিয়া বার বার 'রসকলি'র কথা মনে হইল। উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। জীবনের প্রথম রচনা কবিগুরুর হাতে সমর্পণ করিলাম।"

পাল-পুকুরের ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছটার একটা শিকড় বিশাল অজগরের কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে। পুলিন তাহার উপর হাঁটু ভাঙা দয়ের মত উবু হইয়া বসিয়া জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া 'ব্যাং ৄড়ি' খেলিতেছিল , তাহার কাঁধে গামছা, কানে একটা পোড়া বিড়ি।

মিতে বলাই দাস আসিয়া ডাকিল, এই যে পেলা, উঠে আয়, ওরে ও খেপাচণ্ডী, ঠ আয়! খুড়ো যে—

পুলিন হাতের খোলামকুচিটা জলের পরিবর্তে মাটিতে আছড়াইয়া কহিল, 'সেছে বেটা বুড়ো?

বলাই সোৎসাহে কহিল, আর দেরি নাই, উঠে আয়।

উভয়েই গ্রামের পথ ধরিল, বলাই আগে, পুলিন পিছনে।

পুলিন সহসা কহিল, বউটা খুব কাঁদছে, নয় রে বলা?

বলা কহিল, খু-উ-র, আছাড়-বিছেড করছে।

মাথাটা তাহার প্রায় ঘাড়ের নিকটে হেলিয়া পড়িল, ঠোঁট দুইটি চিবুক পর্যন্ত য়া গেল।

আবার উভয়েই নীরব, রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। একটা গাই রাস্তার ধারে চ জমিতে লম্বা দড়িতে বাঁধা, ঘাস খাইতেছিল। জানি না, পুলিন কোন্ কৌতুকে করিয়া বাঁ হাতের দুইটা আঙুলে গাইটার পিঠটা টিপিয়া ঘড়-ড-ঘোঁৎ-শব্দে নাসিকা করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গাইটাও মাথা নাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

পুলিন সলজ্জে হাত দুই সরিয়া আসিয়া কহিল, মাইরি, কি ত্যাজ রে! আমার ও ঠিক এমনই, মাথা নেড়েই আছে।

পুলিন চন্দ্রের এক দেহশ্রী ভিন্ন আর কিছুই প্রশংসা করিবার মত ছিল না।

তাহার দেহখানি সুন্দর. দীর্ঘ আকার, সবল দেহ, বর্ণ গৌর, কোঁকড়া চুল, আর বেড়িয়া বেশ একটি মিষ্টি লাবণ্য। এ ছাড়া আর কোন গুণই ছিল না। বুদ্ধির তো কোন কালেই নাই, বাল্যকালেই পাঠশালায় গুরুমহাশয়, 'এক পয়সায় আম, তা তিনটি আমের কত দাম' ঝাড়া তিনটি ঘণ্টাতেও বুঝাইতে না পারিয়া

নিজেই তাহার বই পত্তর গুছাইয়া বগলে পুরিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন, বাবা শুভঙ্কর, এ জন্মে বৈরাগী-কুলে জন্ম নিয়ে হিসেবে পর্যন্ত বৈরাগ্য করেছেন, তা জানতাম না তোমায় পড়ানো আমার কর্ম নয়।

ইহার উপর সে ছিল যেন মূর্তিমান বে-তাল।

মজলিসে হয়ত লঙ্কাকাণ্ডের মত ভীষণ গম্ভীর আলোচনা চলিতেছে, বুড়া জাম্ববা হয়তো যন্ত্রণা দিতেছে, মজলিসসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ, সহসা সেখানে পুলিনচন্দ্র যে কৌতুকের কাতুকুতুতে গুলগুল করিয়া হাসিয়া উঠে—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, এ মাইরি আমা খুড়োকে লিখেছে, তেমুণ্ডে বুড়ো—ইয়া চুল, ইয়া দাড়ি, ঠিক ঠিক, জাম্ববান জাম্ববান—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

আবার হয়তো হনু-ভানুর মিতালির রঙ্গে মজলিস তো মজলিস, দেবগণ পর্য হাসিয়া আকুল, সেখানে পুলিন বিস্ময়ে হতবাক, চক্ষু দুইটা ছানাবড়ার মত বিস্ফারি পাশের লোককে বলে, কি মাইরি যে হাসিস, তার ঠিক নেই। তারপর সোৎসা বাহবা দেয়, বলিহারি বাপ্ হনু, বাবুদের প্যায়দার চেয়েও তুমি জিন্দে পালোয়ান।

গ্রন্থকারও বাদ যান না, পুলিন কহে, বইটার কিন্তু ভারি চহট মাইরি, একেবারে অবাক-জলপান লাগিয়ে দিয়েছে!

আবার রাবণ-বধে সীতা উদ্ধারে আনন্দিত শ্রোতৃমণ্ডলী আবেগে জয়ধ্বনি করি উঠে। বিচিত্র পুলিন, বিচিত্র তাহার রসবোধ, সে সজল চক্ষে বলে, আহা-হা, এতগু বেধবা হ'ল, আহা-হা!

আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র অনুসন্ধানে কহে, আচ্ছা, লঙ্কায় তা হ'লে মাছের সে কত ক'রে হ'ল? এক পয়সা, না দু পয়সা?—তা লেখে নাই?

লোকে তাই বুদ্ধিহীনের উপর রং চড়াইয়া কহে, ক্ষ্যাপা।

পুলিন রাগে না, হাস্যমুখে উত্তর দেয়, এ্যাঁ।

রাগে একজন, আর লজ্জায় দুঃখে মরিয়া যায় আর একজন। দুই জা প্রথমটি পুলিনের স্ত্রী, বয়স আঠারো-উনিশ, গোলগাল আঁটসাঁট দেহ, নাম গোপিনী

কিন্তু পুলিন কহে, সাপিনী। পুলিশের নিবু'দ্ধিতার লজ্জায়, খোঁচায় গোপি রাগে সাপিনীর মতই গর্জায়; কথাগুলিও বাহির হয় সাপিনীর জিহ্বার মতই, লকল তীক্ষ্ণ ভয়াবহ। নির্বোধ, সর্বজনের হাস্যাস্পদ স্বামীর ঘরে শত লজ্জার মধ্যেও সান্ত্ব একটি আশ্রয় গোপিনীর মিলিয়াছিল, সে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, যে পুলিনের জন্য লজ্জ দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিত; সে পুলিনের বৃদ্ধ খুড়ো রামদাস মোহান্ত, যাহার স পুলিন জাম্ববানের সাদৃশ্য দেখিতে পায়।

রামদাসের অবস্থা বেশ ভালই, মোটা জোতজমা, উঠানে বড় বড় মরাই, দুগ্ধবতী গাভী, গ্রামে দু-দশ টাকার তেজারতি।

তবে তাহার চেহারাটা আজ শুধু চুল দাড়ির জন্যই নয়, চিরকালই কেমন বে বিশ্রী; তাই যৌবনে যখন সে শ্রীমতীকে লইয়া পরম আগ্রহে সংসার পাতিয়াছিল, শ্রীমতী রামদাসের ওই বদ চেহারার জন্যই নাকি তাহার পাতানো সংসারে মারিয়া কোথায় একদিন উধাও হইয়া গিয়াছিল।

গৃহী-বৈরাগীর বংশধর রামদাস শ্রীমতীর সন্ধানে হরেক রকম তালি দেওয়া
ালখাল্লা পরিয়া ঝোলা কাঁধে ভবঘুরে ভিখারী বৈরাগী সাজিল, শোকে সংসারকে
াড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু সংসার তাহাকে ছাড়িল না!

শ্রীমতীর সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে কোন্ দিন শ্রী
াসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংসারের দিকে ফিরাইল, অমন ভিক্ষার সঞ্চয়েই তাহার
নশো টাকার পুঁজি, আর বাড়ির জোতজমার ধান ঠিকদার-ভাগদারের কাছে বেশ
াটা হইয়াই জমিয়াছিল। শ্রীমতীর অভাবে রামদাস শ্রীকে লইয়া বেশ আঁটালো
বিয়া সংসার বাঁধিল।

পাঁচজনে কহিল, মোহান্ত, এইবার ভাল ক'রে সংসার পাত, একটি ভাল দেখে
 ষ্টমী।

রামদাস কহিল, রাধে রাধে, ও কথা ছাড়ান দাও দাদা। রাধারাণী আমার
নেই ভাল, ধ্যানেই সোজা, বাইরে বেজায় বাঁকা। বাঁকা রায়ের লাঞ্ছনাটাই দেখ
। জয় রাধে, শ্রীমতী শ্রীমতী!

কে একজন স্ত্রী-জাতির কি একটা নিন্দা করিল, মোহান্ত মাথা নাড়িয়া জিভ
াটিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল, জয় রাধে, ও কথা বল না, বলতে নাই। শ্রীমতীর জাত,
রা সবাই ভাল।

একজনে ঠোঁটকাটা কঠোর রসিকতা করিয়া ফেলিল, তা তোমার শ্রীমতী—

মোহান্ত হাসিয়া কহিল, বললাম যে দাদা, শ্রীমতীর জাত ওরা, সুন্দর নিয়েই যে
বেবার ওদের। অসুন্দরকে কে কবে পছন্দ করে দাদা?

এই সময়ে রামদাসের বড় ভাই শ্যামদাস বছর আষ্টেকের ফুটফুটে মাতৃহীন
ালনকে রাখিয়া মারা গেল। রামদাস পুলিনকে বুকে করিয়া 'না বিইয়াই শ্যামের
া' হইয়া উঠিল।

সুন্দর পুলিন বড় হইল। বৈষ্ণবের ছেলে, কীর্তনের আখড়ায় খোল করতাল
া'ড়য়া লাঠির আখড়ায় লাঠি ধরিতে শিখিল। বলা সঙ্গী হইল, গাঁজা ধরিল। রামদাস
াসন করিতে পারিল না, শুধু দুঃখই করিল, তবু মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া
ইল, বেশ একটি গোছালো বউ আসিলেই পুলিন মানুষ হইবে, বোকা বুদ্ধিমান হইবে,
র বুঝিবে, না বুঝে ঘর ঘাড়ে চাপিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

রামদাস পুলিনের জন্য পাত্রী খুঁজিতে লাগিল।

সৌরভী বৈষ্ণবী আসিয়া কহিল, মোহান্ত, তা আমার মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের
বিয়ে দাও না কেন? ছেলেবেলার সাথী দুটি, ভাবও খুব—

রামদাস কহিল, রাধে রাধে, তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত-বোষ্টম,
আর তোমরা ভেকধারী।

সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। তাহার মেয়ের
সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রামদাসের রুচি হইল না। না হইলে সৌরভীর মেয়ে
মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, বেশ নজরে-ধরা মেয়ে। তবে একটু রসোচ্ছলা, যাকে বলে 'ডগমগ'
ভাব, সেই ভাবে সে চঞ্চল। চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়। কথা

বলিতে হাসি উপচিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহা কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতেও বন্ধ হয় না।

মঞ্জরী পুলিনের চেয়ে বছর চারেকের ছোট, বাল্যসাথী, দুইজনেব ভাবও খুব পুলিন সময় অসময়ে মঞ্জরীদের বাড়ি যায়, মঞ্জরী সাদরে অভ্যর্থনা করে, মুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, রসোচ্ছলা আরও উচ্ছল হইয়া উঠে।

পুলিন বলে, কি হে রসকলি, করছ কি?

দুইজনে 'রসকলি' পাতাইয়াছে।

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া সুরে বলে—

"তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন করে।"

পুলিন এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না।

অভাব-অভিযোগে কত দিন মঞ্জরীর মা সৌরভী আসিয়া কহে, দেখ্ লো মঞ্জরী দুটো টাকা কারু কাছে পাওয়া যায় কিনা, নইলে তোর খাড়ুটা বাঁধা দিতে হবে।

মঞ্জরী বলে, খাড়ু আমি বাঁধা দেব না রসকলি। তুমি টাকা এনে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলে, সে কি রসকলির মা, খাড়ু বাঁধা দেবে কি? আমি টাকা এনে দিই।

সৌরভী আপত্তি করিলে মঞ্জরী কহে, কেন, রসকলি কি আমার পর?

খুড়ার তহবিল সন্ধান করিয়া না পাইলে চাউল বিক্রয় করিয়া সে টাকা আনিয়া দেয়।

আবার মঞ্জরী কখনও কখনও পুলিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, না তুমি দিতে পাবে না, ও মায়ের চালাকি।

মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া হয়, পুলিন ব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু মঞ্জরী কহে, খবরদার আমি করব।

দশ বছর বয়সেই মঞ্জরীর একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু পাত্রটিকে মঞ্জরী পছন্দ হয় নাই, তাই তাহাকে নাকচ করিয়া দিয়াছে। সে বেচারী বহুবার মঞ্জরীর জন্য হাঁটাহাটি করিয়া শেষে অন্যত্র বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। মঞ্জরীকে ছাড়পত্র করিয়াছে।

নানা কারণে রামদাস সৌরভীকে প্রত্যাখ্যান করিল।

রামদাস সৌরভীকে ফিরাইয়া দিল, সৌরভীও ঘরে গিয়া পুলিনকে ফিরাইয়া দিল, কহিল, বাবা, মেয়ের আমার সোমত্ত বয়েস, তুমি আর এস না। একেই লোকে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। মনে ভেবেছিলাম, তোমার দুটি ছেলে বয়সের সাথী, দু'হাত এক করে দিয়ে দেখে চোখ জুড়োব, তোমার কাকা তা দেবে না। আমাকে তো আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে!

কথাটা পুলিনের বড় বাজিল, সে দুই দিন খাইল না. শুইল না, মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল।

রামদাস শেষে রাজী হইল, বেশ, মঞ্জরীর সঙ্গেই পুলিনের বিবাহ হোক্।

সময়টা হোলির, রামদাস শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে। তাই স্থির হইল যে, রামদাস রিলে বিবাহ হইবে।

কিন্তু উপর ওয়ালার অভিপ্রায় অন্যরূপ।

শ্রীধামে সহসা একদিন রামদাসের সঙ্গে হারানো শ্রীমতীর দেখা হইয়া গেল। মতী তখন গাছতলায় কলেরায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, পাশে বারো-তেরো বছরের মেয়ে াপিনী বসিয়া বসিয়া অঝোর-ঝরে কাঁদিতেছিল।

স্ত্রীলোকটির কাতরানিতে আর বালিকটির কান্নায় দয়াপরবশ হইয়া রামদাস হায্যে অগ্রসর হইয়া রোগিণীর পাশে বসিল, ক্ষণেক তাহার মুখপানে চাহিয়া সাগ্রহে কিল, শ্রীমতী!

রোগযন্ত্রণায় কাতর শ্রীমতী রামদাসের মুখপানে চাহিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ঠল, রামদাস উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। শ্রীমতী তাহার পা দুইটা িয়া ধরিয়া কহিল, আমার যাবার সময় পায়ের ধুলো দাও। আর এই মেয়েটাকে ও। বড ভাল মেয়ে, মায়ের মত নয়, পারতো পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিও। ভয় ই, অজাতের মেয়ে নয়। সেই যে, বাউল প্রেমদাসকে মনে পড়ে, সেও জাত-বোষ্টম, রই মেয়ে।

রামদাস কাতর কণ্ঠে কহিল, শ্রীমতী, রাধারাণী, আমি যে তোমার তরে আজও না ঘর বেঁধে ব'সে আছি।

শ্রীমতী সে কথার কোন উত্তর দিল না, শুধু কন্যা গোপিনীকে কহিল, মা এই তোর প, এঁর সঙ্গে যা, আমার চেয়েও আদরে রাখবে। আর একটা কথা গোপিনী, নও যেন স্বামী ছাড়িস নি, তুই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।

শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে বিসর্জন দিয়া গোপিনীকে লইয়া রামদাস বাড়ি ফিরিল।

সৌরভীকে ডাকিয়া পঞ্চাশ, একশো, শেষে দুইশোটি টাকা হাতে দিয়া বলিল ীরভী, আমায় বাকি্য থেকে খালাস দাও।

একমুঠা টাকা খুঁটে বাঁধিয়া সৌরভী হাসি মুখেই বাড়ি ফিরিল।

সৌরভী মঞ্জরীর জন্যে পাত্র ঠিক করিল, কিন্তু মঞ্জরী কহিল, না।

মা শেষে রাগ করিয়া রামদাসের টাকা লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল।

মঞ্জরী দুইদিন কাঁদিল, তারপর আবার উঠিল, ক্রমে হাসিল, রসকলি কাটিল, ন্তু বিবাহ করিল না।

এদিকে পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন যেন মঞ্জরীর নেশা ল। সে দিন-রাত্রি ঘরেই থাকে, বাড়ির বাহির হয় না, দেখিয়া রামদাস সুখে সিল। মঞ্জরী দুই-চারি দিন পুলিনের অপেক্ষা করিয়া শেষে একদিন চূড়া করিয়া চুল বিয়া, নাকে রসকলি কাটিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে রামদাসের বাড়িতে আসিয়া ঠল। রামদাস তখন বাড়িতে ছিল না; উঠানে দাঁড়াইয়া মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া ঘরের দ্বারকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিল, কই হে রসকলি, বউ দেখাও হে।

পুলিন ঘরের ভিতর গোপিনীর সহিত কথা কহিতেছিল, মঞ্জরীর আওয়াজ পাই অন্য দুয়ার দিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গোপিনী নতমুখে ঘরের মধ্যে দাঁড়াই রহিল। মঞ্জরী ঘরে ঢুকিয়া গোপিনীর ঘোমটা তুলিয়া দেখিয়া ঠোঁটের আগায় ি কাটিয়া কহিল, তুমি বউ?

গোপিনী মুখ তুলিয়া চাহিল।

মঞ্জরী আবার কহিল, তা হ্যাঁ বউ, রসকলির তোমাকে পছন্দ হয়েছে?

গোপিনী এবার কথা কহিল, যেন চিমটি কাটিয়া কহিল, না।

মঞ্জরী বলিল, বাঃ, এই যে পাখী পড়ে বেশ! তা হ্যাঁ বউ, কেন পছন্দ হয় কিছু জেনেছ?

গোপিনী সেই চিমটি কাটার মতই কহিল, রসকলি কাটতে জানি না কি তাই।

মঞ্জরী সব বুঝিল, এবার সে হাসিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়া কহিল, মা, তাই নাকি? তা আমার কাছে রসকলি কাটা শিখবে বউ?

গোপিনী কহিল, শেখাবে? দেখো, ঠিক তোমার মতনটি হওয়া চাই।

মঞ্জরী কহিল, তাই শেখাব। কিন্তু ধৈরয ধ'রে থাকা চাই। পারবে তো?

গোপিনী কহিল, পারব, কিন্তু তোমার সময় হবে তো? বলি, আসবে কখ রসময়রা ছাড়বে তো?

মঞ্জরী এবার ঠেকার দিয়া কহিল, আমার রসময়রা নয় অসময়ে এসে সময় দে তোমার রসময় যে এক-দণ্ড ছাড়ে না দেখি।

গোপিনী কহিল, ও দুদিন, এখন নতুন নতুন নালতের শাক হে। তারপর বু গরু ঠিক দামে গিয়ে পড়বে, ভয় নাই।

মঞ্জরী একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, তা ভাই, বুড়ো গরু বেঁধে রাখলেই হয়! দড়ি নাই, তার আবার গরু পোষার শখ কেন?

গোপিনীও এবার একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, ঘোড়া হ'লে কি চাবুকের অভাব হে, তা হয় না। যখন গরু পুষেছি তখন দড়ি কি না জুটবে? বলি, পরনের কাপ আঁচল তো আছে, তাতেই বাঁধব।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল, যদি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়?

গোপিনী কহিল, ইস, সাধ্যি কি!

মঞ্জরী কহিল, দেখো।

গোপিনী সেই দম্ভভরেই কহিল, তখন না হয় ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়ে ঝুলব তা ব'লে জ্যান্তে তো আর ভাগাড়ে দিতে পারি না!

ইহার পর মঞ্জরী আর কথা কহিল না, আচমকাই যেন ফিরিল, তখন মুখখান হাসি ছিল না, যেন থমথমে জলভরা মেঘ।

পরদিন হইতে রসকলির বাড়িতে পুলিনের আদর যেন বাড়িয়া গেল। লে পাঠাইয়া পুলিনকে আনাইল, তাহার লজ্জা ভাঙিয়া দিল। এখন আর পুলিনের গাঁ

আড্ডায় মঞ্জরী ঝঙ্কার দেয় না। সঙ্গী বলাকে দেখিয়া বিরক্ত হয় না। এখন কথায় কথায় মঞ্জরী যেন ঢলিয়া পড়ে। পান দেয়। পুলিন আবার বাড়ি ছাড়িল, পূর্বের চেয়ে যেন বেশী শক্ত করিয়া মঞ্জরীর বাড়িতে আড্ডা গড়িল।

মঞ্জরী মাঝে মাঝে আবার এও বলে, রসকলি, এ তো ভাল কাজ হচ্ছে না।

পুলিন হোঁতকার মত কহে, কি ?

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া বলে, এই— আমার বাড়িতে এমন ক'রে চব্বিশ ঘন্টা প'ড়ে থাকা !

পুলিন তেমনই ভাবেই বলে, কেন ?

মঞ্জরী সুর করিয়া গান ধরে—

"পাঁচ সিকের বোষ্টুমী তোমার,
ওহে গোসা করেছে, গোসা করেছে।"

পুলিন কহে, ধ্যেৎ।

গোপিনী সত্য সত্যই রাগ করিল, কিন্তু ভাঙায় কে ? যাহার উপর মান, সে-ই-যে মানের মুখে ছাই দিয়া দিল। সে খাবার সময় আসে, দুইটা খায়, দেশের দশের হাস্যাস্পদ হইয়া ফেরে, মঞ্জরীর বাড়ি আড্ডা জমায়. ঘরের পয়সা পর্যন্ত মঞ্জরীর ঘরে তুলিয়া দিয়া আসে। মঞ্জরীর নাকি সোনার নথ হইতেছে, গোপিনী জ্বালিয়া গেল। পুলিন যা দুই চারটি কথা গোপিনীর সহিত কয়, তা পর্যন্ত মঞ্জরী-বিশোভিত। সেদিন রাত্রে কথায় কথায় নির্বোধ কহিল, রসকলি তোমার কি নাম দিয়েছে জান গা ? গোপিনী নয়, সাপিনী। তা সত্যি, সবেতেই তোমার ফোঁস।

গোপিনী একটা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া ছুটিয়া পলাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাহিরে কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল, যদি আঁচল ছেঁড়ে, তবে ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়া ঝুলিবে। উদভ্রান্ত ব্যথাহত নারী সত্যই আঁচল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইতে বসিল। ঘরে পুলিন তখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, বুঝি বা রসকলিকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ মোহান্ত বাহির হইল, শ্বেতবস্ত্রা গোপিনীকে দেখিয়া চমকিয়া কহিল, কে ? কে ? এ কি মা ? বাইরে কেন, মা আমার ?

গোপিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধের স্নেহস্পর্শে তাহার হাতের পাকানো আঁচল এলাইয়া খুলিয়া গেল।

মোহান্ত গোপিনীকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া কহিল, মা, বুড়ো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ধৈর্য ধর, মা আমার, আমি আশীর্বাদ করছি—ভাল হবে, ভাল হবে তোর।

পুলিনের ব্যবহারে শান্ত স্নেহ-দুর্বল বৃদ্ধ মরমে মরিয়া গেল। কঠোর হইতে চেষ্টা করিল, পয়সার টান দিল, কথা বন্ধ করিল, কিন্তু তবুও যে পুলিন সেই পলিনই রহিয়া গেল। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন !

শুধু রসকলির বাড়িতে বসিয়া বলার সহিত খুড়ার আয়ুর দিন গণনা করিতে লাগিল।

রামদাস কিন্তু বাঁচিতে চাহিয়াছিল, মরমে মরিয়াও গোপিনীর জন্যে বাঁচিতে চাহিত। সর্বদা তাহার ভাবনা হইত, সে মরিলে গোপিনীর দশা কি হইবে?

কিন্তু মানুষ অমর নয়, মরণের পরোয়ানা সঙ্গে লইয়াই জন্ম লওয়া। সহসা একদিন রামদাসের তলব আসিল। মোহান্তের বয়স হইয়াছিল, হাঁপানি ছিল, হঠাৎ একদিন হাঁপানি মৃত্যুর মূর্তিতে বুকে চাপিয়া বসিল।

গোপিনী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেবা করিতে বসিল। পাড়াপড়শী আসিয়া জমিল। মোহান্ত যেন কার অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু সে তখন পাল-পুকুরের ঘাটে বসিয়া 'ব্যাং ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল।

পাড়াপড়শী ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে, কেহ বলে, মোহান্ত, হরি বল, বল—জয় রাধারাণী!

রাধারাণীর জয়গানে চিরমুখরকণ্ঠ চারণ কিন্তু আজ এ সময়ে রাধারাণীর ধ্যান করিতে পারিল না। মৃগমায়াচ্ছন্ন রাজা ভরতের মত শুধু বলিল, মা গোপিনী, কিছু করতে পারলাম না মা।

গোপিনী শেষে আছাড় খাইয়া পড়িল। হায়, তাহার নীড় যে ভাঙিয়া যায়: ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গিনীর ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় কি? পাড়ার মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু কেহ এই গোপিনীকে ধরিতে সাহস করিল না। বুড়া রোগী, কখন শেষ নিঃশ্বাস পড়িবে, খাবি খাইয়া মরিবার নোটিসও হয়তো দিবে না। মড়া ছুঁইয়া কে অশুচি হইবে!

ধরিল শেষে একজন। সে মঞ্জরী।

মঞ্জরী আসিয়াই শোকবিহ্বলা গোপিনীকে ধরিল। কহিল, ভয় কি?

মুমূর্ষু মোহান্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল, গ্রামের পাঁচজন আছেন, আমার শেষ ইচ্ছা বলে যাই।...আমার স্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল গোপিনী, আর সকলের কাছে এই ভিক্ষে, ছেলেটাকে যেন ওই বেশ্যের হাত হতে বাঁচিও!

কথাটায় সকলের চক্ষু গিয়া পড়িল মঞ্জরীর উপর। সকলেই ভাবিতেছিল, সে কি করিয়া বসে, সে কি করিয়া বসে! কিন্তু মঞ্জরী গোপিনীর এলানো দেহখানি পরম সান্ত্বনাভরে জড়াইয়া বসিয়া ছিল। বসিয়াই রহিল, চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

মোহান্ত যখন কথাটা আরম্ভ করে, তখনই বলার সঙ্গে পুলিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেও কথাটা শুনিল।

কথাটা আজ তাহাকে প্রথম আঘাত দিল, মান-অপমানের স্বাদ আজ বুঝি সে প্রথম বুঝিল।

লোকে তখন মোহান্তের শেষ ইচ্ছার সমালোচনায় ব্যস্ত। পুলিন দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল, কেহ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু মঞ্জরী ডাকিল, যাচ্ছ কোথা?

পুলিন কহিল, আর এ বাড়িতে নয়।

মঞ্জরী কহিল, ছি, এই কি রাগের সময়? এস, খুড়োর মুখে জল দাও, কানে নাম শোনাও।

পাড়াসুদ্ধ লোক এই বেহায়া মেয়েটার সীমাহীন নির্লজ্জতায় অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মেয়ের' গালে হাত দিল। পুলিনও মঞ্জরীর মুখপানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে খুড়ার শিয়রে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিল, ডাকিয়া কহিল, বল কাকা জয় রাধাবাণী !

বৃদ্ধ কহিল, জয় রাধারাণী ' দয়া কর মা. অনথিনী দুঃখিনীকে দয়া কর মা !

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রামদাস মরিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে রাত্রি এক হইয়া গেল।

তখন মঞ্জরী গোপিনীকে কহিল তবে আমি আমি।

গোপিনী বলিল, এস।

মঞ্জরী চারিদিক চাইয়া সরল ভাবেই কহিল, কত্তা কই ? একা থাকতে ভয় করবে না তো ?

গোপিনীর মনে হইল, মঞ্জরী বুঝি তাহাকে ঠাট্টা করিল। সে উত্তর করিল, আসা যাওয়াই যখন একা, তখন একা থাকতে ভয় করলে চলবে কেন ? আর একাই তো থাকা এক রকম।

মঞ্জরী কথাটা গায়ে না লইয়া কহিল, আমি কিন্তু ভাই একা থাকতে পারতাম না।

গোপিনী কহিল, আমি হ'লে একা থাকতে যদি না পারতাম, গলায় দাড়ি দতাম, তবু—

মঞ্জরী এবার একটু ঝাঁপিয়ে উত্তর দিল, বালাই ষাট মরব কেন ? আসি ভাই কিন্তু রসকলি গেল কোথা ?

গোপিনী ক্ষিপ্তের মত কহিল, রসকলি নাকেই আছে, ঘরে গিয়ে আয়না নিয়ে দেখ, পোড়া মুখের ওপরেই ঝলমল করছে।

মঞ্জরী এই আকস্মিক আঘাতে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। বহু কষ্টে আত্ম-স্বরণ করিয়াও কিন্তু শেষটা উত্তরের বেলায় বলিয়া ফেলিল, রসকলি তো নিজের নাকেই থাকে বউ, এ যে কেড়ে নেওয়া যায় না ! তা তুমি যদি চাও তো না হয় দেবার চেষ্টা করি।

গোপিনী ফোঁস করিয়া বলিয়া দিল, কি বললে তুমি ? তোমার কাছ থেকে ভক্ষে আমি চাই নে। যাও তুমি, যাও।

কথাগুলি ক্রুদ্ধ এক-নিশ্বাসে বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া মঞ্জরীর মুখের উপরেই দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিল, বুকের ভিতর তাহার যেন আগুন জ্বলিতেছিল। গোপিনীর এত বিষ ! আপনার বিষে হতভাগিনী আপনি জর্জর হইয়া মরুক।

আপন বাড়ি ঢুকিতেই মঞ্জরী দেখিল, পুলিন তাহার দাওয়ার উপর বসিয়া।

মঞ্জরীর দেহ ব্যাপিয়া একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

পুলিন উঠিয়া কহিল, রসকলি !

মঞ্জরী হাসিয়া উত্তর দিল, ব'স, বলি।

পুলিন বসিল।

ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে মঞ্জরী বলিল, রসকলি, তুমি ভাই সোনাকপালে পুরুষ। স্ত্রীভাগ্যে ধন।

পুলিন খুব রাগিয়াই কহিল, ও ধন আমার ভাদ্দর-বউ, ছুঁতে পাপ।

মঞ্জরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, আর বউটি ? কি গো, চুপ ক'রে রইলে যে ? উত্তর দিতে পারলে না ? আচ্ছা, আমিই ব'লে দিই, সে তোমার গলার মালা, ঠোঁটের হাসি।

পুলিন কহিল, না রসকলি, হ'ল না, সে আমার গলায় ফাঁসি। ঠাট্টা নয় রসকলি, একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি, আমি কাল থেকে নিজের বাড়িতে যাব। ও বাড়িতে আর থাকব না।

নিজের বাড়ি অর্থে পুলিনের পৈতৃক বাড়ি। বাস্তব চক্ষে বাড়িটি একটি মূর্তিমন্ত বিভীষিকা, কিন্তু কল্পনায় বাড়িটি বেশ, অর্থাৎ উঠান-ভরা বনফুল, প্রাচীর ভাঙিয়া সীমা অসীমে মিশিয়াছে, ঘরের ভিতরেও চাঁদের আলো খেলে।

মঞ্জরী কহিল, বেশ, তা ভাল, তারপর খাবে কি করে ?

পুলিন চট করিয়াই কহিল, বোষ্টমের ছেলে, ভিক্ষে ক'রে খাব।

মঞ্জরী কহিল, আরও ভাল ; কিন্তু ভিক্ষেতে মেলে তো চাল, তা রাঁধবে কে ? বউকে নিয়ে যাও।

পুলিন প্রবল প্রতিবাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

মঞ্জরী কহিল, কেন ? আর তুমি 'না' বললেও সে যদি না ছাড়ে ?

পুলিন কহিল, ছাড়বে না ? মারের চোটে ভূত ছাড়ে, তা জান ? হুঁ হুঁ। কথায় আছে, 'পড়লে পরে দুধ্ ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতু'।

মঞ্জরী কহিল, বেশ। রসকলি আমার বলে ভাল, এ যেন সেই, 'ওপারেতে ধান পেকেছে লম্বা লম্বা শীষ, টুকুস ক'রে ম'রে গেল লঙ্কার রাবণ'। তা যেন হ'ল, আজ রাত্রের মত তো বাড়ি যাও।

পুলিন বলিল, না, আর নয়।

মঞ্জরী পরিহাস-চ্ছলেই কহিল, তবে আজ রাতটা পাল পুকুরের বটগাছেই কাটাবে নাকি ?

পুলিন কহিল, না, তোমার দাওয়াতেই প'ড়ে থাকব।

মঞ্জরী হাসিল, দুই আর দুইয়ে চার হয়—এ কথাটা যে বুঝে না, সে চারের গুরুত্ব না বুঝিলে তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি ?

তবু সে বলিল, লোকে বলবে কি ?

পুলিন বাহির-দরজার দিকে ফিরিল।

মঞ্জরী কহিল, যাও কোথা।

পুলিন কহিল, দেখি, কোথাও—

মঞ্জরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, যেতে হবে না, এস, শোবে এস—

পুলিন ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, লোকে বলবে কি ?

মঞ্জরী কহিল, যা বলবার তারা তো ব'লেই নিয়েছে, আবার বলবে কি ? শোন নি, আজই তোমার কাকা বললে ওই—

পুলিন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার পায়ে ধরি রসকলি, ছি, ও কথা তুমি ব'ল না।

মঞ্জরী হাসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।'

পুলিন তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, স্পর্শে তাহার সে কি উত্তাপ। মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্ত মধুর কণ্ঠে কহিল, ছাড়, বিছানা করি।

তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আল্পনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত, দেওয়ালে খান-কয়েক পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল মিলন, সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তাপোশ একদিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো।

তক্তাপোশের উপর গুটানো বিছানা বিছাইয়া দিয়া একটি ছোট চৌকির উপর রক্ষিত তোলা বিছানার গাদা হইতে দেখিয়া দেখিয়া একখানা 'সিজুনী' আনিয়া পুরাতন বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। সিজুনীটি মঞ্জরীর নিজের হাতে অতি যত্নে প্রস্তুত, চারুশিল্পের অপরূপ ছাঁদ বিচিত্রিত। বিছানাটি বেশ করিয়া কয়বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ডাকিল, এস।

পুলিন ঘরে আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। দেখিল, মঞ্জরী অভ্যাসমত ঈষৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া।—সেই হাসি, সেই সব, শুধু দৃষ্টিটুকু নূতন। সে তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট, একাগ্র।

পুলিন কথা কহিল, ভাবটা গদগদ কিন্তু সঙ্কুচিত, রসকলি !

মঞ্জরী চমক ভাঙিয়া কহিল, কি গো ?

পুলিন কহিল, তুমি—তুমি—আমার—আমার—আমার—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, প্রতিবারই বাধিয়া যায়, আর পুলিন রাঙা হইয়া উঠে।

মঞ্জরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার—তোমার—তোমার—কি গো ?

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, আমি তো তোমারই গো।

কথাটা বলিয়াই সে চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, চঞ্চল লঘু গতিতে, ছোট ত্বরিতগতি ঝরণাটির মতই। বাহিরে গিয়াই দরজাটা টানিয়া শিকল আটিয়া দিল। একরাশ দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া অন্তরকে দীপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল।

শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় আসিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রিতে পুলিন আসে নাই, বেলা এক প্রহর হইয়া গেল, তবু দেখা নাই। গোপিনী অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, সহসা সে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিল। স্নান সারিয়া রান্না চড়াইল।

খুট করিয়া শব্দ হইল, ওই বুঝি আসিল! প্রবল অভিমানে ব্যগ্র দৃষ্টিকে রান্নার কড়ায় সে দৃষ্টি নিবিষ্ট করিল, হাতের খুন্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতি বিক্রমে ঘুরিয়া উঠিল, খন—খন—খন।

এই বুঝি ডাকে, সাপিনী হে!

পোষা বিড়ালটা দাওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল, ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও।

আর দৃষ্টি মানিল না, ফিরিল; কিন্তু কই? শূন্য অঙ্গন, ভেজানো বর্হিদ্বার—মানুষের বার্তা তো দিল না!

হাতের খুন্তিটা সজোরে বিড়ালটার পিঠে হানিয়া গোপিনী গালি পাড়িল, বেরো, বেরো বেরো, আপদ বেরো।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, গোপিনীর মনে হইল, বুঝি বা একটা যুগ।

সহসা বর্হিদ্বার খুলিয়া বলাই আসিয়া দাওয়ায় বসিল। হাতের হুঁকা টানিতে টানিতে কহিল, শুনেছ মিতেনী, কাল রেতে মিতে যে মঞ্জরীর বাড়িতে—

বলাই পুলিনের মিতে, তাই গোপিনীকে ডাকিত—মিতেনী, গোপিনী ডাকিত—মিতে।

গোপিনী কহিল, শুনি নাই, তবে জানি।

বলাই বলিল, আবার নিজের ঘর সাফ হচ্ছে, সেইখানেই থাকবে, এ বাড়িতে থাকবে না।

একটা লজ্জা ঢাকিতে পাঁচটা লজ্জা মাথায় লইতে হয়। গোপিনী কহিল, আমিই যে থাকতে দেব না, সে আমি কাল বলে দিয়েছি, বাড়ি ঢুকলে ঝাঁটা বাড়ি দেব।

বলাই বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, ও, তাই বুঝি এত। আবার মঞ্জরীকে পত্র করবে!

বুকে পাথর চাপা দিলেও মানুষ কাতরাইতে পারে, কিন্তু এই কথাটা এমন স্থানে গোপিনীকে আঘাত করিল যে, সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বলাই কহিল কাল রেতে জমিদার গাঁয়ে এসেছেন, তুমি নালিশ কর।

গোপিনী দীপ্ত প্রতিবাদে কহিল, না।

তারপর উভয়েই নীরব; গোপিনীর হাতের খুন্তি নড়ে না, চোখ কড়ার উপর কিন্তু দৃষ্টি নয়, পলকও পড়ে না।

বলাই মনে মনে কি যেন মক্স করিতেছিল, শেষে দালালির ভঙ্গিতে রসান দিয়া কহিল, বেশ বলেছ, সেই ভাল, ও 'দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল'।

তারপর আবার হুঁকায় টান পড়িল—ফড়র ফড়র। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া

কহিল, আমাদের তো ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে, ভাবনাই বা কি! ভাত থাকলে কি কাকের অভাব হয়, কি বল মিতেনী? আমি রয়েছি, সব ঠিক করে দেব তোমার।

পরিশেষে সম্মতির আশায় মিতেনীর মুখপানে চাহিল।

মিতেনী কোন কথার উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রান্না চড়িতে লাগিল।

পুলিন কোদালি হাতে বাড়ি সাফ করিতেছিল। 'অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে', পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে। হাত টাটাইয়া উঠিয়াছে, শিরদাঁড়া টনটন করিতেছে, তবু কাজ সারা চাই। স্ত্রীলোকের অন্নদাস, ছিঃ—তার বড় লজ্জা আর কি!

মিতে বলাই আসিয়া কহিল, ভ্যালা রে মিতে, তা ভাল।

পুলিন কোদালি নামাইয়া বলিল, কল্কেকে কিছু আছে? হুঁকো লয়, অশুচ আমার।

বলা কলিকাটা খসাইয়া পুলিনকে দিল। ধুতরো-ফুলি ছাঁদে হাত ফাঁদিয়া পুলিন টান মারিল—হুশ হুশ হু—শ।

বলাই কহিল, তা এক কাজ করলি না কেন মিতে? জমিদার এসেছেন, তার কাছে পারলে একবার হোত না, তোর হ'ল সোদর খুড়ো, আর ওর সৎ বাবা, ওয়ারিশ হ'লি তুই। ও মাগী সম্পত্তির কে? চল্ তু একবার দেখবি তোর সম্পত্তি তোর হবে।

অদ্ভুত পুলিন বিচিত্র তার সংসার-বোধ, সে কহিল, ওর কি হবে?

বলাই বলিল, তোর বউ-তুই খেতে দিবি।

পুলিন কহিল, না না, আমি যে রসকলিকে—

বলাই সোৎসাহে কহিল, রসকলিকে পত্র করবি, ও মরুক গে—যা মন করুক গে। তোর কি?

সে যে নেহাৎ অমানুষী হয়, হাজারে হউক সে স্ত্রী। মনটা পুলিনের মোচড় দিয়া উঠিল। পূর্বে তাহার স্বান্তনা ছিল, তাহার প্রাপ্য ধনমূল্যে গোপিনীর নিকট মুক্তি পাইবার হকদার সে।

পুলিন বলিল, না মিতে, তা হয় না।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী!—বলাই বিরক্তভাবে উঠিল, রাস্তা ধরিল জমিদারীর কাছারির পানে।

পুলিন ভাঙা দাওয়াটার ওপর ভাবিতে বসিল।

জমিদারের পশ্চিমা চাপরাসী আসিয়া ভাঙা কাঁসরের মত খন খন করিয়া কহিল, আরে পুলিয়া, আসো আসো, বাবুর তলব আসে।

পুলিন চমকাইয়া বলিল, ক্যানে, ক্যানে, কাহেসে দরোয়ানজী?

পশ্চিমা কহিল, সো হামি জানে না।

জমিদারের কাছারিতে পুলিন আসিয়া প্রণাম করিল।

বাবু ফরসিতে তামাক টানিতেছিলেন, গোমস্তা কলম পিষিতেছে। কয়জন এধারে বসিয়াছিল, আর ওধারে আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়াছিল সঙ্কুচিতা গোপিনী।

বাবু পুলিনের দিকে চাহিয়া কাছারিকে উদ্দেশ করিয়াই কহিলেন, সে হারামজাদী কই ?

রাখাল পাইক বসিয়া ছিল, কহিল, আজ্ঞে, তিনি চানে গেল, আসছেন।

বাবু পুলিনকে বলিলেন, পুলিন, তোমার খুড়োর সম্পত্তি খারিজ করতে হবে।

পুলিন শশব্যস্তে কহিল, আজ্ঞে, সম্পত্তি আমার.নয়, ওরই।

বাবু কহিলেন, ওই হ'ল হে, ওই হ'ল, স্বামী আর স্ত্রী। মুখ থাকতে নাকে ভাত খায় কে হে ? আর তুমি থাকতে সম্পত্তির ও কে ? ও সম্পত্তি পেলে কি ক'রে ? কথা কও গো চুপ করে থাকলে চলবে না।

অগত্যা গোপিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে, তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন।

বাবু কহিলেন, তোমাকেই তবে খারিজ করতে হবে, পাঁচশো টাকা লাগবে।

পুলিন বলিল, আজ্ঞে, ও মেয়েমানুষ—

বাবু ধমক দিয়া, কহিলেন তুই থাম বেটা। বল গো, তুমি বল। আবার চুপ করলে যে, উত্তর দাও, পাঁচশো টাকা চাই আমার।

পথ ভ্রান্তকে যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই পথেই সে চলে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় গোপিনী পুলিনের কথা ধরিয়াই বলিল, আজ্ঞে আমি যে মেয়েমানুষ—

বাবু কহিলেন, আরে, সম্পত্তি তো মেয়েমানুষ নয়। আচ্ছা, না পার, সম্পত্তি তুমি পুলিনকে ছেড়ে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলিল, আজ্ঞে না।

বাবু চটিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তবে সম্পত্তি সদরে বাজেয়াপ্ত হবে। আর পুলিন তুই বেটা ওই মঞ্জরীকে নিয়ে গাঁয়ে ঢলাঢলি করছিস কেন ? ও সব হবে না, পরিবার নিয়েই থাকতে হবে।

অভিমান অনবুঝ, স্থান কাল জ্ঞান নাই , পুলিন কিছু না বলিতেই গোপিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

প্রতিবাদে বাবু চটিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, চোপরাও হারামজাদী, ওই পুলিনকে নিয়েই তোকে থাকতে হবে।

গোপিনী আঁতকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক তখনই মঞ্জরী আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বাবু, আমায় তলব করেছেন ?

বাবু মুখ ফিরাইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মুখে রসোচ্ছলা মেয়েটি —চূড়ার মত চুল বাঁধা, নাকে রসকলি আঁকা, মুখে মিষ্টহাসি, গালে দুইটি ঈষৎ টোল। মঞ্জরীকে দেখিয়া ক্ষণেক তাঁহার কথা সরিল না।

মঞ্জরী পুনরায় বলিল, হুজুর !

চমক ভাঙিয়া বাবু কহিলেন, হ্যাঁ, এস। শুনছ গো, ওসব চলবে না, পুলিনের সঙ্গেই ঘর করতে হবে।

শেষটা কহিলেন গোপিনীকে। কথার নির্দেশে মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা পিনীর উপর, সে ত্বরিতপদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।

আশ্বাস লোকে কথাতেও পায়, দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায়; গোপিনী মঞ্জরীকে ।ইয়া ধরিয়া কহিল, রসকলি!

উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, ভয় কি রসকলি?

বাবু পুনরায় কহিলেন, বুঝলে, এই আমার হুকুম। উত্তর দাও, রাজী কিনা? ছস পুলিন?

পুলিন, গোপিনী উভয়েই নীরব। উত্তর দিল মঞ্জরী, তেমনই হাসিয়া-হুজুর, স্বামী । ঝগড়া কি ধমকে মেটে?

বাবু কহিলেন, আলবাৎ মিটবে, না মিটলে চলবে না।

মঞ্জরী বলিল, নাই যদি মেটে হুজুর, তাই বা কি? আমরা জাত বোষ্টম, ছিঁড়লে া আমরা নতুন গাঁথি।

বাবু কহিলেন, বেশ, তবে ও বলাকে পত্র করুক।

ওপাশে বসিয়া বলা মুচকি হাসিল।

গোপিনী প্রবল প্রতিবাদে বলিল, না না।

বাবু কহিলেন, তবে কি মতলব শুনি? কিন্তু আমার রাজ্যে ওসব বদমায়েসি :ব না।

পুলিন কি একটা প্রতিবাদ করিল, কিন্তু এত ক্ষীণ যে কাহারও খেয়ালে আসিল । সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, যেন ধৈর্য আর থাকে না। গর্তে সাপ ধরা পড়িবার ী যেমনতর বাহির হইতেও পারে না, অথচ ক্রোধে গর্তের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া ান ঘোরে, তেমনই ভাবেই তাহার মনটা পাক খাইতেছিল।

মঞ্জরী কিন্তু বেশ সবিনয়ে সবল প্রতিবাদ করিল, জিভ কাটিয়া সে বলিল, ছি ছি, [, আপনাকে ওসব কথা বলতে নাই।

বাবু অপ্রস্তুত হইয়া মঞ্জরীকে ধমক দিয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা। তোমারও ানে থাকা চলবে না, পাঁচজন তোমার নামে পাঁচকথা বলছে, তোমায় গ্রাম ছেড়ে :ত হবে।

মঞ্জরী সবিনয়ে বলিল, আজ্ঞে, কোথায় যাব? মেয়েমানুষ আমি—

বাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল তুমি, আমার ড়তে থাকবে।

মঞ্জরী বলিল, আজ্ঞে, ঝি-গিরি আমি করতে পারব না।

বাবু কহিলেন, আচ্ছা, কাজ তোমায় করতে হবে না।

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল, বাপরে! রাণীমা তা হলে ভাত দেবেন কেন?

বাবু এবার বেশ রস দিয়া কহিলেন, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। মাদের বাগানে তোমার কুঞ্জ করে দেব, এখানে যেমন আছ তেমনই থাকবে।— য়া বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলো রসের মত, কেমন যেন বিশ্রী, কুৎসিত গন্ধের ভাস দেয়।

মঞ্জরী কহিল, আমার পোড়ার মুখকে কি আর বলব !—সত্যি সত্যিই এ মু
আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষে—! না হুজুর, আমি এ গাঁ ছে
কোথাও যাব না, সে যে যা বলবে বলুক।

বাবু মেয়েটার স্পর্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের ম
চিৎকার করিয়া কহিলেন, কেয়া হারামজাদী ? ভূতসিং, লাগাও জুত্তি হারামজাদীকো

• বদ্ধ লৌহদ্বার মত্তহস্তীও ঠেলিয়া খুলিতে পারে না, আবার অর্গল খুলি
আঘাতের অপেক্ষাও সয়না, খুলিয়া যায়। মনের দরজার ঠিক অর্গলটিতে হাত পড়িতে
সে খুলিয়া গেল, ভিতরের মানুষটি বাহিরে আসিল, সে একটা ভীষণ দাপে হাঁকিয়া উঠি
খবরদার !

রাখাল পাইকের শিথিল মুষ্টির লাঠিগাছটা কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ঠুকিয়া পুলি
বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা গড়াইত কতদূর কে জানে, কিন্তু লোকে ব্যাপারটা গোটা বুঝিত
না বুঝিতে মঞ্জরী ত্বরিত পদে পুলিন ও গোপিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহি
হইয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিতেই বাবু কহিলেন, ভূতসিং !

বলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, হুজুর, ওই মঞ্জরীর সঙ্গে গোকুলবাটীর থানার দারোগা
পরিবারের সঙ্গে খুব সুখ, একটু বুঝে—

বলার কথাটা ঢাকিয়া দিয়া লাঠি হস্তে ভূতসিং ঘ্যান ঘ্যান করিয়া বলিল, হুজৌ
হুকুম !

বাবু কহিলেন, কুছ নেহী, যাও।

মঞ্জরী দুই জনের হাত ধরিয়া আসিয়া উঠিল একেবারে রামদাসের বাড়িতে
সারাটা পথ সে যেন কি ভাবনায় বিভোর হইয়াছিল, —ভাবনা বলিলে ঠিক হয় না,
যেন একটা আবেশ, একটা নেশা।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই মঞ্জরী দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, একগাছা মোটা লা
আনিয়া পুলিনের হাতে দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বাইরে ব
পাহারাওয়ালা।

পুলিন লাঠি হাতে বাহিরে বসিল, আর ঘরের মেঝেতে বসিয়া নীরবে চোখে
জল ফেলিতেছিল দুইটি নারী। গোপিনী নত দৃষ্টিতে, আর মঞ্জরী তাহার মুখের পা
চাহিয়া যেন নেশায় বিভোর হইয়া বসিয়াছিল।

সহসা হাসিয়া সে কহিল, রসকলি।

গোপিনী মুখ তুলিয়া হাসিল, বড় বিষণ্ণের হাসি, যেন মলিন ফুলটি।

মঞ্জরী বলিল, এক কাছারি লোকের সামনে রসকলি পাতিয়েছ, 'না' বললে
চলবে না।

গোপিনী কহিল, হ্যাঁ।

মঞ্জরী বলিল, ভাই, অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও আমি তোমার দিই,—যা নিয়ম তা তো করতে হবে।—বলিয়াই খুঁজিয়া পাতিয়া সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া তিলকটি ঘষিতে বসিল।

তারপর গোপিনীর কোল ঘেঁষিয়া কহিল, তুমি ভাই, আগে বলেছ, তোমার পালা। দাও, আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও।—বলিয়া নিজের আঁকা রসকলিটি মুছিয়া ফেলিল।

হতভম্ব গোপিনী কম্পিত করে মঞ্জরীর নাকে আঁকিয়া দিল।

মঞ্জরী বলিল, দাঁড়াও সাক্ষী ডাকি।—বলিয়া বাহিরে পুলিনকে ডাকিল, সেই মধুভরা কণ্ঠ, রসকলি, এস বলি।

পুলিনকে লইয়া গোপিনীর হাতে হাতে নিজের হস্ত বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া কহিল, এই নাও রসকলি, তোমায় দিলাম।

পুলিনের কথা সরিল না।

তারপর পুলিনকে বলিল, আমি দিচ্ছি, 'না' ব'ল না।

গোপিনী ও পুলিন বিস্মিত নির্বাক।

সহসা গোপিনী মঞ্জরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, না না, তুমি সুদ্ধ এস, আমরা দু বোনে—

রসোচ্ছলা রসোচ্ছলার মতই কহিল, দূর, আমি যে রসকলি।

বৈকালের মুখে মঞ্জরী কহিল, দাঁড়াও, আমি একবার গাঁয়ের হালচাল দেখে আসি।

পুলিন বাধা দিয়া কহিল, সে কি, একলা?

মঞ্জরী হাসিয়া ঢলিয়া ভয় কি। আমার রসকলি যে সঙ্গে।—বলিয়া নাকের রসকলি দেখাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল, ভয় নাই, আমি বাইরে বাইরে খবর নেব, তেমন তেমন বুঝলে আমি গোকুলবাটী থানায় যাব। আজ রাত্রে না ফিরতেও পারি, বুঝলে? খবরদার, তোমরা বেরিও না, দিব্যি রইল, মাথা খাও।

সে কণ্ঠস্বরে পরিহাসের বিন্দুও ছিল না, পুলিন সে কথা অবহেলা করিতে পারিল না।

মঞ্জরী চলিয়া গেল রাত্রে ফিরিল না।

পরদিন প্রাতে বলাই আসিয়া ডাকিল, মিতে।

মঞ্জরীর সংবাদের আশায় নিজের বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া দরজা খুলিয়া কহিল, এস।

বলাই বলিল, বেশ বেশ, তা মঞ্জরীকে দিয়ে টাকাটা পাঠালি কেন? নিজে গেলেই তো হত। তা ও বেশ ভালই হ'ল। বাবুও বললেন, বলাই, পুলিন যখন পঞ্চাশ টাকা জরিমানাই দিলে, তখন আর তার উপর রাগ নাই আমার। তা পুলিন বোধহয় ভয়ে আসে নাই, তাই মঞ্জরীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। মঞ্জরীকেও মাপ হয়ে গিয়েছে।

তা একবার আজ যাস, বাবুকে পেন্নাম ক'রে আসিস। ভয় নাই, আমিও সব ব'(
ক'রে দিয়েছি।

পুলিনের কথা সরিল না।

জমিল না দেখিয়া বার কয়েক হুঁকা টানিয়া বলাই চলিয়া গেল। পুলি
স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কে জানে—কতক্ষণ! একটি পুঁটলি কাঁদে মঞ্জ
আসিয়া হাসিমুখে অভ্যাসমত হেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, রসকলি।

পুলিন কথা কহিল না।

হাসিয়া মঞ্জরী কহিল, রসকলি, রাগ করেছ?

পুলিন অভিমানভরে বলিল, তুমি জমিদারকে—

মঞ্জরী কহিল, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ করা কি চলে গো? ত
মিটিয়ে ফেললাম।

পুলিন কহিল, টাকা—

মঞ্জরী কথা কাড়িয়া বলিল, সে তো তোমারই গো, আমি কি তোমার পর?

তারপর পুলিনের হাত দুইটি ধরিয়া কহিল, তবে আসি।

উদ্‌ভ্রান্তের মত পুলিন বলিল, কোথায়?

মঞ্জরী কহিল, বৃন্দাবন।

পুলিন অভিমান করিয়া বলিল, রসকলি।

মঞ্জরী কহিল, আমি তো তোমারই গো।

গোপিনী দ্বারের পিছনে ছিল, সম্মুখে আসিয়া যেন দাবি করিল, না, যে
পাবে না।

মঞ্জরী বলিল, তীর্থের সাজ খুলে কুকুর হব?

গোপিনী কহিল, বল তবে, ফিরে আসবে?

মঞ্জরী বলিল, আসব।

গোপিনী কহিল, আসবে? দেখো।

উত্তর না দিয়া মঞ্জরী হাসিয়া পুঁটলিটি তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়ি
বিচিত্র সে হাসি, রহস্যের মায়া-মাধুরীতে ভরা, কে জানে তার অর্থ!

চলিতে চলিতে গান ধরিল—

"লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী;
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
আমি গরবিনী"।

নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কি হিল্লোল, রসধারা যে
সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।

দিব্যেন্দু পালিত

সেই নিদাঘ মধ্যাহ্ন একটা আহত অজগরের মতো দগদগে ক্ষত বুকে পড়েছিল পিচ-গলা মসৃণ রাস্তাটা। পশ্চিম দিক থেকে থেকে-থেকে বইছিল গেরুয়া ধুলোর ঝড়। ক্ষুব্ধ ঝড়ের স্পর্শে মৃদু রোমাঞ্চে শিহরিত হয়েছিল পাতাঝরা গাছগুলি। ধূসর ঊষর তমু'জার মাঠের পাশে বুকে হেঁটে যে শীর্ণা নদীটা হারিয়ে গেছে অনেকদূরে, দূর হ'তে সেটাকে রজত স্বচ্ছ অভ্রের পাত বলে ভ্রম হয়েছিল। দুপুরের রোদে চিক্‌চিক্ করছিল তার জল, আর নদীর উপরের নাতিপ্রস্থ বাঁশের সাঁকোটার উপর চোখ বুজে বসেছিল একটি বহুবর্ণা মাছরাঙা।

তমু'জার মাঠের পর অনেকগুলি মাঠ পেরিয়ে জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে ক্লান্ত পশুর মতো বড় বড় নিশ্বাস ফেলে সহসা চিৎকার করে উঠেছিল দুপুরের শেষ লোক্যালটা। সেই তীক্ষ্ন শব্দ শুনে ভয় পেয়ে ডানা মেলে উড়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে মেয়ে কলেজের সম্মুখে টেলিগ্রাফের তারে বসেছিল সাঁকোর উপর বসে থাকা বদ্ধ-চক্ষু মাছরাঙাটা।

তখন মেয়ে কলেজের একটি কক্ষে এটিকেট সম্বন্ধে সুশ্রাব্য ভাষণ দিচ্ছিলেন বাংলার প্রফেসর মিস রায়।

আর যখন সেই লেকচারে বাংলার ক্লাশের এককোণে। ইভা, পূর্ণিমা অথবা মঞ্জু যে কোন একটি মেয়ের অর্ধোমুখ লজ্জায় রক্তিম হয়েছিল, সেই সময় ওরা এল। তমু'জার মাঠের উপর ধুলো উড়িয়ে, অভ্রপাতের মতো স্বচ্ছ রোদ চিক্‌চিক্ নদী জল পাশে ফেলে, দগ্‌দগে ক্ষত বুকে পড়ে থাকা অজগরের মতো রাস্তাটাকে হুড-খোলা লরির চাকার নীচে পিষে, মেয়ে কলেজের সামনে দিয়ে সবকিছু পিছনে রেখে নীরবে এবং নিঃশব্দে এসে থামল আর্মি কোয়ার্টার্সের মধ্যে।

ওদের একরঙা য়্যুনিফর্মগুলি সিক্ত দেহের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল, অবশ হাঁটুগুলো ভেঙে পড়তে চাইলেও ওদের মাটি ছুঁয়ে দাঁড়াতে হয়। বন্দুক কাঁধে ওরা নেমে পড়ে একে একে। ধরাধরি করে নামতে সাহায্য করে একজনকে আর মৃত্যু নীল একটি শক্ত দেহকে চার-পাঁচজন ধরে নামায়। এবং মুহূর্তের জন্য সভয়ে কেঁপে ওঠে ওরা। ওরা সকলে।

ছোট দারোগা মন্মথ তালুকদারের উৎসাহটা যেন সকলের চেয়ে বেশি। সারা পথ ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হঠাৎ বড় বেশি সহজ হয়ে পড়েছে যেন। পুরু ঠোঁটের উপর একজোড়া কাঁচা পাকা গোঁফ ও ডান চোখের নীচে রোমশ আঁচিলটায় সযত্নে হাত বুলিয়ে দৃপ্ত হাসি হেসে বলে—বসে পড়লে চলবে না। আর একটু সবুর কর সব, বড় সাহেবকে খবরটা দিয়ে আসি। বুঝলি, এবার তোদের হাবিলদার বানিয়ে দেব।

তারপর একদল লোকের মাঝে কাকে যেন খুঁজে পৌরুষ কণ্ঠে ডাকে—পাঁড়ে।

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসে একটি লোক। জোড়া বুটে শব্দ তুলে সেলাম করে দাঁড়ায়। গোঁফের পাশে অদ্ভুত হাসে মন্মথ তালুকদার। ঠিক হ্যায়, এক্কাতার। জলদি।

বলেই পিছু ঘুরে চলতে শুরু করে হাতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে। সোজা এসে ঢোকে এনকোয়ারি অফিসে আর সবচেয়ে জোর হাওয়া পাখাটার নীচে একটা বেতের চেয়ার টেনে ঝুপ্ করে বসে পড়ে।

অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখ সবিস্ময়ে তাকায় তার দিকে। কথা বলে শুধু একজন। ডি-আই-জি'র হেড-ক্লার্ক দুলালদাস হাজরা।

—ছোটবাবু যে! ফিরলেন কখন?

—এই মাত্তর—ময়লা রুমালে কপালের ঘামাচিগুলো ঘষতে ঘষতে জবাব দেয় ছোট দারোগা মন্মথ।

—তারপর, ধরতে পারলেন?

ঝুঁকে পড়া দেহটাকে সোজা করে বসে ছোট দারোগা, মন্মথ তালুকদার পিছু হটে না মশায়। সব কটাকে ধরে এনেছি।

—তবে আর কী! নাকের উপর চশমাটা সোজা করতে করতে বিচিত্র হাসে দুলাল হাজরা।

—এবার রাতারাতি বড় দারোগা, কেউ রুখতে পারবে না প্রমোশন। তা খুব ধকল গেছে নিশ্চয়ই, কি বলেন?

অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখ আর উৎকর্ণ কানের সম্মুখে নিজেকে যেমন নতুন-ভাবে আবিষ্কার করে মন্মথ। ঘন কালো ভ্রু দুটো একসঙ্গে জুড়ে বলে—না না, ধকল আর কি! তবে—কথার মাঝে একবার থামে ছোট দারোগা তবে আমাদের একটা লোক মরেছে। চারশো সাতাশ-নম্বর। আর তেইশ নম্বরের পায়ে সামান্য চোট।

ভয় ভয় চোখের দৃষ্টি ঘরের চারপাশে বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ যেন নিভে যায় ছোট দারোগা। গলার পর্দা নীচু করে বলে—কেরানীবাবু, বড় সাহেবকে একবার খবরটা পাঠিয়ে দিন না।

—খবর! হ্যাঁ হ্যাঁ! ওরে পদ্মন, এস পি সাহেবের কোয়ার্টারে যা একবার বলবি, ছোট দারোগাবাবু সেলাম জানালে।

ফাইলের উপর ঝুঁকে নিস্পৃহভাবে পাতার পর পাতা উল্টে যায় দুলাল হাজরা। নিশ্চুপ বসে বসে বাইরের সাদা সাদা তাঁবুগুলো মনে মনে গুনতে চেষ্টা করে মন্মথ তালুকদার।

আর ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। খর রৌদ্রজ্বলা আকাশের নীচে, তপ্ত মাটির উপরে। দুঃসহ-তৃষ্ণায় ওদের বুক জ্বালা করে। কুঁকড়ে যায় মন। আর বকুল গাছের নীচে শুয়ে ঘুমোয় একটি রক্তাপ্লুত নিস্পন্দ দেহ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে।

বড়সাহেব এলেন আরো পরে। মাথায় সোলার হ্যাট, হাতের রুমালে কপালের স্বেদ মুছতে মুছতে। সঙ্গে এল ছোট দারোগা মন্মথ তালুকদার হাসিখুশি মুখ নিয়ে।

ত্রস্ত জড়সড় হয়ে আবার দাঁড়ায় ওরা। বড় সাহেব একে একে করমর্দন করেন সকলের। গম্ভীর হাসেন, খুব মুখচেনা যারা, তাদের পিট চাপড়ে বলেন—সাবাস্।

ঋজু হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম তেইশ নম্বরের পায়ের চোট দেখে দুঃখ করেন বড়সাহেব। অভয় দিয়ে বলেন—ডরো মত্। বিলকুল আরাম হো জায়গা।

সে জানতো আরাম হয়ে যাবে। কারণ সেটাই স্বাভাবিক। তবু কৃতজ্ঞতায় মাথা নীচু করে, করতে হয় বলে।

বড়সাহেবের সর্তক চোখ নজর করে না প্রথমে। ছোটদারোগা তালুকদার অতি বিনীতভাবে বলে—ওদিকে আরেকজন স্যর্।

—কত নম্বর ?

—চারশো সাতাশ, আর্মড্।

—ডেড্ অর নট ?

—ইয়েস।

প্রশ্ন শেষ করে চারশো-সাতাশ নম্বরের মুখের উপর ঝুঁকে পড়েন বড়সাহেব, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—পিটি। তালুকদার, একে হাবুতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।

প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি শব্দ নিস্তরঙ্গ বাতাসে ভেসে ভেসে তীক্ষ্ণ বিষ-শরের মতো বেঁধে ওদের বুকে। কালকূটের তীব্র জ্বালা সঞ্চারিত হয় ওদের দেহে মনে, সর্বত্র। ওদের চোখে ফুটে ওঠে নীরব ভৎর্সনা।

এর বেশি কিছু বলেন না বড়সাহেব, অন্তত কেউ কোনদিন শোনেনি। আর কোনদিন শোনেনি বলেই তিনি যেটুকু বলেন সেটুকু শুনেই ওরা কৃতজ্ঞতায় নত হয়। বিসের বেদনায় টনটন্ করে ওদের প্রবাসী বুকগুলি। কপট গাম্ভীর্যের একটা সূক্ষ্ম আবরণ দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে সর্বদা ঢেকে রাখেন বড়সাহেব, এবং সেই আবরণ টুকরো করে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আবিষ্কার করার দুঃসাহস যেন কারুর নেই।

কিন্তু এই মুহূর্তে ছোটদারোগা মন্মথ তালুকদারের সে দুঃসাহস থাকা প্রয়োজন মনে হয়। রসুলগঞ্জের জঙ্গলে অনেক সংঘর্ষের পর অনেকদিনের পুরোন ও দুর্ধর্ষ ডাকাত দলকে ঘণ্টা কয়েক আগেই শাসনে এনেছে সে। অনেকগুলি এ্যাসিত মানুষকে রক্ষা করার বদলে যদি চারশো সাতাশ নম্বর বন্দুকের গুলিতে মারা যায় বা তেইশ নম্বরের পায়ে সামান্য চোট লাগে তাতে কী আসে যায়। কিন্তু ছোটদারোগা মন্মথ তালুকদার যে একটা অসীম সাহসিক কাজ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা এবং বড়সাহেবের এই নিস্পৃহতায় চুপ করে থাকা তার পক্ষে আশ্চর্য বই কি !

সাহঙ্কারে বড়সাহেবের পাশে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলেই ফেলে ছোটদারোগা।—আসামী গ্যাঙ্টাকে একবার দেখবেন না স্যর ?

—আসামী ? বেশ তো, দেখব পরে। ক'জন আছে ?

ছোটদারোগা মন্মথ তালুকদারকে উৎসাহিত করার জন্যেই হোক অথবা যে জন্যেই হোক, এই মৌখিক সৌজন্যটুকু রক্ষা করেন বড়সাহেব।

—পাঁচজন। কোন কথাটির পর কোন কথাটি বলা উচিত মনে মনে তা ঠিক করে নিয় মন্মথ।

—মানে এ ধরণের একটা সিরিয়াস কেস্ লাইফে এই প্রথম কিনা স্যর। অনেক কষ্ট সয়েছি স্যর, সেই শেষ রাত্তির থেকে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত পিছু পিছু পাঁচ সাতমাইল ঘুরেছি। গুণ্‌তিতে পাঁচ, কিন্তু কাজের বেলায় আমাদের তিরিশ জনকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লে। আট দশ ঘণ্টা নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মেরেছে। দুটো ষ্টেনগান দুটো বন্দুক আর হ্যাণ্ডবম্ কোথা থেকে পায় কে জানে।—তবু আমার কাছে শেষ পর্য্যন্ত টিকতে পারলে না স্যর। সব কটাকে ধরে এনেছি।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে আরো কিছু বলার জন্য একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে চুপ করে যায় মন্মথ। কিছু শোনবার আশায়-তাকায় বড়সাহেবের মুখের দিকে। কিন্তু তার মনে হয় যে, তার এতক্ষণের সাজিয়ে গুছিয়ে বলা সব কথা যেন বৃথা হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে এতগুলো অবান্তর-কথা বলেও যেন বড়সাহেব উদ্দালক বসুর গাম্ভীর্যের আবরণটুকু ছিঁড়তে পারেনি মন্মথ তালুকদার।

উদ্দালক বলে—তোমার একটা ভালো রেকর্ড রইল, তালুকদার। শোন, জন ছয়েক সেপাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও তো এখুনি। উইদাউট ফেল। বেশ এবার তুমি যাও। আর একটা কথা, চারশো-সাতাশের ডেথ নিউজটা যেন বেশি ছড়িয়ে না যায়।

—সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যর। আমার নাম মন্মথ তালুকদার। একটু দাঁড়িয়ে কিছু ভাবে, তারপর দুদিকে চলে যায় দুজনে।

দুপুরের খররোদ নিস্তেজ হয়ে আসে। পত্রহীন ধ্বজভ্রুমের দীর্ঘ ছায়া নামে তম্‌বুজার মাঠে। গেরুয়া ধুলোর ঝড় স্তব্ধ হয়। এরই মধ্যে কখন বাঁশের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ সামিয়ানা দাঁড় করানো হয়েছে উদ্দালক বসুর কোয়াটারের লনে।

সুসজ্জিত ড্রইংরুমে বসে চুরুটের ধোঁয়ার রিং তৈরী করতে করতে বড দারোগা অনুপমের সঙ্গে কথা বলে উদ্দালক। বাতাসে কাঁপে জানালার আকাশ-রঙ পর্দাগুলি। দরজার রঙীনপর্দার ওপাশে খট্‌খট্ অবিশ্রান্ত শোনা যায় টাইপরাইটিং মেশিনের একটানা শব্দ। উদ্দালকের হাতে একটা কাগজ, কাগজে পর পর অনেক নাম। উদ্দালক ডাকে—অশোক, একবার শোন তো।

রঙীন পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে উদ্দালকের স্টেনো-টাইপিস্ট অশোক।—কী স্যর?

উদ্দালক জিজ্ঞাসা করে—কী টাইপ করছ এখন?

—রহমতপুরের কেসের স্টেটমেণ্টটা। আপনি বলেছিলেন ওটা আগে করে দিতে।

—বলেছিলাম, মনে আছে। এক কাজ কর; ওটাকে এখন ছেড়ে দিয়ে এইটা একটু তাড়াতাড়ি করে দাও, বুঝলে। আর শোন, মিস রায়ের নামটা থার্ডে আছে, ওটাকে ফার্স্টে করে দিও। তারপর হনুমানদাস দৌলতরামের নামটা।

অশোক চলে যায়। সোফায় দেহ এলিয়ে বসে উদ্দালক। বিশ্রস্তাতুর দুটো ঘুঘু কেন যেন উদাস উদাস ডাকে বিংশুক পল্লবে বসে। ঝড়ের রেশ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে শুকনো মাটির উগ্র গন্ধ। আর একটা সিগারেট ধরায় উদ্দালক।

অনুপম জিজ্ঞাসা করে—মিসেস বসুকে দেখছি না, তিনি কোথায়? উদ্দালক হাসে। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টেনে টেনে হাসে উদ্দালক—মিসেস বসু আজ সকালে সিমলায় চলে গেছেন, তাঁর মামার বাড়ি। গরমের সময়টা সেখানে সুন্দর কাটবে, কী বল?

অনুপমের কিছু বলার অপেক্ষা করে না উদ্দালক। কিংবা হয়ত উদ্দালক জানতো কিছু বলবে না অনুপম। তাই ভুরু কুঁচকে সিলিংপাখার ব্লেডের সংখ্যা গোনে।

—স্যর? চেতনা ভেঙ্গে যায় উদ্দালকের। কান পেতে শোনে কেউ কিছু বলছে কিনা?

অশোক বলে—কাজটা হয়ে গেছে স্যর।

—হয়ে গেছে, বেশ। অনুপম, এবার তোমার কাজ। আমার কারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়। এতে যেমন যেমন নাম আছে, সেই অনুযায়ী ইনফর্ম করতে করতে যাবে বুঝলে?

একটু যেন ইতস্ততঃ করে অনুপম। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে যায় যেন। তারপরেই বলে—কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলব?

কী কথা?

হাতের কাগজটার উপর এক নজর বুলিয়ে অনুপম বলে—আজকের দিনটা অপেক্ষা করলে কী আপনার খুব অসুবিধে হবে? মানে চারশো-সাতাশ নম্বরের অমন একটা ট্র্যাজিক ডেথের পর, আজকেই এই পার্টি—ওরা একটু ডিপ্রেসড হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ওদের ওপর আমাদের একটা রেসপনসিবিলিটি আছে।

—ড্যাম ইওর উইক্ সেন্টিমেন্টস্। গর্জন করে ওঠে উদ্দালক—রেসপন্সিবিলিটিটা তোমার চেয়ে আমার বেশী।

দ্বিরুক্তি না করে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে অনুপম। অন্যমনা কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করে উদ্দালক।

তর্ম্জার মাঠে বিষণ্ণ-বিকেলের ছায়া থমথম করে। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় উদ্দালক। মৃদু হাওয়ায় আকম্পিত সামিয়ানার ঝালর। দুটি চড়ুই সবুজ ঘাসের লনে তাবীজ খুঁটে খুঁটে খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত। রূপালী জরির ফিতের মতো চিক্ চিক্ করে দূরের শীর্ণা নদীজল। তাল খেজুরের মাথায় বৃত্তাকারে ওড়ে গাংচিল।

বারান্দায় স্নিগ্ধ ছায়ায় বেতের চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে উদ্দালক। চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট ছায়া হয়ে ভাসে একটি রক্তাক্ত বিকৃত মুখ। ছোট দারোগা মন্মথ তালুকদার প্রায় মুখস্তের মতো বলেছিল—চারশো-সাতাশ নম্বর আর্মড্।

কত রকমের অপমৃত্যু আসে মানুষের জীবনে। আর সেই অনেক রকম অপমৃত্যুর মতো চারশো-সাতাশ নম্বরের মৃত্যুও খুবই স্বাভাবিক ও সাধারণ বলেই মেনে নিয়েছে উদ্দালক। কিন্তু আসন্ন গোধূলির শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে বারান্দায় চেয়ারে বসে হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় উদ্দালক। এ ভাবালুতা শোভা পায়না অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পেরে নিজেকে সংযত করে সুস্থির হয়ে বসে চেয়ারে। আরামে গা এলিয়ে দিয়ে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে চলে।

আরো কিছুক্ষণ পরে যেন সম্পূর্ণ বদলে যায় উদ্দালক। কিছুক্ষণ আগেকার সেই উদ্দালক বসুকে এই উদ্দালকের মধ্যে আবিষ্কার করা দুরূহ ও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বিসের এক রূঢ় আঘাত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তার অস্তিত্ব।

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উদ্দালক বসুর কোয়াটারের সম্মুখে সবুজ ঘাসের লনে ঝালর দেওয়া সামিয়ানার নীচে রঙীন আলোয় আলোকিত আসর ঝলমল করে। সারি সারি চেয়ারের মাঝখানে ঝকঝকে টেবিলে কাঁচের ফুলদানিতে ফুলের স্তবকে স্তবকে স্নিগ্ধ সুরভি ভেসে বেড়ায়। আমন্ত্রিতদের সেবায় তৎপর হয়ে আসরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটোছুটি করে বয় আর বাবুর্চি। সারি সারি চেয়ারে বসে থাকা প্রতি সজ্জনের পাশে পাশে সুস্মিত মুখে ঘুরে বেড়ায় আর মনিবন্ধের ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকায় উদ্দালক। প্রোৎফুল্ল হাসির জোয়ারে ভাসতে থাকে সমস্ত আসর। রঙীন আলোর তীক্ষ্ণ জ্যোতি ঠিকরে পড়ে সকলের চোখে মুখে, আর একটি সময় সমস্ত আসরের সবকটি মন বুঝে নেয়, কোথায় যেন ফাঁক থেকে গেছে, যার জন্যে সম্পূর্ণ সহজ হতে পারছে না উদ্দালক। বুঝতে পেরেও সকলেই চুপ করে থাকে, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কিন্তু কথা বলে না। কারণ সকলেই জানে উদ্দালক বসুর এই উত্তেজনা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

আরো কিছুক্ষণ পরে সমস্ত আসরের স্তিমিত দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে উদ্দালকের চকচকে ক্যাডিল্যাক এসে থামে সবুজ লনের পাশে সরু প্যাসেজে। সবকটি বিস্মিত মনকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যায় উদ্দালক, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যেক উদগ্রীব চক্ষু দেখতে পায়, কোথা থেকে এক প্রখর বিদ্যুত যেন ধরে এনেছে উদ্দালক। বেণী বাঁধার আর শাড়ি পরার ধরণে-যার সাম্প্রতিকতম শোভা-পারিপাট্য ঝলসে যাচ্ছে; গলার হার আর কানের সবুজ পাথরের দুল চিক্‌চিক করছে উজ্জ্বল আলোয়।

মুহূর্তগুলি আবার উৎকর্ণ হয়। শুনতে পায় আসরের উপান্তে বসে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তার পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করছেন—কে এই মহিলা ?

বিস্মিত হয়ে দ্বিতীয় ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করেন—চেনেন না বুঝি ? —উনি হলেন স্বপ্না রায়। লেডিস কলেজের প্রফেসর।

—মিষ্টার বসুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি ?

—আপনার আমার সঙ্গে মিস্টার বসুর-যা সম্বন্ধ, তাই।

রঙীন আলো ঝলমল আসর সহসা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। একটি বিদ্যুতের সংস্পর্শে যেন ভস্ম হয়ে যায় সব আনন্দ এবং থেমে যায় সব কোলাহল। আমন্ত্রিতদের কৌতুহলী দৃষ্টি বার বার ফিরে ফিরে চায়। দেখতে পায়, পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে প্রায় মুখের কাছে মুখ নামিয়ে হাসছে দুটি নির্লজ্জ মুখ। অস্ফুট গুঞ্জন শোনা যায় চারদিকে। দেখা যায় প্রতিটি দেহ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে হঠাৎ।

মিস্টার তিলক তাঁর পাশের মিস্টার ঘোষকে বলেন—আমার একটা জরুরী কাজ ছিল, এখানে না আসলেই ভাল করতাম। মিস্টার ঘোষ সমর্থন করে চুপ করে যান এবং একটু পরেই তাঁর পাশের হনুমানদাস দৌলতরামজীকে বলেন উদ্দালক বাবুর এ ধরনের ব্যবহার আমরা আশা করিনি।

ট্রে হাতে আসরের চতুর্দিকে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় বয় আর বাবুর্চি।

অতিথিরা ট্রে থেকে সন্তর্পণে নিজেদের ইচ্ছেমত পানীয় তুলে নিয়ে সব কিছু ভুলে যেতে চায়।

কিন্তু উদ্দালকের চোখের তারা দুটো হঠাৎ এত ব্যস্ত ওঠে কেন? আর এই রঙীন স্বপ্নালোকের মায়াকে টুকরো করে যে লোকটা ছুটে এসে উদ্দালকের মনের মধুর ভাবনাগুলোকে সহসা বিচলিত করে তোলে, সেই লোকটাই বা কে?

আসরের কোলাহল থেকে একটু দূরে সরে আসে উদ্দালক।

—কী ব্যাপার অনুপম। এমন অসময়ে?

—ব্যাপার খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না স্যর। অনুপমের চোখে মুখে চিন্তার চকিত ছায়া দোলে। সমস্ত ইয়ার্ড ক্ষেপে উঠেছে। বলছে, ডেড্‌বডির কোন কিনারা না করলে আল্‌টিমেট রেজাল্‌ট খারাপ হবে। ইসমাইলের আত্মীয় স্বজনকে খবর দেবার আর্জেন্ট ব্যবস্থা চায়। আর ওদের শোক দিবসে উৎসব বন্ধ করতে হবে, আলো নিভিয়ে দিতে হবে।

—শাটাপ্‌। উত্তেজনায় উদ্দালকের গলা কাঁপে—এত স্পর্দ্ধা ওদের হল কবে থেকে? ওদের বলগে, বেশি চেঁচামেচি করলে সব কটাকে সাসপেণ্ড করে দেওয়া হবে। আর কাল সকালে ওদের সকলের আড়াই ঘণ্টা একসট্রা মার্চ-পানিসমেণ্ট, মড়ার ব্যবস্থা কাল সকালেই করা যাবে। তুমি যাও।

আবার ফিরে আসে উদ্দালক এবং নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে। লিপস্টিক ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসে স্বপ্না রায়।

সুস্বাদু খাবারের গন্ধে আর হুইস্কির আমেজে বিহ্বল ও উচ্ছল হয়ে ওঠে আসর। পলকে পলকে রঙ বদলায় রঙীন বাতিগুলি। নতুন ধরনের খাবারের ট্রে সাজিয়ে ছোটাছুটি করে বয় আর বাবুর্চি। আসরের একেবারে শেষ সীমায় একটি চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ায় স্বপ্না রায় আর উদ্দালক। সেই চেয়ারের অতিথি হনুমানদাস দৌলতরামের চোখে কেমন যেন ধাঁধা লেগে যায়। নিমেষে তাঁর ভুল হয়ে যায় যে, তিনি অনেক মানুষ আর অঢেল ঐশ্বর্যের বিধাতা।

প্রথম চমকানি কেটে যাবার পর উদ্দালক জিজ্ঞাসা করে—যেমন বোধ করছেন হনুমানদাসজী?

বিনয়-বিনম্র কণ্ঠে হনুমানদাস বলেন—ভালো, চমৎকার হুজুর।

—তারপর আপনার বিজনেস্‌ কেমন চলছে বলুন?

—সবই আপনাদের দয়ায় হুজুর। কোনরকমে চলে যাচ্ছে। বরাবর বেগুনিয়ার খাদে এবার তেমন কয়লা পাওয়া যায়নি। কানপুর বাজারে চামড়ার দামও পড়তি মুখে। নাফা তেমন নেই এ'বছর।

বুঝতে পারে উদ্দালক, অনেক ঐশ্বর্যের বিধাতা হনুমানদাসের লোলুপ চক্ষু দুটি, তার অপাঙ্গ লেহন করে বেড়াচ্ছে। ওষ্ঠপ্রান্তে বঙ্কিম হাসির ঝিলিক খেলে যায় উদ্দালকের।

উদ্দালক বলে—আপনার সেই স্মাগলিং কেস্‌টার কথা মনে আছে তো?

—আছে বৈকি হুজুর। স্ফীত কপোলে আর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসে হনুমানদাস—আপনারা আছেন বলেই তো আমরা ভরসা পাই। আপনার সেটা এনেছি হুজুর। নিবেন?

উদ্দালক মুখ নামিয়ে বলে—অত ব্যস্ত কিসের।

—জী।

থরে থরে সাজানো আসরের মুগ্ধ চক্ষুগুলি দেখতে পায়, স্বস্থানে ফিরে এসেছে উদ্দালক।

হঠাৎ সকলের মনে একটা অসম্ভব আলোড়ন তুলে খিল খিল করে হেসে ওঠে স্বপ্না। অদ্ভুত সেই হাসির শব্দে চোখ তুলে তাকায় সকলে। এতগুলো পুরুষ চক্ষের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে আশ্চর্য্য সহজ হয়ে উঠেছে একটি নারীমুখ। অঙ্গভঙ্গী আর মাপা হাসিতে যার এটিকেটের মাধুর্য্য ঝরে পড়ছে। কব্জিতে বাঁধা রিস্টওয়াচে সময় দেখে উদ্দালক। অনেক রাত হয়েছে। অন্ধকারের পুরু পর্দা নেমেছে তমু´জার মাঠে হারিয়ে গেছে তাল-খেজুরের দীর্ঘ কায়াগুলি।

আর্মি কোয়ার্টার্সের সাদা সাদা তাঁবুগুলি অস্পষ্ট ছবির মতো ছেঁড়া ছেঁড়া দেখা যায় দূরে। বীভৎস আর ভয়ঙ্কর-মৃত্যু লুকিয়ে আছে ওখানে। চারশো-সাতাশ নম্বর আর্মড্। ভয় পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় উদ্দালক।

সির্ সির্, ঝির্-ঝির্, বাতাসে কাঁপে সাজিয়ানার ঝালর। মদিরতায় বিহ্বল উজ্জ্বল আসর ঝিমিয়ে পড়ে। হঠাৎ থেমে যায় একটি প্রমত্ত চপল নারী কণ্ঠের কাকলি আমন্ত্রিত অতিথিদের চোখগুলি ক্লান্তিতে ঢুলু ঢুলু করে।

আসর ভেঙে যায়। সারি সারি চেয়ার সাজানো আসরে এতক্ষণ ধরে রাখা বিচিত্র মুহূর্তগুলি স্বাদ ও গন্ধ হারিয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায়। পরিশ্রান্ত বয়বাবুর্চিরা কখন সরিয়ে নিয়ে যায় গ্লাস, প্লেট, কাঁটা-চামচ উচ্ছিষ্ট অবশেষ। শূন্য আসর স্তব্ধ পড়ে থাকে।

আর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উদ্দালকের চক্‌চকে ক্যাডিলেকের স্পীড্ বাড়ে একটু একটু করে। পাশাপাশি ঘন হয়ে বসে উদ্দালক আর স্বপ্না। আসরের সে সন্দিগ্ধ চক্ষুগুলি নেই এখানে।

হেডলাইটের তীব্র আলোয় ঝল্‌সে যায় ঘাস আর পথ। ষ্টীয়ারিংয়ে হাত প্রা বক্ষলগ্না স্বপ্না রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে উদ্দালক। স্বপ্নার শিথিল কবরীর ঘ্রাণ-নিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কেমন লাগছে স্বপ্না?

আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দেয় স্বপ্না—ভালো।

উদ্দালক বলে—আমি জানতাম ভালো লাগবে। আর জানতাম বলেই মিসে বসু এখন সিমলায় গ্রীষ্ম-বাস করছেন। আর—আর—

হর্ষোচ্ছাসে মনের মতো কথা খোঁজে উদ্দালক। উদ্দালকের বুকে মাথা রেখে মৃদুকণ্ঠে বলে স্বপ্না—সত্যি, অদ্ভুত সুন্দর তোমাদের লাইফ!

আর্মি কোয়ার্টার্সের তাঁবুগুলি আশ্চর্য্য নিস্তব্ধ। সেদিকে তাকিয়ে চিন্তিত হ উদ্দালক।

ধীরে ধীরে বলে—হয়তো তাই।

আর্মি কোয়ার্টার্সের নীরবতার মাঝে হু হু করে ছুটে চলে চক্চকে ক্যাডিল্যাক্। অহেতুক চিন্তার সূত্রগুলি দূরে সরিয়ে দিতে চায় আর সেই জন্যেই প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে উদ্দালক—শুনছিলাম থার্ড ইয়ারে একটি নতুন মেয়ে এসেছে, মালবিকা সেন না কী নাম যেন। মেয়েটি কেমন ?

কণ্ঠস্বরে নির্লিপ্ত মিশিয়ে স্বপ্না বলে—সুন্দরী, কেন ? উদ্দালক হাসে। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবীর পকেটে অনেকগুলি কাগজ খস্‌খস্ করে। উদ্দালকের মনে রামধনুর রঙ ছড়ায়। উৎকোচ নেবার লোক যদি থাকে পৃথিবীতে, উৎকোচ দেবার লোকের অভাব হবে না কোনদিন। উদ্দালক বলে—মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পার ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে স্বপ্না। অন্ধকারেও ঝক্মক্ করে স্বপ্না রায়ের চোখ। তারপর সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়—বেশ।

কিন্তু কই—মালবিকা সেনের সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখটি মনে পড়ছে না তো ? তার বদলে উদ্দালকের চেতনা আচ্ছন্ন করে চলেছে একটি যন্ত্রণাকাতর নিরীহ মুখ। মনে হয়, অনেক কষ্ট সহ্য করে মৃত্যু হয়েছে ওই মুখের। ছোট দারোগা মন্মথ প্রায় মুখস্থের মতো বলেছেন—চারশো সাতাশ নম্বর, আর্মড্। উদ্দালক ভাবে আর ভেবে ভয় পায়। হয়তো ওই মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী।

হঠাৎ ব্রেক্ কষে উদ্দালক। একটা বিকৃত শব্দ করে থেমে যায় গাড়িটা। সারি সারি তাঁবুগুলির মধ্যে থেকে কতগুলো শঙ্কিত চোখ বেরিয়ে এসে যেন ভয় পেয়ে ঢুকে যায় আবার। চমকে উঠে স্বপ্না উদ্দালকের হাত চেপে ধরে বলে—একী! গাড়ি থামালে কেন ?

মুক্তোকুচির মতো স্বেদবিন্দু দেখা যায় উদ্দালকের প্রশস্ত কপালে। কেমন ভীত রক্তশূন্য মুখে স্বপ্নার চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে উদ্দালক। তারপর ষ্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বলে—গাড়ি ব্যাক্ করতে হবে।

—কেন ?

—এতরাতে আর নাই হোস্টেলে ফিরে গেলে। একটা অজুহাত দেখতে পারবেনা ? কাল তো ছুটি।

রোমাঞ্চে কাঁপে স্বপ্না। বুকের স্পন্দন উত্তাল হয়। শিরা স্নায়ুতে উষ্ণ রক্তের উত্তেজনা। স্বেদ-স্নাত উদ্দালকের মুখের কাছে মুখ সরিয়ে আনে স্বপ্না।

তাঁবুর ভেতরে—শঙ্কিত চক্ষুগুলি আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখতে পায়, একটা চক্চকে গাড়ি গিয়ে থেমেছে বড়সাহেবের কোয়ার্টারের সামনে। ত্রস্ত দুটি মূর্তি দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে ছায়ার মায়ায়।

নিস্তব্ধ তাঁবুগুলি জেগে ওঠে। ক্লান্ত গুঞ্জন শোনা যায়। অতন্দ্র চোখে জলরেখার মত অস্পষ্ট একটি মুখ ছায়া ফেলে বার বার। চারশো সাতাশ নম্বর. আর্মড্।

—বহুত্-দুখ-মেঁ থা বেচারা।

কথা বলে আর অপলকে সারাক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকে মার্কিন কাপড়ে ঢাকা নিস্পন্দ শবের দিকে। তমুর্জার মাঠের ওপরে প্রহর ঘোষণা করে শিবাকণ্ঠ। রাত

তুটোর সঙ্কেত ধ্বনি শোনা যায় নীরব নিস্তব্ধ তাঁবুগুলি বুঝতে পারে, এতক্ষণে কার যেন ডিউটি শেষ হল এবং কে যেন বাকী সময়টুকু সজাগ থাকবার জন্য বন্দুক কাঁধে প্রস্তুত হল।

ঝির্-ঝিরে্ সির্-সিরে্ বাতাস ছুটে আসে তমু্জার প্রান্তর কাঁপিয়ে। আলেয়ার পিঙ্গল চক্ষু সর্বনাশা আহ্বান জানায়। জোনাকির বাতিগুলো থেকে থেকে জ্বলে আর নেভে। চারটে মন্থর পা থম্‌কে দাঁড়ায় উদ্দালকের কোয়ার্টারের সম্মুখে। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে উদ্দালকের ক্যাডিল্যাক্। সন্ত্রস্ত পাগুলি এগিয়ে যায় উদ্দালকের বারান্দার দরজায়।

. কাকতন্দ্রা গুঁড়ো হয়ে যায় উদ্দালকের। উঠে বসে স্বপ্না। সুইচ্ টিপে বিদ্যুৎ-বাতি জ্বালে উদ্দালক। কলিংবেলের দিকে সরোষে তাকায়। তারপরেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গিয়ে দরজা খোলে।

—সেলাম হুজুর।

—উল্লু, এত্‌না রাত মেঁ ক্যা হ্যায়?

—চারশো-সাতাইশ নম্বর-কা মুর্দা সড রহা হ্যায় হুজুর! জোর মহক্ ছুট্ রহা হ্যায়।

এক মুহূর্ত কী ভেবে নেয় উদ্দালক। তার পরেই বলে—ঠিক হ্যায়, জ্বালা দেও

ক্ষীণ-নিরুত্তেজ প্রতিবাদ শোনা যায়— জী, মুসলমান হ্যায়!

ঠিক হ্যায়, তব্ যো কারনা হ্যায় করো। সশব্দে দুটি মূর্তির সম্মুখে বন্ধ হয়ে যায় উদ্দালকের দরজা। কিছুক্ষণ বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থেকে দু'জোড়া মন্থর পা আবার নীচে নেমে আসে। তারপর আর্মি কোয়াটার্সের লাল সুরকির পথ ধরে চলতে থাকে।

নরম রোদের আলো ও উত্তাপ গায়ে মাখতে মাখতে এগিয়ে চলে ওরা। বিষণ্ণতায় করুণ মুহূর্তগুলি ভারী পাথরের মতো চেপে বসে ওদের বুকে। ক্লান্ত ফুসফুসে, শিরা উপশিরায় এবং রক্তকনিকায় এক অদ্ভুত জ্বালা ছড়িয়ে যায়।

আর্মি কোয়াটার্সের কাঁটাতারের বেড়া পার হয় ওরা। চারজনের কাঁধের উপর চৌ-পায়ার বাঁধা চারশো-সাতাশ নম্বরের শবদেহ শুয়ে থাকে। দশটি মানুষের কুড়িটি মন্থর পা এগিয়ে চলে। কবর সেরে ওরা যখন ফিরে এল, তখন তমু্জার মাঠে ধ্বজদ্রুমের ছায়া আঁধারে বিলীন হয়ে গেছে। শিবাকণ্ঠ শোনা যায়নি. কিন্তু ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল। তার পিঙ্গল চক্ষু আলেয়ার ইশারারা থেকে থেকে দপ্ দপ্ জ্বলছিল নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছিল আকাশে।

তমু্জার মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এবং আরো অনেক বন-প্রান্তর পিছনে ফেলে আর এক আকাশে নতুন চাঁদ দেখা যায়। শিরীষের ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় রুপালি জরির মতো জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি লেগে থাকে। শিরীষ ও পিপুলের মর্মর ছাপিয়ে বনান্তর থেকে ভেসে আসে বন তিতিরের ডাক।

মাটির ঘরের রোয়াকে বসে প্রতিবেশী রমজান আর কুঞ্জলালের সঙ্গে গল্প করে আবদুল। স্বদেশী যুগে ধর্মঘট করে ইংরেজের বন্দুকের গুলিতে মারা গেছে বড় ছেলে রক্তে ভেসে গিয়েছিল মাটি। হোক্ মৃত্যু, তবু শোকাকুল মনের কোণে সর্বদা একটি

র্ব অনুভব করে আবদুল। মনে পড়েঃ গুলি খেয়ে জামিল যখন মারা গেল, কয়েকশত লোক ফুলের চাদরে ঢাকা জমিলের মৃতদেহটা নিয়ে গিয়েছিল সমাধি স্থানে। মুঠিভরে মাটি ছড়িয়েছিল কবরের উপর।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পিঁয়াজ ও রসুনের ঘ্রাণ নিয়ে আবার আরম্ভ করে আবদুল আলী—আল্লার মর্জি, বাবুসাহেব। কঁহা সে কেয়া হো গিয়া, জখম হো গিয়া তামাম দুনিয়া।

হঠাৎ চমকে ওঠে আলী। কাঁচের চুড়ির অপর্ব নিক্কণ শুনতে পায় বুঝি। মুখ দেখতে পায়না, কিন্তু পরিষ্কার উঠোনে নিস্পন্দ ছায়া দেখে বুঝতে পারে আবদুল।

—রসুই তৈয়ার আব্বাজান।

কুঞ্জলাল আর রমজান চলে যায়। আহারে বসে আবদুল। গ্রাস তুলতে তুলতে অপাঙ্গে চায় পুত্রবধুর সুষীম মুখের দিকে। আর একটি মুখ মনে পড়ে যায়। এই ছায়া সুনিবিড় গ্রাম থেকে কত যোজন দূরে একটি ম্লান মুখ প্রহর গুনছে হয়তো। চোখ জ্বালা করে, মাথা ঝিম্ ঝিম করে আবদুলের।

তারপরে ধীরে ধীরে বলে—ইসমাইলকে আমি আসতে লিখে দিয়েছি বেটি। অনেকদিন দেখিনি, বড় ইচ্ছে হয় দেখতে। এই বুড়ো বয়সে, ছেলে সংসার নিয়ে বড় সুখে দিন কাটবে ভেবেছিলাম। হল কুই। খোদার দোয়া বেটি। সবই তাঁর মর্জি।

আবদুলের কথা শুনে অশ্রু সজল হয়ে ওঠে নৈয়াবার চোখ।

নিশুত রাত ভোর হয়। বাইরের দাওয়ায় বসে আবদুল। ছেলের চিঠি আসতে পারে আজ। সপ্তাহে তিনদিন ডাকপিওন আসে। অনেকগুলি উদগ্র ও চঞ্চল মন অপেক্ষায় অধীর হয়ে থাকে। চিঠি বা ওই ধরণের কিছু এলে খুশি। না এলেও ক্ষতি নেই। অন্য কোন দিনের আশায় অপেক্ষা করে।

ডাকপিওন আসছে। এক হাটু কাদায় পা ডুবিয়ে। আবদুলের ঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ডাকপিওন।

—চিঠি আছে।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেয় আবদুল। চোখে কম দেখে আবদুল। ওই চিঠি পড়ার জন্য পিওনকেই অনেকের সময় চুরি করে কিছুটা মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হয়।

জোরে জোরে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অক্ষর মানে করে—এ চিঠি পড়া যায় না। অর্বাব্যতার জন্য নয় অন্য কোন কারণে হয়তো। প্রস্তুত করে আবো কিছুটা সময় কাটে ডাকপিওন। তারপর দৃঢ় অবিচলিত সুরে বলে—এ সরকারী চিঠি মিঞাসাহেব। সরকার লিখেছে, তোমার ছেলে ইসমাইল মারা গেছে ডাকাত ধরতে গিয়ে। আর দুঃখ করেছে সবাই। লিখেছে, তোমার ছেলে আর তোমাদের কাছে সরকার বহুত ঋণী। আর লিখেছে, মাসে মাসে দশটা করে টাকা তোমার পরিবারকে সরকার মাসোহারা হিসাবে পাঠাবে। ব্যস, এই।

শুধু এইটুকু। এর বেশী আর কিছু নেই চিঠিতে থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। চিঠিটা হাতের মুঠোয় ধরে স্থির শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের ধূলিকাপা, দূরের

শস্যাশ্যামল প্রান্তর ও নীল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে আবদুল আলী। পিওন চলে যায় কখন, লক্ষ্য করে না।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় আবদুল আলীর। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, খোঁজ করা হয়নি কোথায় নৈয়ারা আর তার শিশুটা পড়ে আছে। নৈয়ারাও খেতে ডাকেনি তাকে। আর সেজন্য ক্ষোভ বা ক্রোধ কিছুই নেই আবদুলের মনে। শুধু ভেবেছে সারাটা সময়, এতক্ষণ পর্যন্ত শুধুই ভেবেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল নৈয়ারা। ম্লান চাঁদের আলোয় শিশুটিকে বুকে নিয়ে কোন শান্তিতে যেন ঘুমিয়েছিল নৈয়ারা। ভুলে গিয়েছিল ক্ষুধার্ত শ্বশুরকে সারাদিন কিছু খেতে দেওয়া হয় নি। ভুলেছিল নিজে কিছু খায় নি এবং দেখতে পায়নি কখন রাস্তার কুকুর রসুই ঘরে ঢুকে সব কিছু খেয়ে আর ছড়িয়ে সরে পড়েছে।

চমকে জেগে ওঠে নৈয়ারা। কত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আবদুলের শীর্ণ দেহটা। কী যেন বলছে।

—কী আব্বাজান?

—চল বেটি উঠে পড। যেতে হবে।

—কোথায়?

—ভাতারমারি। তোর বাপের কাছে, দেরি করিস্‌নে।

—কিন্তু সে যে অনেকদূর, আব্বাজান।

তবু যেতেই হবে বেটি। নইলে খাবি কী? পরবি কী? সরকারের দশ টাকার দয়ায় তোদের চলবে না রে। আল্লা সরকার।

ছিলনা কিছুই আর নিতেও পারেনি। সবকিছু পিছনে ফেলে চাঁদের আলোয় স্বপ্নালোকে পথ চলতে চলতে যখন পথ চলার ক্লান্তিতে হাঁটু ভেঙে থর থর করে কাঁপছিল আবদুল, আর বুকের মাঝে ঘুমন্ত শিশুটা যখন হঠাৎ ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল, তখন শুধু সেই সময় একবার বুক কেঁপে উঠেছিল তার। শুভ্রাকাশের বিষণ্ণ জ্যোতি ম্লান সিতকরের দিকে তাকিয়ে কোনদিন যা বলেনি, কখনো যা বলতে হবে ভাবেনি, সেই প্রশ্ন করেছিল—এ আমাদের কী করলে আল্লা?

আল্লার দরবারে সে আবেদন পৌঁছায়নি। শুধু নৈয়ারার ঘন চুলের মতো কালো কালো মেঘের স্তবক এসে ঢেকে দিয়েছিল চাঁদের মুখ। নক্ত বাতাসে কেঁপে উঠেছিল শিরীষের পাতা। তম্‌জার মাঠে প্রহর ঘোষণা করেছিল শিবাকণ্ঠ। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজতেই আর্মি কোয়ার্টার্সের সাদা সাদা তাঁবুগুলি বুঝেছিল কার ডিউটি শেষ হল এবং বন্দুক কাঁধে বাকী রাতটুকু জেগে থাকবার জন্য কে তৈরী হল।

পালঙ্কের নরম শয্যায় বড় সাহেব উদ্দালক বসু হয়তো ঘুমিয়ে ছিলেন তখন আর শিলিং পাখার হাওয়া যখন তাঁর দেহ ও মনকে জুড়িয়ে দিয়েছিল, হয়তো সেই সময় তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন—একটি নারী মূর্তি ক্রমশ তাঁর চেতনা আচ্ছন্ন করে চলেছে তুহিন কবরে ঢাকা শীতের সিমলার কোন দূরন্ত যৌবনা নয়। মেয়ে কলেজের বাংলার প্রফেসর স্বপ্না রায়ও নয়। মালবিকা সেন।

নবনীতা দেবসেন

১৯৩৮ সালে নবনীতা দেবসেনের জন্ম। প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সমালোচক নরেন্দ্র দেবের কন্যা নবনীতা দেবসেন।

প্রথম গল্পের স্মৃতি / নবনীতা দেবসেন

প্রথম গল্প লিখতে শুরু করি ছোট্টবেলায়। একা বাড়িতে একলা বাচ্চা, কিছু করার থাকতো না, কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে যেতুম গল্প বানাতে। একটা শূন্য ফাঁকা রাজপ্রাসাদে একটা একা রাজকন্যের গল্প।

কিন্তু প্রথম বড়দের জন্য গল্প লিখি শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁর সম্পাদিত "নববর্ষ" পত্রিকার জন্য। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি।

মাত্র ১৬/১৭ বছর বয়স তখন আমার। গর্বে ফেটে পড়ছি। ইতিমধ্যে বাড়িতে আমার মায়ের নামে একটা উড়ো চিঠি এলো। তাতে বানানের বাবা-মা নেই, ভাষাতেও আমাদের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধৃত। এমনি চিঠি—"ব্যাটা রাধারাণী দেবী! ভেবেছ যে কচি মেয়ের নামে গল্প লিখে দিয়ে আমাদের বাড়ির কেলেঙ্কারী সব ফাঁস করে দেবে? আমরা কি জানি না ও কীর্তি তোমার? ভালোবাসার একখানা কাঁচও আস্তো থাকবে না, আরেকবার লিখে দেখো!"—মা তো ভয়েই সারা। প্রায় কাঁদো কাঁদো। কে লিখলে এমন চিঠি? কাদের বাড়ির কেলেঙ্কারি ফাঁস করেছে খুকু? আমিও বোকা বনে গেছি। গল্পটা তো বানানো। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।—"দূর ছাই, আর গল্প লিখবো না"—ঠিক করে ফেললুম। বড্ড ঝামেলার ব্যাপার। সত্যি যদি কাঁচ ভেঙে দেয়? তা ছাড়া মা তো শুধু শুধুই অপমানিত হলেন আমারই জন্য।

ইতিমধ্যে এক রবিবারের আনন্দবাজারের পাতায় আমার "স্টেট এক্সপ্রেস" গল্পটাও বেরিয়ে পড়ল। সেই প্রথম ও শেষ। আর গল্প লিখিনি।

লুনাপিসিকে দেখতাম। ছোট্ট মুন্টিকে কোলে করে আয়া এসে উঠতো ড্রাই-ভারের পাশে, রায়বাহাদুর নিজে হাতে ধ'রে লুনাপিসিকে তুলে দিতেন ভেতরের সীটে, নিজেও উঠে বসতেন পাশে। নেপালী দারোয়ান সেলাম ঠুকে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিতো। মার্সিডিস বেনস্ ছুটতো লেক, ভিক্টোরিয়া বা স্ট্রাণ্ডের দিকে। প্রতি রবিবারে।

লুনাপিসি-শামলা রঙ, আশ্চর্য মায়াভরা দুটি চোখের সবটুকুই ঘন পল্লবের ছায়ায় আঁধার। কোঁকড়া চুল টুলটুলে মুখখানি ঘিরে উড়ছে, অজন্তা-ঠোঁটে মিষ্টি হাসি, একটু বিষণ্ণতার ছোঁয়ায় আরো মিষ্টি। সারামুখটাই যেন একফোঁটা টলটলে অশ্রু।

লুনাপিসিকে সবাই ভালবাসতাম আমরা ছোটোরা। তাঁর স্বভাবটাও ছিলো চেহারার মতোই মিষ্টি আর আকর্ষণীয়া। আমরা বেড়াতে বেরুলে বারান্দা থেকে ডেকে খবর নিতেন বাড়ির সকলের। চকোলেট দিতেন নিজে থেকে। ছোট্টখাট্ট লুনাপিসিকে কেমন যেন মানাতো না কাঁচা পাকাচুলের ভারিক্কী মানুষ রায়বাহাদুরের পাশে। শৈশবেও এটা চোখে ঠেকতো। বিশেষ করে লুনাপিসির দুই ছেলে তো মস্ত মস্ত। একজন ইঞ্জিনীয়ার আরেকজন ডাক্তারী পড়ে। কে বলবে লুনাপিসি ওদের মা বোন নয়।

লুনা-ভিলার কার্পেটের মতো লনে একদিন প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল বাঁধা শুরু হোলো। লালনীল আলোর মালা, আর সাহেবদের ব্যাণ্ডবাজনার মধ্যে মহা ধুম করে বিয়ে হয়ে গেল লুনাপিসির বড়ো ছেলের। আমরা খুব সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেলাম, তারপর বৌ নিয়ে ছেলে চলে গেল তার চাকরীর জায়গায়, বেহারে কোথায় যেন। ক'দিনের মধ্যেই ছোটো ছেলেও ডাক্তারী পাশ করে বিলেত চলে গেল। তার যাওয়া উপলক্ষ্যে আরেকবার নেমন্তন্ন জুটলো আমাদের।

পাড়ায় বিশেষ মেলামেশা না করলেও, আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসতেন লুনাপিসি। ছেলেরা চলে যাবার পরে সেটা নিয়মিত হয়ে দাঁড়ালো। এক একদিন রাত সাড়ে ন'টা দশটায় আসতেন, পলকা শিফনশাড়ী জড়িয়ে কাঁধকাটা ব্লাউজ পরে নামতেন একটা ট্যাক্সী থেকে। কথায় কথায় খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়তেন সোফার ওপরে। সেই ককাভঙ্গীর ঠোঁটে এ-হাসি যেন মানাতো না। ছেলের বিয়ের পরে লুনাপিসি খুব হাসখুসি হয়ে উঠেছেন। মুখখানাকে মনে হোতো যেন রসে টুলটুলে একটা কাবলী আঙুর।

মিনিট পাঁচেক হাসগল্প ক'রেই বাড়িতে ফোন করতেন, আমাদের বাড়ি দারোয়ান পাঠাতে। দারোয়ান আসতো, লুনাপিসি চলে যেতেন। মা কেমন একরকম করে

বাবার দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'লুনা বুড়ি ছুঁয়ে গেল।' আমরা কিছু না বুঝেও হাসতে চেষ্টা করতাম, মায়ের বকুনি খেয়ে চুপ করে যেতে হোতো।

হঠাৎ বুড়ি ছুঁতে আসা বন্ধ হয়ে গেল লুনাপিসির। রবিবার বিকালে রায়বাহাদুরের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়াও চোখে পড়ে না। একদিন দুপুরে মায়ের ঘরে এসে দেখি লুনাপিসি খুব কাঁদছেন মায়ের কোলে মুখ গুঁজে। মা নীরসমুখে চুপচাপ অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা ঢুকতে ইঙ্গিতে বললেন চলে যেতে। আশ্চর্য হয়ে পাশের ঘর থেকে শুনলাম লুনাপিসি বললেন,—'অসহ্য হয়েছে বৌদি, সবসময়ে পাহারা বসিয়েছে ঐ আয়াটাকে, একপা নডবার যো নেই। কোন্‌দিন ঠিক গলা টিপে মেরে ফেলবো ওটাকে'—মার কণ্ঠস্বর থেকেই তাঁর সিউরে ওঠা বুঝতে পারি—'সে কি চুপ চুপ, পাহারা আবার কি। ছি, ও তোমার মনের ভুল।' কিন্তু, তখুনি মুন্টিকে নিয়ে মাদ্রাজী আয়া হাজির।—'মাইজী হ্যায় ?'

—'ওই দেখুন, ওই এসেছে শয়তানী'—

—'বাবা রোতা হ্যায়।' নির্বিকার উক্তি আয়ার।

—'পেটের মেয়েটা পর্যন্ত আমার শত্রু, বুড়োবয়সে কী যে কান্না রোগে পেয়েছে ওকে।'

মুন্টি তখন বছর চারেক। আয়া মুন্টিকে লুনাপিসির কোলে চাপিয়ে দিলে প্র জোর করেই, আর মুন্টিও কান্না থামিয়ে ফেল্লে। লুনাপিসির মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠি। কঠিন আক্রোশে তিনি একদৃষ্টি তাকিয়ে আছেন কোলের সন্তানের দিকে। শিশুর কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই, মার কোলে বসে বসে আধো আধো বুলিতে মহানন্দে গল্প সুরু করেছে সে আমাদের সঙ্গে। মা প্রায় ধমক দিয়ে লুনাপিসিকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন সেদিন।

কিছুদিন পরে শুনি লুনাপিসির খুব অসুখ করেছে, তাঁকে কলকাতার বাইরে কোথায় চেঞ্জে পাঠিয়েছেন রায়বাহাদুর। মুন্টি আর আয়াও গেছে সঙ্গে। আ গেছেন মুন্টির দিদিমা।

মাস পাঁচ-ছয় পরে একদিন দেখলাম রায়বাহাদুরের হাত ধরে গাড়ীতে উঠছে সিফনশোভনা লুনাপিসি। আয়ার হাত ধরে মুন্টি টা-টা করছে গেট থেকে। নাচতে নাচতে মাকে গিয়ে বললুম—'ও মা, লুনাপিসি সেরে গেছেন, জানো ?' একটুও অবা না হয়ে মা বুনতে বুনতেই বললেন—'বেশ হয়েছে, যা এখন।' এমন একটা চমকপ্র খবরে মায়ের নির্লিপ্ত অসহ্য নিষ্ঠুর লাগলো।

লুনাপিসির স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠলো আবার। রাত ন'টা দশটায় আমাদে বাড়ীতে বুড়ি ছোঁওয়াও আরম্ভ হলো। তখন স্কুলের ওপর দিকে পড়ি, অল্পদিনেই বুঝে পারলাম বড়োরা কেউ পছন্দ করেন না লুনাপিসিকে। এমন সময়ে তাঁর ডাক্তার ছে বিলেত থেকে ফিরলো সঙ্গে এক মেম-বৌ। ইংলণ্ডের কোনও সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল আইরিণ বৌদির। একটি বাচ্চাও হোলো ওদে ধবধবে সুন্দর। মুন্টি তার মেমবৌদির সঙ্গে প্র্যাম ঠেলে ঠেলে বাচ্চা ভাইপো নিয়ে বেড়াতে যেতো। পিছন পিছন চলতো দুই আয়া, গল্প করতে করতে।

তখন আমরা ম্যাট্রিক পাশ করেছি, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, পাড়ায় যেন বেশি
শি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠেছেন লুনাপিসি। সবাই যেন কী আলোচনা করে, আমরা
উ গিয়ে পড়লেই চুপ করে যায়। তবুও আমরা বুঝতে পারি, ব্যাপারটা হোলো
নাপিসি আর মুন্টির বড়ো বৌদির ভাইকে জড়িয়ে। বড়ছেলের বিয়ে হয়ে অবধি
নাপিসির করুণ বিষণ্ণ ভাব কেটে গিয়ে স্ফূর্তির তীব্রতা এসে গেছে, কারুরই তা চোখ
ায়নি। লুনাপিসির বুড়ি ছোঁওয়ার রহস্য এখন আমাদের কাছে পরিচ্ছন্ন। বডবৌদির
ইয়ের সঙ্গে লুনাপিসিকে মেট্রোয়, মার্কেটে সবাই দেখতে পায়। আজকাল আর
ড ছুঁয়ে যাবার দরকার হয় না। অশোক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। পরবার খরচ শুনতে
ক লুনাপিসিই যোগাচ্ছেন। ছেলেটির রূপ আছে, রূপো নেই। রায়বাহাদুরের সঙ্গে
বিবার বিকেলে বেরুনো অনিয়মিত হতে হতে বন্ধই হয়ে গেল একসময়ে।

এমন সময়ে একদিন এক পাগল-পাগল-চেহারার গোয়ানিজ এসে হাজির 'লুনা
ভলা'তে। তার স্ত্রী নাকি এখানে পালিয়ে এসেছে। প্রথমে তাকে গুর্খা দারোয়ানের
লের গুঁতোয় তাড়িয়ে দেওয়া হোলো। সে তখন পাড়াশুদ্ধ চেঁচামেচি করে বলে
বড়াতে লাগলো। ওই আইরিণ তার বৌ। তিনটে ছেলেমেয়ে ফেলে রেখে এ বাড়ীর
াক্তার ছেলের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে সে। এতদিন ধরে খুঁজে, শেষে সন্ধান পেয়েছে;
ার বৌ চাই। মুন্টির ছোড়দা বৌ এনেছে বম্বে থেকে, বিলেত থেকে নয়। দুই
কেটে নোটের গোছা গুঁজে দিয়ে রায়বাহাদুর লর্ডবংশীয়া পুত্রবধূর গোয়ানিজ স্বামীর
াল্লা থেকে উদ্ধার পেলেন। কিন্তু এ আঘাতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো হার্টের অসুখে
য্যা নিলেন। পাড়ার সবাই বললে—'যেমনি নিজের বউ, তেমনি ছেলের বউটা,
ায়বাহাদুর আছে ভালো।'

লুনাপিসি অশোকের কোন বন্ধুর ভাঙা ঝড়ঝড়ে গাড়ীতে চড়ে বেরিয়ে যান,
ফরেন রাত এগারোটা বারোটায়। মানসিক সংঘাতে রায়বাহাদুর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে
ড়েন। বড়ো বড়ো ডাক্তার আসে, তবু একদিন শুনি রায়বাহাদুর মারা গেছেন। খুব
াড়ম্বরের সঙ্গে শ্রাদ্ধ হোলো। লুনাপিসি একটা কালো পাড় শাড়ী পরে বিষণ্ণমুখে
ুরে ঘুরে বেড়ালেন, আর রায়বাহাদুরের ছবির পাশে, নাকে নথপরা এক ভদ্রমহিলার
বিও ফুল দিয়ে সাজানো হোল। যথাসময়ে জানলাম, তিনিই মুন্টির দাদাদের মা।
ুনাপিসির মেয়ে কেবল মুন্টি।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলেও বড়দা রয়ে গেলেন। শুনলাম সম্পত্তি ভাগাভাগি হবে।
ড়ো বড়ো উকিল ব্যারিষ্টার এলেন, সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল। সময় নষ্ট না করে বড়দা
বহারে চলে গেলেন। ছোড়দাও মেমবৌ আর ছেলে নিয়ে সাহেবপাড়ায় কোন ফ্ল্যাটে
ঠে গেলেন। 'লুনা-ভিলা' পড়েছে লুনাপিসির ভাগে। এত বড়ো বাড়িটায় রইলো
শুধু দুজন—লুনাপিসি আর মুন্টি।

কিন্তু সে ক'দিনের জন্য মাত্র। অশোক তারপরে এখানেই থাকতে সুরু করলে।
পাড়ায় ছি-ছি-র কিছু বাকি ছিলো না। এবারে লুনাপিসির সঙ্গে সঙ্গে মুন্টিও একঘরে
হয়ে গেল। মুন্টির বয়স হয়েছে বছর এগারো বারো, বাড়ন্ত গঠন আর গম্ভীর স্বভাবের
জন্য আরো বড়োই লাগে। লুনাপিসি লাল নীল শাড়ী পরে' ছোট অস্টিনটায় বেড়াতে

বেরোন। বড় গাড়ী দুটো দুই ছেলে নিয়ে গেছে। পাড়ার লোকে বলে—'বুড়ির সখ কতো।' বুড়ি? লুনাপিসি?—পুতুলের মতো একরত্তি মানুষটি, উড়োচুলের ঢেউ ঘেরা মুখখানি রসালো আঙুলটির মতো টুলটুল করছে!

হঠাৎ শোনা গেল, অশোক পালিয়েছে? পাশ করতেই বিলেত চলে গিয়েছে লুনাপিসির টাকায়, কথা ছিলো লুনাপিসিও সঙ্গে যাবেন—সকন্যা। সব টাকাকড়ি নিয়ে কিন্তু অশোক একাই পালিয়েছে। পাড়ার লোকে বললে—'বেশ হয়েছে।'

লুনাপিসির মাস ক'য়েক মুখভার দেখলাম। তারপর 'লুনা-ভিলা' আবার আলো ঝলমল্। সন্ধ্যা থেকেই ছোট বড়ো গাড়ী আসে যায়, হৈ হৈ হাসি, বিলিতি রেকর্ডের হুল্লোড়, শেষে 'লুনা-ভিলা' স্তব্ধ হয়। কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে থাকে একটা নতুন ক্রাইস্লার। বারোটা সাড়ে বারোটায় তীব্র হর্ণ দিয়ে বেরিয়ে যায় লুনা-ভিলার আঙ্গিনা থেকে। ক্রমশঃ ক্রাইস্লারটা যখন তখন আসতে সুরু করলো, আর সন্ধ্যাবেলার হুল্লোড় কমতে লাগলো। কখনো দুপুরবেলা বারান্দায় দাঁড়ালে হয়তো দেখতে পাই এক ধবধবে ফর্সা লম্বাচওড়া ভদ্রলোক লুনা-ভিলার ঢাকা বারান্দার সোফায়, পাশে লুনাপিসি হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। গাড়ীবারান্দার নীচে ক্রাইস্লার অপেক্ষা করছে।

আর মুন্টি। প্রায় শাড়ি ধরো ধরো হয়েছে। গম্ভীর মুখে স্কুলে যায়। ফিরে আসে। লনে বেড়ায় একা একা। কারুর সঙ্গে মেশে না। মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজায়। শুনতে পাওয়া যায় রাস্তা থেকে। মায়ের ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায় বলেই মনে হয় না। আমিই একদিন ছোড়দিকে বলে ফেললাম—'লুনাপিসিটা কী? বাড়িটাকে ক্লাবের অধম করে ফেলেছে—মুন্টিটা বড়ো হচ্ছে তো, একটু জ্ঞানগম্যি নেই' ছোড়দি বললে—'থাম তুই? যেমন মা, তেমনি মেয়েও হবে দেখিস। যে বাড়িতে জন্ম!'

একদিন শুনতে পেলাম মুন্টি মারা গেছে। হ্যাঁ—ছাদ থেকেই লাফ দিয়ে পড়েছিলো, নরম ঘাসঢাকা সবুজ লনে নয়, পীচ ঢালা রাস্তার ওপরে। শান্তশিষ্ট গম্ভীর মেয়েটি—ছোটো বেলায় আয়ার কোলে চড়ে গাড়ীতে উঠতো। মেমবৌদির সঙ্গে প্র্যাম্ ঠেলে বেড়াতে যেতো, সুন্দর পিয়ানো বাজাতো, বাড়ির হৈ-চৈ থেকে তফাৎ করে রাখতো নিজেকে। ছোড়দি তাকে বলেছিলো ঠিক মায়ের মতন হ'বে।

মাসখানেক ধরে উসখুস করে লুনাপিসির বাড়িতে গিয়েই পড়লাম এক দুপুর বেলায়। দারোয়ান দরজা খুলে দিলো। ওপরে উঠে গেলাম ঠাণ্ডা মার্বেলের মেঝে মাড়িয়ে। একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে যেন সেই স্তব্ধতা নষ্ট হয় ধূসর, শীতল, অন্ধকার শান্তি যেন বাড়ীটার গলা টিপে রেখেছে।

ফিটফাট সাজানো সুন্দর বাড়িখানার ভিতরটাও ছবি। খুঁজে খুঁজে শৈশবের পরিচিত দরজাটায় আস্তে টোকা দিই।

'কে ? এস, ভেতরে এস।' কি মিষ্টি গলা, ঠিক সেই আগের মতো যখন লুনাপিসি বলতো—'চকোলেট খাবি।'

দরজায় ঠেলা দিলাম, চোখটা সিগ্ধতায় ধুয়ে গেল। হালকা সবুজ আলো ঘরময়। সিল্কের সবুজ পর্দার ভেতর দিয়ে কাঁচ গড়ানো রোদের সামান্য আভায় ঘরটা উদ্ভাসিত। দেওয়ালে সবুজ ডিস্টেম্পার, দামী সবুজ মার্বেলের মেঝে। মেহগনির খাটে সবুজ চাদর বিছানো। ওমা! তুই? আয় আয়! উচ্ছল হয়ে উঠলেন লুনাপিসি। কেমন আছি? মা কেমন আছেন? বাবা? বড়দির বাচ্চাটা কত বড়ো হলো? ছোড়দির বিয়ের কতদূর? আমার কোন ইয়ারে হোল? কেন আসি না লুনাপিসির কাছে?

ভেবেছিলাম, খুব অস্বস্তি বোধ করতে হবে। সদ্য সন্তান শোক কি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। তা ছাড়া, জানেন তো সবই। পাড়ায় কতো সুনাম!

কেন আসি না। এই প্রশ্নটিতেই ঘায়েল হয়ে পড়লাম। কেন আসিনি এতোদিন লুনাপিসির কাছে, এত বছর। উত্তর দিতে পারলাম না। বললাম, 'এই তো—এসেছি তো'।

লুনাপিসি কথা ঘুরিয়ে নিলেন। রান্না বান্না করতে হচ্ছে, বাবুর্চি নেই, ছোড়দার বাচ্চাটার টাইফয়েড হয়েছে, আইরিণের আরেকটা মেয়ে হয়েছে, আরো সুন্দর অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন তিনি। মুন্টির উল্লেখ নেই কোথাও। ঘরে একটা ছবিও দেখলাম না মুন্টির। ম্যান্টলপিসের ওপরে রায়বাহাদুরের ছবি একটা আছে বটে, আর আছে বেডসাইড টেবিলের কাঁচের নীচে এক দুর্দান্ত সুপুরুষের হাসিমুখ।

আমিও ভয়ে ভয়ে আছি। মুন্টির প্রসঙ্গ পাছে উঠে পড়ে। উঠলোও। লুনাপিসিই তুললেন।

—'তোরা আসিস না, ঘেন্না করিস বলে, সবাই বারণ করে লুনাপিসির কাছে যেতে, তাই না? সত্যি তো, পরের বাড়ির লোকেই আমায় মন্দ ভাবে, আর বাড়ির লোকে ভাববে না। মুন্টিটাও ঘেন্না করতো আমাকে। তাই মরেই গেল মেয়েটা। আমায় ভালোবাসতো বিনা বড্ডো - ওর সহ্য হোত না মায়ের হাবভাব। সিলি চাইল্ড। ওয়াজন্ট্ ইনাফ্ গ্রোওন্ আপ টু টেস্ট দ্য ওয়াইন অব লাইফ। তাই ভাবলে মা-টা বী! কাপুর স্পেন্ট এ নাইট হিয়ার এ্যাণ্ড শি বিল্‌ড হারসেল্ফ্ ফর দ্যাট। ম্যুর চাইল্ড।'

স্তম্ভিত হয়ে বসে আছি। চোখ ডুবে আছে শ্যামল আভায়, সবুজ শয্যায় একটি শামলা শরীর—ছায়াছায়া পাপড়ি ঘেরা মমতাভরা চোখের ওপরে স্বচ্ছ বরণ পর্দা ভারী হয়ে জমে উঠছে— সেই আগের মতো, অজন্তা ঠোঁটের বাঁকে একটা ছোট্ট ভাঁজ, সমস্ত মুখখানা যেন টলটলে এক ফোঁটা অশ্রু।

হঠাৎ মনে পড়লো ঘুমন্ত পুরীর একমাত্র জাগ্রতা রাজকন্যার সেই রূপকথা। একটি পুতুল-মেয়ে আধ-শোয়া হয়ে এলিয়ে আছে পালঙ্কে, পাশে নিয়ে আরাধ্য রাজপুত্রের আলেক্ষ্যপট। ঘরটা যেন স্বপ্ন। এমন সময়ে পাশে-রাখা ফোন রিন্ রিন্ বরে বেজে উঠলো, নীচু সুরেলা ঝঙ্কারে, স্বপ্নের ঘোর কাটলো না, বেড়ে গেল যেন।

নরম একটি ছোট্ট হাত চঞ্চল হয়ে নেমে এলো, রিসিভার ছুঁলো, তারপর মধুর, অতি মধুর সুর শুনলাম—'বলো'—। রাজপুত্রের পক্ষীরাজ নেমেছে বুঝি প্রাসাদের ছাদে—লুনাপিসির নীচু নরম গলা শুনি: 'তুমিই বলোনা।' তারপর অল্প হাসি এক ঝলক।

রাজা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়—রূপকথার রাজকন্যা, যে বালিকা থাকে না, কখনো প্রৌঢ়াও হয় না—চিরযৌবনা সেই প্রিয়ামূর্তি।

—'লুনাপিসি, যাই।'

ফোন ধরেই মুখ তোলেন লুনাপিসি, চল্লিশোত্তর লুনাপিসি।—'যাই কিরে, ব আসি। আবার আসিস কিন্তু একটু থেমে যোগ করেন – যদি আজ বাড়ীতে বকুনি ন খাস।' তারপর তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—'দাঁড়া, চকোলেট দিই।' 'না—না' বলা আগেই ড্রয়ার ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে রঙিন কৌটো—'নে, কতোদিন খাসনি আমা কাছ থেকে?'

লুনা-ভিলা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হোলো যেন চোখটা জ্বাল করছে। হয়তো মনেরই ভুল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৯১৬ সালে ফরিদপুর জেলার সদরদী গ্রামে সুসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম। মহেন্দ্রনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই। কবিতা দিয়ে নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবন শুরু। ১৯৩৬ সালে দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মূক'। জীবনের অনেকগুলি বছর তিনি চাকরি করেছেন একাধিক অফিসে। ব্যাঙ্কেও চাকরি করেছেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চাকরি করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। আনন্দবাজারের সহকারী সম্পাদক ছিলেন তিনি।

বহুকাল পরে মনটা আবার দেশের দিকে ছুটল। আজ পাঁচ বছর বাড়ী যাইনে। এই পাঁচটা বছর ভবঘুরের মত শুধু ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিয়েছি।

ভারতবর্ষে না গিয়েছি এমন স্থান নেই। আজ কতকাল পরে বিমুখ মনটাকে আবার যেন কে বাড়ীর দিকে টানতে আরম্ভ করেছে। কে আবার টানবে? তিনকুলে এক বুড়ী পিসীমা ছাড়া আর কেই বা আছে? সেই যে সতের বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিসীমা আমাদের সংসারে প্রবেশ করেছিলেন, আজ পর্যন্ত বের হবার পথ পেলেন না। এই সুদীর্ঘ জীবনে কত জন্ম, কত মৃত্যুই না তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে কতজনেই না আসা-যাওয়া করল। কিন্তু তিনি সেই যে এসেছিলেন আর যেতে পারেন নি। এখনও ঐ সংসারকেই আঁকড়ে ধরে তাঁকে পড়ে থাকতে হয়েছে। সংসার মানে—একটা ভাঙা বড় আটচালা টিনের ঘর আর বুড়ি-গাই বুধী। বুধীর অবস্থাও পিসীমার মতই। বাবার কোন বন্ধু তাঁকে এই গরুটি উপহার দিয়েছিলেন, খুব দুধাল জাত বলে। কিন্তু ওর দুধ যে কেমন তার স্বাদ পাওয়া আমাদের কারও ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। বছর বছর গরুটার একটি করে বাছুর হত আর কয়েকদিন থেকেই মরে যেত। আমাদের বাড়ীর মৃত্যুর ছোঁয়াচের স্পর্শ ওর বংশেও লেগেছিল বুঝি! বাছুর মরে গেলে ওর দুধ আর কাউকে বাবা খেতে দিতেন না।

গরুটার প্রসব বহুকাল বন্ধ হয়ে গেছে। পিসীমা তবুও ওকে ছাড়িয়ে দিন না—বাবার একটা স্মৃতিচিহ্ন বলে বোধহয়। কিন্তু বাবার স্মৃতিচিহ্ন বাড়ীটায় কোথায়ই বা নেই। ঐ কুয়াটার পাড়ে বসে তিনি প্রত্যহ হাত মুখ ধুতেন। যে গাছের বাকলখানার উপরে বসে ধুতেন, সেখানা এখনও তেমনি অক্ষয় হয়ে রয়েছে! যে খড়ম-জোড়া তিনি প্রতিদিন ব্যবহার করতেন এখনও তা হয়ত আত্মগোপন করে আছে। বেতের ছিলকে দিয়ে দাঁত খুঁটবার কতকগুলি খড়কে করেছিলেন। ছোট একটা বাঁশের চোঙে করে বাইরের বেড়ায় সেগুলি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন,—পিসীমা সেগুলিকে ঘরে নিয়ে রেখেছেন। আসার সময় দেখে এসেছিলেন খড়কের চোঙটা বেড়ায় ঠিক তেমনি ভাবেই ঝুলছে। হয়ত আরও পঞ্চাশ বছরে ওর কিছুই হবে না। ওটা দীর্ঘস্থায়ী মানুষের চেয়ে! কাকা, দাদা, বন্ধু, বিশু, এমন কি—দাদার মেয়ে তিন বছরের টুনির ছোটখাট কত স্মৃতির টুকরো বাড়ীখানি আঁকড়ে ধরে আছে, শুধু তাদেরই ধরে রাখতে পারল না।

মায়ের কথা আমার একটুকো মনে পড়ে না। শুনেছি, আমার বছর খানেক বয়সের সময় তিনি মারা যান। তাঁর অভাব জীবনে আমি কখনও বোধ করিনি,—পিসীমার জন্য মানুষের যে মা থাকে, আর জীবনে তার কোন প্রয়োজন হয়, একথা আমি বহুকাল জানতেম না।

গাড়ীটা একটা ষ্টেশনে এসে থামল। অস্পষ্ট আলোকে নাকটা ঠিক পড়া গেল না। পড়ার প্রয়োজনও ছিল না। ও তো বসন্তপুর। এই ষ্টেশন দিয়ে কতবার যাওয়া-আসা করেছি। তবে প্রতিবারই বাড়ীর কেউ-না-কেউ সঙ্গে ছিল। আজ একা। বিশুর মৃত্যুর রাত্রে যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে আসি— সেদিনও একাই ছিলাম।

আর একটা ষ্টেশন। এর পরেই আমাদের বাড়ীর ষ্টেশন। পিসীমা কি করছে এখন? এত সকালেই ঘুমোতে যায়নি! হয়ত পান ছেঁচছে বসে বসে। পাঁচ বছর কোন খোঁজ রাখিনি। এতদিন বেঁচে আছে তো। বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। পিসীমা মরতে পারে না।—তা হ'লে কষ্ট ভোগ করবে কে? তার কষ্টই বা কি? পিসীমার আজকাল আর কোন দুঃখ-যন্ত্রণা হয় না কিছুতে। অভ্যাসে সব সহনীয় হয়ে গেছে। মৃত্যু আর পিসীমাকে কোন আঘাত করতে পারে না। বিশুর মৃত্যুতে এক ফোঁটা চোখের জলও পিসীমা ফেলেনি। আমি আর পাড়ার কয়েকটা ছেলে বিশুকে যখন শ্মশানে নিয়ে গেলাম—পিসীমা আপন মনে বসে বসে পান ছেঁচছিল!

ষ্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী খুব বেশী পথ নয়। আধ মাইলের বেশী হবে না। রাস্তাটা দেখলাম আরও ভালো করে বাঁধান হয়েছে। রাতটা অন্ধকার। কিন্তু সঙ্গে টর্চ আছে, কোন অসুবিধা হবে না। ধোপাবাড়ী, বিশ্বাস বাড়ী আর চক্রবর্তীদের বাড়ীর উপর দিয়ে গেলে পথ অনেকটা সোজা হয়, কিন্তু কোন বাড়ীর উপর দিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'ল না। যদি কেউ জেগে থাকে, বা পায়ের শব্দে আর কুকুরের ডাকে জাগে আর আমাকে দেখতে পায়, তবে তাদের বিস্ময় আর কৌতূহলের অন্ত থাকবে না। সে কৌতূহল নিবৃত্ত করবার আমার বর্তমানে ধৈর্যও নেই, উৎসাহও নেই, তাই রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরেই গেলাম।

বড় আটচালা টিনের ঘরটা অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কত অর্থ ব্যয়ে ঘরগুলিকে তোলা হয়েছিল, এক-একজনের মৃত্যুর সঙ্গে এক-একখানা ঘরকে ভেঙে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। কারণ, যে ঘরে থাইসিসের রোগী মরে, সে ঘরে আর বাস করা উচিত নয়। আর বাস করবেই বা কে?

টর্চটা ফোকাস্ করে একবার ঘরের উপরে ফেললাম, ব্যাটারীর তেজ বেশী ছিল না। ম্লানালোকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখলাম। আরও কয়েকবার ফোকাস্ করে বাড়ীর চারদিকটা দেখলাম। কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে গায়ের লোম শিউরে উঠতে লাগল, একি ভয়? পিসীমাকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে কথা বের হতে চায় না। পিসীমার পান ছেঁচার শব্দও ত আর শুনতে পাইনে! এ জন্মের মত বুড়ী তাহলে পরিত্রাণ পেয়েছে?

হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

—"কে—কে ওখানে ?"

পিসীমার গলা। অন্ধকারেই এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'আলো জ্বাল পিসীমা,—আমি নন্তু।'

পিসীমা অন্ধকারেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'নন্তু।'

দিনকয়েক কাটল গ্রামবাসীদের কৌতূহল মেটাতে। কোথায় কোথায় গয়েছিলাম, কোন জায়গাটা কেমন—কোথায় কোন দেবমন্দির, কোথায় কোন বিগ্রহ কোথাকার কত ভাড়া, এইসব। একজন বললেন, 'শুনেছি কাশীতে কপি নাকি খুব সস্তা ? নিয়ে এলেই পারতিস কয়েকটা সঙ্গে করে।' পালেদের বাড়ীর জেঠাইমা বললেন, 'বেশ নন্তু, বেশ, ফিরে এসেছ—খুব সুখী হয়েছি তাতে। শত হলেও বাপ-মার ভিটে।—এর মায়া কি এড়ান যায় ? যারা গেছে, তারা ত গেছেই। এইবার বিয়ে-থা করে গৃহস্থ হও, বাপের ভিটেয় প্রদীপ জ্বলুক। তোমার পিসীর কথা আর বল না, সন্ধ্যা হলে যে একটু সন্ধ্যা দেবে তাও না, ঘরটা মাস অন্ধকারেই পড়ে আছে। এমনি কিপ্পিন।'

তিনি উঠে গেলে পালেদের বাড়ীর রাঙা ঠাকুরমা বললেন, 'খুব দরদ দেখিয়ে গেলেন। এদিকে আমটা, জামটা, সুপারিটা নিয়ে বুড়ীর সঙ্গে অহর্নিশ ঝগড়া। বুড়ীকে ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না।'

পিসীমার নামে আরও অনেক অভিযোগ শোনা গেল। একজন অভিমানী কণ্ঠে নালিশ জানালেন, 'তোমার বাবা থাকতে নন্তু, এ বাড়ীর কত কি হ'ত, আমরা খেয়েছি। অমন মহৎ লোক আর গ্রামে হবে না নন্তু। একথা আমরা প্রত্যেকেই বলাবলি করি। সেদিন এই বাড়ীটার ওপর দিয়ে যেতে যেতে—ইদানং এ বাড়ীতে ত আমি বড় একটা আসিই না, আসলেই বুকটার ভিতর কেমন খাঁ-খাঁ করে ওঠে—হাঁ যেতে যেতে দেখি কোণের ওই গাছটার কুলগুলি সব পেকেছে। ছেলেটা ছিল সঙ্গে বললে—বাবা, একটা কুল। দুটো কুল ছিঁড়ে ছেলেটার হাতে দিয়েছি, অমনি বুড়ী দেখতে পেয়ে তেড়ে যেন মারতে এল। বাপ রে, বাপ। জিহ্বায় যে কি বিষ এ-বিষেই ত এত বড় সংসারটা শ্মশান হয়ে গেল।'

ছেলের দল এসে বলল—'তারা থিয়েটারের রিহার্সেল দেবার জন্য ঘরট চেয়েছিল। বুড়ী তা দেয়নি। আর এমন সব গালাগালি করেছে যা ভদ্রলোকে মুখে আনতে পারে না।'

মনে মনে ভাবি—মৃত্যুই পিসীমার পরম আত্মীয়।

জীবনকে বুড়ী কি করে সহ্য করছে ?

আরও কয়েকদিন কাটে। হঠাৎ বুড়ী সেদিন বলল, "সুলুকে একবার দেখে আয় নন্তু। তাকে আর এই যমপুরীতে আনতে চাইনে। তুই নিজে গিয়ে একবার তাকে দেখে আয়—কেমন আছে। কতকাল যে তার কোন খবর পাইনি !"

জিজ্ঞেস করলাম, "সুলু কে ?"

"সুলু কে চিনতে পারলি নে ? কোলে-পিঠে করে সে তোকে মানুষ করেছে—"

ওঃ, পিসীমার একমাত্র মেয়ে সুলতাদি। নীলপুকুরে যার বিয়ে হয়েছে। এতদিন তার কথা মনে ছিল না। ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কি করে এতদিন ভুলেছিলাম দিদিকে ? দিদির কথা মনে পড়তে ছোটবেলার অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল, এলোমেলো ভাবে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাদীপ দেওয়ার সময় দিদি আমাকে কোলে করে নিয়ে যেত প্রথমে তুলসীতলায়, তার পরে মণ্ডপ ঘর, তার পরে অন্যান্য সব ঘরে সন্ধ্যা দিয়ে দিদি তার খেলার রাধা-কৃষ্ণের ঘরে আমাকে নিয়ে যেত। সেখানে প্রত্যেকদিন দিদি প্রদীপ দিয়ে আরতি করত—পুরুতঠাকুরের মত। সেখানে বসে কত অশুদ্ধ উচ্চারণে ভরা সংস্কৃত শ্লোক শিখেছি দিদির কাছে। দিদি সেগুলি পুরুতঠাকুরের কাছে শিখত। এজন্য তাকে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করতে হ'ত। ঠাকুরমশায়ের মাথায় পাকা চুল তুলে দিত, তাঁর মুখশুদ্ধির জন্য হরতকী কেটে দিত, পূজার জন্য ফুল-দুর্বা, বেলপাতা ত দিদিই তুলত। কৃষ্ণের প্রণাম, মনসার প্রণাম, সূর্যের প্রণাম, লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রণাম—মত মন্ত্র-তন্ত্রই যে দিদি আমাকে শিখিয়েছিল। একদিনের কথা আমার খুব মনে পড়ে, কৃষ্ণকে আরতি করা হ'লে পর আমি বললাম,—দিদি আজ আমাকেও আরতি করতে হবে। দিদি বললে, মানুষকে বুঝি আরতি করে ? তাতে পাপ হয় যে নন্তু। আমি বললাম, না—হয় না ; যদি পাপ হয় সে পাপের ভাগী আমি হব, তোমার কিছু হবে না।—দিদি আমাকে এক কথাই বারে বারে বুঝাতে লাগল, মানুষকে আরতি করলে ভয়ানক পাপ হয়। কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়লাম না। আরতি আমাকে করতেই হবে। অবশেষে অন্যন্যোপায় হয়ে রাধাকৃষ্ণের ধ্যান আর প্রণাম আবৃত্তি ক'রে, তাদের কাছে অনেক ক্ষমা চেয়ে, আর অনুমতি নিয়ে দিদি আমাকে আরতি করা আরম্ভ করলো। দিদির হাত কাঁপছিল। পাপের ভয়েই বোধহয়। হঠাৎ খানিকটা তেল আর ছোট্ট একটি জ্বলন্ত পল্‌তে আমার জামার উপর পড়ে গেল। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। বাড়ীর অন্যান্য সকলে ছুটে এল। তাড়াতাড়ি আগুনটা নিভিয়ে ফেলা হল। বিশেষ কিছুই হয়নি, জামাটা কেবল ধরে উঠেছিল। দিদিকে সেদিন কি গালাগালি খেতে হয়েছিল ! আগুন নিয়ে খেলা ! পিসীমা এসে সব শুনে, হাতের কাছে একটা কাঠের চেলা পড়েছিল, তাই দিয়েই জোরে জোরে ঘা কয়েক দিল দিদির পিঠে, বেচারা দিদি ! সে দাগ বোধহয় তার পিঠ থেকে এখনও মিলায়নি। অথচ আমার মন থেকে সবই মিলিয়ে গেছে আজ ! দিদিকে ভুলে যাওয়ার জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারলাম না কিছুতে। আনন্দও হ'ল।

বিস্মৃতির পাড় থেকে (মৃত্যুর চেয়ে সে কম কিসে) একটি পরমাত্মীয়াকে ফিরে পেলাম এ পাওয়া অপ্রত্যাশিত, এর আনন্দও তাই সুবিপুল।

পিসিমা বলল, 'এত কি ভাবছিস নম্ন, যেতে পারবিনে ?'

বললাম 'নিশ্চয়ই পারব পিসীমা কালই যাব, আর যদি পারি—দিদিকে নিয়ে আসব এখানে কয়েক দিনের জন্য।—কেমন ?'

পিসীমা খুব খুসী হল—'দেখিস চেষ্টা ক'রে, যদি ওরা দেয়। ওরা কি আর দেবে ?'

•

নীলপুকুরে দিদির বিয়ের সময় গিয়ে দিন তিনেক ছিলাম। আর যাওয়া হয়নি নৌকায় যেতে হয়, নদী ঘুরে যেতে পুরা একদিন লাগে। একটা একমাল্লাই ঠিক করে নিয়ে পরের দিনই ভোরে রওনা হলাম। সন্ধ্যার ঘন্টাখানেক আগে নৌকা ভিড়ল নদী আর নীলপুকুরের মাঝখানে ছোট্ট একটা মাঠ। ওটা পার হ'তে খুব বেশী সময় লাগে না। গ্রামে প্রবেশ করে দেখি পথ ঘাট সব ভুলে গেছি। কিছুই মনে নেই। একটি ছেলেকে দেখে বললাম, ' র বেন ঘোষের বাড়ীটা কোন দিকে একটু দেখিয়ে দাও তো খোকা।"

ছেলেটা বলল, "ঘোষেদের বাড়ী আপনি চিনে যেতে পারবেন না। আমার সঙ্গে আসুন।"

বাড়ীটার সামান্য দূর থেকে ভয়ানক চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওকি খোকা, অত গোলমাল কিসের ও বাড়ীতে ?"

ছেলেটি বলল, ' বীরুকাকা গাঁজা খেয়ে এসে বৌকে মারছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই মারে। বীরুকাকা খুব খারাপ লোক। আমি এখন যাই। ঐ ত বাড়ী।"

"না খোকা, আর একটু দাঁড়াও। তোমার বীরুকাকা কি করেন এখানে ? তিনি ত কলকাতায় চাকরী করতেন।"

"এখন আর কলকাতায় থাকেন না। আমাদের বাজারে চালা উঠিয়ে দোকান করেন। মুদি দোকান, অনেক রাত্তির হয়ে গেল। বাবা এসে, বাড়ীতে না দেখলে ভয়ানক বকবে।'

ছেলেটি চলে গেলে আমি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম। চেঁচামেচি সব থেমে গেছে। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে একটা উৎকট অভদ্র চীৎকার চলছিল, তা এখন মনেও করা যায় না, বাড়ীটা এখন সম্পূর্ণ নীরব ? স্তব্ধ বাড়ীর ভিতর যেতে আর পা উঠছিল না। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হতে লাগল। ছেলেটির মুখে যা শুনলেম তেমনি বিশ্রি ব্যাপার হয়ত এইমাত্র ঘটে গেল। এরপরে—তাছাড়া, দিদিও যে আমাকে ভুলে যায়নি তার নিশ্চয়তা কি। কি করব ভাবছি। হঠাৎ একটা ছোট ছেলের কাশি শুনতে পেলাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি, একটি ঝুমকা জবার ঝোপ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বছর দশেকের ছেলে বিড়ি টানছে, আর বেদম কাশছে। নতুন খাওয়া শিখছে। এখনও অভ্যস্ত

হতে পারেনি। ধমকের সুরে বললাম, "এই খোকা, কি করছ ওখানে? এখানে এ
এসে শোন ত একবার।"

ফল অন্য প্রকার হল, ছেলেটি হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুট দিল
আমিও পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে বললাম, "দৌড়িও না খোকা, দৌড়িও না, শো
শোন—"

ছেলেটি থামল, অচেনা গলার স্বরে বিস্মিত হল অসম্ভব। আমি কাছে গিয়ে ও
হাতখানা ধরে ফেলে বললাম, "অত জোরে ছুটছিলে কেন বল ত? যদি পড়ে যেতে?"

ছেলেটি চুপ করে রইল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি নাম তোমার?"

"শ্রীবিমানবিহারী ঘোষ।"

"বাবার নাম?"

"শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।"

—দিদির ছেলে? বললাম, "তোমার বাবাকে একবার ডেকে দাও ত।"

"বাবা গাঁজা খেয়ে এসে এই মাত্তর মাকে মারল শুনতে পেলেন না? আ
গেলে আমাকেও মারবে।"

বললাম, "তাহলে তোমার মাকে গিয়ে বল, উমেশপুরের নন্তু মামা এসেছে।"

ছেলেটি ছুটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে দিদি আর জামাইবাবু একটি হ্যারিকেন নি
ছুটে এলেন। জামাইবাবু বললেন, "নন্তু! কবে ফিরলে দেশে?—কোন সংবাদ
পাইনি তো। তা এস, বারবাড়িতে অন্ধকারে আছ কেন? ভিতরে যেতে পার না?"

দিদি বলল, "আয় নন্তু, ঘরে আয়।"

ঘরে গিয়ে দেখলাম, এইমাত্র একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে গেছে, বেশ বোঝা যায়।
একটা জলচৌকি উল্টে পড়ে রয়েছে,—আগুনের মালসাটা ভেঙ্গে গিয়ে ঘরময় ছাই ছড়িয়ে
পড়ছে। ঘরের জিনসপত্রগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। দিদি তাড়াতাড়ি ঘরটা ঝাঁট দিযে
জিনিষপত্রগুলো গোছাতে আরম্ভ করলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জামাইবাবু, দেশে
আছেন কত দিন? কলকাতায় কোন্ মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন না?"

জামাইবাবু বললেন, "সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। দাসত্ব আর পোষাল
না। আজকাল গ্রামের বাজারেই একটা দোকান খুলেছি। বাজারের বার আনা
খদ্দেরই আমার বাঁধা, বেশ স্বাধীন ব্যবসারে ভাই! 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'! প্রথমে
দোকান খুলতে চাইলে সকলেই এসে বাধা দিল, বলল,—'ও তুমি পারবে না।' যেন
ব্যবসা করতে সাধারণ বুদ্ধির চেয়ে আর বেশী কিছু দরকার হয়। কেউ কেউ বলল—
'ওতে মান থাকবে না।' দেশের কি মনোবৃত্তি দেখছ? মান থাকবে দাসত্ব করলে,
আর স্বাধীন ব্যবসায় হবে অসম্মান? এ জাত পরের গোলামী করবে না তো
করবে কে?"

ইতিমধ্যে দিদি ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলেছে, বললে, "ওসব কথা পরেও বলতে পারবে। এখন ওকে ছেড়ে দাও খানিকক্ষণের জন্য, সারাদিন তো কিছুই খায়নি। এখন কিছু খেতে দিই।" পরে আমার দিকে চেয়ে বলল, "আয় নন্তু।"

জামাইবাবু বললেন, "সেই ভাল। তুমি খাওয়া দাওয়া কর নন্তু আমি একটু ঘুরে আসি।" বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

খেতে খেতে দিদির কাছে সবই শুনলাম। —রিডাকসনে চাকরি যাওয়ায় দেশে এসে যথাসর্বস্ব দিয়ে মুদির দোকান খুলেছে। প্রত্যেকেই নিষেধ করেছিল। কিন্তু কারও কথাই শোনেনি, ফল যা হবার হয়েছে। ওর মত লোকের কাজ দোকান করা? হিসাব পত্র কিছু রাখতে পারে কি? যা ছিল সবই গেছে। কলকাতায় থাকতে মদ খেত। ছোটলোকের সঙ্গে মিশে এখন সস্তার গাঁজা ধরেছে। নিষেধ করতে গেলেই ধরে মারে। খাটের উপর শুয়ে ছেলেটা ঘুমাচ্ছিল। ওর দিকে চেয়ে বললাম, "বিশু কোন ক্লাসে পড়ে? ওকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে ত?"

দিদি বলল, "স্কুল না ছাই! বলে, আমার চেয়ে বড় বিদ্বান কে আছে গ্রামে? আমি নিজেই ওকে পড়াব ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত, তারপরে দেব কলেজে ভর্তি করে। পড়ান ত কত! এক-একদিন এসে ছেলেটাকে মারতে মারতে শেষ করে ফেলে আর কি। ছেলেটাও কি মানুষ হবে? এই বয়সেই বিড়ি খেতে শিখেছে। মিথ্যে ছাড়া একটাও সত্য কথা বলে না। কথায় কথায় আমাকে মারতে ওঠে। যা দেখে-শোনে তাই শিখবে ত? —এতক্ষণ আমার কথাই বলছি। মা কেমন আছে নন্তু, তাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে।"

"ভাল আছে।"

ভোরে উঠে দেখি জামাইবাবু দোকানে চলে গেছে। ভাবলাম আমিও যাই। দোকানও দেখে আসব, তাছাড়া বাজারও নাকি এখানে খুব সকালে মেলে, বাজারটাও করে আনা যাবে। জামাটা গায়ে দিয়ে, পকেটে হাত পড়তেই দেখি মনিব্যাগটা নেই। বুঝলাম সবই, খুবই সঙ্কোচ হল, তবুও দিদির কাছে গিয়ে বললাম "একটা টাকা দিতে পারবে দিদি? যে জামাটায় মনিব্যাগটা ছিল, ভুলে সেটা রেখে আর একটা গায়ে দিয়ে এসেছি।"

দিদিও সব বুঝতে পারল। নিমেষের জন্য ওর মুখটা লাল হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই নিভে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। বলল, "টাকা কোথায় পাব ভাই? নগদ একটা পয়সাও কি ঘরে আসে! সব ঐ গাঁজার পিছনে। ছেলেটাকে দিয়ে মাঝে মাঝে চাল ডাল পাঠিয়ে দেয় কিছু কিছু। ঐ পর্যন্ত—"

বিকেল বেলা। দিদিদের বাড়ীর পাশেই একটা বড় পুকুর। পাড় দিয়ে নানা রকমের গাছ সুপারি, খেজুর, নারকেল। ডাল আর পাতা পড়ে জলটা পচে একেবারে

কালো হয়ে গেছে। কয়েকখণ্ড তালের গুঁড়ি দিয়ে ঘাট বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পচা কালো জলের সঙ্গে তালের গুঁড়ির রং ঠিক মিশে গেছে। ওরই একটার উপর বসে ভাবছি, "এতদিন মৃত্যুর জন্যই শোক করে এসেছি। আর থেকে জীবনের জন্যও আরম্ভ হল।"

পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি দিদি।

"পচা জলে পা ডুবিয়ে কি করছিস নন্তু? জোঁক লাগবে যে। পুকুরটায় ভয়ানক জোঁক। কুল আর চাল্‌তে মাখা খাবি নন্তু? তুই ত খুব ভালবাসতিস ছোটবেলায়—"

ছেলেবেলার সেই ছেলেমানুষ দিদি!

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক পর্ব কুরুক্ষেত্র হইয়া গেল।

অনেকদিনের অশান্তি আর অসন্তোষের যে বাষ্প এতদিন আবদ্ধ হইয়াছিল, আজ হঠাৎ ছাড়া পাইয়া তাহার বেশ একটা হিসাব নিকাশ হইয়া গেল। পাশাপাশি দুখানি বাড়ী। মুকুন্দ লাহিড়ী ও শ্যাম চক্রবর্ত্তীর দুখানি আটচালা টিনের বাড়ী। মুকুন্দ লাহিড়ী আর শ্যাম চক্রবর্ত্তীর দুখানি আটচালা টিনের ঘর পরম সুহৃদের ন্যায় পাশাপাশি অনেকদিন দাঁড়াইয়াছিল। গৃহস্বামীদ্বয়ের সৌহার্দ্য এককালে ছিল না এমন নয়, সেরেস্তাদার আর নাজিরের এই মাণিকজোড়টি যখন গুটি গুটি পা ফেলিয়া প্রত্যহ বিকালে নদীর তীরে বাহির হইত, পাড়ার একশ্রেণী পরসুখ কাতর ব্যক্তিরা আক্ষেপে গা চুলকাইয়া মরিত। কেমন করিয়া ইহাদের বিপদ ঘটাইয়া দিবে, মনমালিন্যর বীজ তাহাদের অন্তরে রোপণ করিয়া একটু স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিবে।

ভগবান পূর্ণ করিলেন তাহাদের মনস্কামনা। তাহারা রিটায়ার করিয়া আসিলেন এবং তাহার পরই উভয়ের কেমন স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দেখা হইলে আর প্রাণের কথা জমিয়া ওঠে না, চক্রবর্ত্তী বার দুই কাশিয়া বাতের ব্যথার অজুহাত তোলে, লাহিড়ী মোকদ্দমার নথিপত্র উল্লেখ করিয়া এক পা দু'পা করিয়া সরিয়া পড়ে। কেহ অপরকে তেমন সহজে বরদাস্ত করিতে পারে না।

অপ্রীতি বিদ্বেষের এই প্রচ্ছন্ন ধারাটা অবশেষে প্রকাশিত হইল, লাহিড়ীর ছেলে ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাইল অথচ চক্কোত্তি-তনয় পাশ করিতে পারিল না। প্রথম সূত্রপাত এইখানে। তাহার পর একটা না একটা সূত্র ধরিয়া এ পর্ব্ব সমানে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু আজ একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। লাহিড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামলের বয়স দশ কি এগারো চক্কোত্তির ছোট্ট মেয়েটি অপর্ণার সহিত তাহার ভাবি ভাব। দুই সংসারের নিত্য কলহের মধ্যে ইহারা যেন একটি মূর্ত্তিমান চন্দপতন।

ব্যাপারটা ইহাদের উপলক্ষ্য করিয়াছে।

কয়েকটা পেয়ারা লইয়া কথায় কথায় একটু ঝগড়া হইয়াছিল। পুরুষের দাবী চিরকালই অধিক, এ মন্তব্য করিয়া শ্যামল তিনটা অতিরিক্ত লইতেই নারীর অধিকারে ঘা পড়িল। অপর্ণা ঠোঁট উঁচু করিয়া দুইটা স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিল।

কিন্তু শ্যামল পুরুষ, তাছাড়া গায়ে সে কম শক্তি রাখে না, কাজেই পৌরুষের অপমানটা সহজে সে হজম করিতে পারিল না। আগাইয়া আসিয়া অপর্ণার ঝুলন্ত

বেণীতে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে কহিল : বাঁদরী, জিভ খুব বেড়েছে না ? মেয়েমানুষের এত লোভ কেন শুনি ?

টানটা একটু বেসামাল হইয়া গেল। অপর্ণা ভ্যাঁ করিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। চক্কোত্তি হায়-হায় করিয়া রণস্থলে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহার পরই ক্লাইমেক্স। বকিয়া ঝকিয়া পাড়া সে মাথায় তুলিল। চক্কোত্তি গৃহিণীর ঘোমটার আড়াল হইতে লাহিড়ী ঊর্দ্ধতন কয়েক পুরুষ আপ্যায়িত করিলেন এবং চক্কোত্তি আদালতের স্মরণাপন্ন হইবেন—এই শেষে কঠিন বাক্য বলিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া ধড়াস করিয়া সশব্দে দরজা আঁটিয়া দিলেন।

ও বাড়ীর শ্যামলের পিঠেও পূর্ণোদ্যমে কিছু পড়িতেছিল। অপর্ণা কাঁদিতেছিল সত্যই শ্যামলদার জন্য তাহার মনটা হু-হু করিয়া কাঁদিতেছে। অকারণ অনর্থক সে চীৎকার করিল বলিয়াই তো এমন অপ্রীতি ঘটিল। শ্যামলদা কী ভীষণ মার খাইয়া গেল। সে না হয় পাইত ভাগে তিনটা কম। তাহাতেই বা কী আসিয়া যাইত। শ্যামলদাই তো কষ্ট করিয়া গাছে চড়িয়া পাড়িয়া আনে। দুঃখ সমবেদনা এবং নিজের বিরুদ্ধে অপর্ণার মনটা রুদ্ধ ক্ষোভে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

দুই বাড়ীর মধ্যের প্রাচীর কিনারে একটা আমড়া গাছ, তাহারই ডালে বসিয়া অপর্ণা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। শ্যামলদা, তাহার জন্য না করিতে পারে এমন কাজেই নাই। আর আজ সম্পূর্ণ অকারণে তাহাকে এমন করিয়া মার খাওয়াইল যে ভাবিয়া নিজেকে সে কিছুতেই সংযত করিতে পারিতেছে না। আর বাবা, মা কেমন অযথা চটিয়া আছে উহাদের উপর, যেন একবার ঝগড়ার গন্ধ পাইলে তাহাদের মন রক্ত লোলুপ জোঁকের মত কিল-বিল করিয়া ওঠে। অত্যন্ত ক্রোধে আর বিরক্তিতে অপর্ণার এই মুহূর্তে যেন মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

—অপু—

সহসা অপর্ণা চমকিয়া উঠিল। পিছনের প্রাচীর বাহিয়া কে একেবারে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর্ণা চাহিয়া দেখিল শ্যামলদা, অত্যন্ত ম্লান ব্যথিত মুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার হাতে তিনটি পেয়ারা। সে কহিল : সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে অপু ওই তিনটে বেশী নেওয়া আমারই দোষ। এই নে তোর তিনটে কিন্তু তোর খুব লেগেছে চুলে না রে ?

অপর্ণা কিছু বলিতে পারিল না। ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শ্যামল তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল, পরে সান্ত্বনার কণ্ঠে কহিল : চলরে অপু। আমরা বলিদার বাড়ী একটু ঘুরে আসি। জানিস তো আজ সন্ধ্যায় গান হবে সেখানে। কি সুন্দর যাত্রা পার্টি এসেছে দেখবি চ।

প্রস্তাব হইতে যা দেরী। দুজন বাহির হইয়া পড়িল। মামলা রুজু করিতে হইবে চক্কোত্তি ওদিকে গলদঘর্ম হইয়া তাহার খসড়া করিতে লাগিলেন।

নিমাই ভট্টাচার্য

সাংবাদিক-সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য ১৯৩০ সালের ১০ই এপ্রিল নারকেলডাঙ্গা রেল কলোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সাংবাদিকতা থেকে সাহিত্যে প্রবেশ।

নিজের প্রথম গল্প প্রসঙ্গে / নিমাই ভট্টাচার্য

সাংবাদিকতা আমাকে বহু মানুষের সংস্পর্শে এনেছে এবং তাদেরই সুখ-দুঃখের পুঁজি নিয়ে আমি একদিন কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ায় হাজির হলাম।...

সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে দ্বিতীয়বার লণ্ডন যাই কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী—সম্মেলন কভার করতে এবং সেখানেই অকস্মাৎ নির্মলাবৌদির সঙ্গে আমার দেখা হয়। নির্মলাবৌদি আজও লণ্ডনে।

ঠিক হলপ করে বলতে না পারলেও মনে হয় 'বিসর্জন'ই আমার প্রথম গল্প। ছাপা হয়েছিল 'উল্টোরথ'-এ।

আদিকালে রাজা-মহারাজা, বাদশা-শাহেনশার দরবারে সভাকবির দল থাকতেন। তারা রাজার কথা লিখতেন, ছোটরাণী, বড়রাণীর কথা লিখতেন। লিখতেন আরো কিছু। লিখতেন, রাজ্যের কথা, রাজ্যশাসনের কথা, রাজ্যের খ্যাতিমান পুরুষদের কথা। আর লিখতেন রাজার মহানুভবতার, রাণীমার ঔদার্যের কাহিনী। মাঝে মাঝে রাজকুমারের মৃগয়ার কথা বা অষ্টাদশী পূর্ণযুবতী রাজকুমারীর রূপ-যৌবনের কাহিনী নিয়েও সভাকবির দল লিখতেন। সময়ে-অসময়ে আরো অনেক কিছু লিখতে হত। শত্রুপক্ষের নিন্দা করে কাব্যরচনা করতে হত সভাকবিদের। কখনো কখনো সুরাপানের প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা নিয়েও লিখতেন তাঁরা। রাজার মনোরঞ্জনের জন্য দেহপসারিণী নাচিয়ে গাইয়েদের নিয়েও চমৎকার কাব্যরচনা করে গেছেন অতীত যুগের ঐ সব সভাকবির দল।

অতীতকালের ইতিহাসের টুকরো টুকরো ছেঁড়া-পাতাগুলো খুঁজলে সভাকবিদের বিস্ময়কর প্রতিভার আরো অনেক পরিচয় পাওয়া যাবে। এইসব সভাকবিদের টুকরো টুকরো কাব্যকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা ইতিহাস লিখেছেন। সে ইতিহাস আমরা মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করেছি, কিন্তু ভুলে গেছি সভাকবিদের। শুধু যে তাঁদের আমরা ভুলে গেছি, তা নয়, সভাকবিদের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে আমাদের অবজ্ঞা আমাকে বড়ো পীড়া দেয়, সভাকবিদের রচনা নিয়ে আমরা হৈ-চৈ করি, কিন্তু তাঁদের জীবনে কোনদিন সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-ব্যর্থতা নিয়ে আলো-আঁধারের খেলা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। সভাকবিরা সব কিছু লিখেছেন, লেখেননি শুধু নিজেদের কথা। হয়তো নিজেদের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসার জ্বালায় তাঁরা জ্বলে পুড়ে মরেছেন, কিন্তু সে কাহিনী লেখার সুযোগ কোনদিন তাঁদের জীবনে আসেনি।

আমরা খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও হচ্ছি এ যুগের সভাকবির দল। আমরাও রাজার কথা লিখি, মন্ত্রীর কথা লিখি, রাজার মহানুভবতা, রাণীমার ঔদার্যের কথা, রাজ্যের কথা, রাজার বন্ধুদের কথা লিখি। অতীতের সভাকবিদের কাব্যের মত আজকের দিনের খবরের কাগজের রিপোর্টারদের টুকরো রিপোর্টকে কেন্দ্র করে আগামী দিনের

ঐতিহাসিকরা নিশ্চয়ই আজকের ইতিহাস লিখবেন। আগামী দিনের মানুষ ও ইতিহাস হয়তো মুগ্ধ হয়ে পড়বেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও কেউ স্মরণ করবেন না রিপোর্টারদের।

সভাকবিদের টুকরো টুকরো কাব্যের মধ্য দিয়ে যেমন অতীতের বহুমানুষের জীবন কাহিনীর একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। আজকের দিনের রিপোর্টারদের টুকরো টুকরো রিপোর্টের মধ্য দিয়েও তেমনি বহু মানুষের জীবন কাহিনীর একটা পূর্ণা ছবি ফুটে উঠবে। রিপোর্টারদের কলমে বা টাইপ-রাইটারে আজ যিনি ছাত্র নেতা ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কর্মী। আগামী দিনে তিনিই হয়তো মন্ত্রী। মাঝখানে তাঁ কারাবরণের কথা ও মুক্তিলাভের খবরও ঐ একই টাইপ-রাইটারে লেখা হয়। শুধু কি তাই? ঐ একই রিপোর্টার হয়তো মন্ত্রীর পদত্যাগ, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তার তদন্ত তদন্তের খবর ফাঁস, সরকার কর্তৃক তদন্তের রিপোর্ট নাকচ, মন্ত্রীর দলত্যাগ, আবা পুরোনো দলে ফিরে আসা, মন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণ, তাঁর প্রতিদিনের কাজকর্ম, এমন কি তাঁ প্রেম, বিয়ে বা নার্সিংহোমে পুত্রসন্তান জন্মের খবরও ঐ রিপোর্টারের কলমেই লে হয়। অদৃষ্টের পরিহাস ঐ মন্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদও হয়তো একই রিপোর্টারের টাইপ রাইটারে লেখা হবে। দীর্ঘদিনের বিস্তীর্ণ পরিবেশে লেখা এইসব টুকরো টুকরো খব জুড়লে নিশ্চয়ই একটা জীবন-কাহিনীর পূর্ণ রূপ দেখা যাবে। রিপোর্টারের দল সব অলক্ষে হয়তো নিজেদেরও অজ্ঞাতসারে অসংখ্য মানুষের জীবন-কাহিনী লিখে যান অতীতের সভাকবিদের মত আজকের দিনের খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও লেখে না শুধু নিজেদের কথা, নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-বেদনা ইতিহাস।

তাইতো নির্মলদার ইতিহাস হয়তো কেউ জানবেন না, কেউ একফোঁটা চোখের জ ফেলবেন না, কেউ তাঁর জীবনের আনন্দ বেদনার উষ্ণতা অনুভব করবেন না নিজেদে অন্তরে। নির্মলদার জীবন নাট্যে আমি অভিনয় করিনি, উইং স্ক্রীনের পাশ থে প্রম্পটারের কাজ করিনি, গ্রীনরুমেও যাইনি। তবে অদৃষ্টের পরিহাসে দুটি প্রাণীর জী নাট্যের চরম কয়েকটি দৃশ্যের একমাত্র দর্শকরূপে আমি তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

নির্মলদা ও নির্মলাবৌদি দীর্ঘ ও বিচিত্র জীবনপথ পাড়ি দিয়েছিলেন। এ পান্থশালা থেকে আরেক পান্থশালায় গিয়েছেন ওঁরা দুজনে। আমি তাঁদের সহযাত্রী হব গৌরব অর্জন করিনি, কিন্তু ওঁদের জীবনপথের পান্থ-সীমার এক পান্থশালায় ম কয়েকটি স্মরণীয় রাত্রির জন্য আমি সঙ্গী হয়েছিলাম। ধন্য হয়েছিলাম ঐ দুটি মহাপ্রাণে কাছে এসে। ওদের দুজনের ভালবাসার আত্মতৃপ্তিতে আমি আমার অন্তর ভরিয়েছিলাম অতর্কিত আক্রমণ করে ঐ দুটি প্রাণীর স্নেহ-ভালবাসা দশ হাতে লুটপাট করে নিয়ে কিন্তু তার বিনিময়ে শুধু ক'ফোঁটা চোখের জল ছাড়া আর কিছু দিতে পারিনি আমি নির্মলাবৌদি তার হৃদয় ঔদার্যে আমার হৃদয়-কার্পণ্য ক্ষমা করলেও আমি নিজের বুকে

মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করি। কাজ কর্মের অবসরে নিজের অজ্ঞাতে আজও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে আমার বুকটাকে ভারী করে তোলে, মনটাকে পীড়িত করে। মানুষকে আমি ভালবাসি। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে আমি ধন্য হয়েছি, কিন্তু কেন জানিনা মানুষের যত কাছে এসেছি, ততই তাঁদের সুখ-দুঃখের ঝঙ্কার এমন তীব্রভাবে আমার অন্তরে বেজেছে যে, বেদনা অনুভব করেছি।

গত বছরের মত এবারেও লণ্ডন এয়ারপোর্টে শুধু একটি প্রাণীই আমাকে রিসিভ করতে এসেছিলেন। বন্ধু-বান্ধব বা বান্ধবীদের আমার যাবার কথা জানাই কিন্তু ঠিক করে কোন্ ফ্লাইটে কটার সময় কোথা থেকে লণ্ডনে পৌঁছাচ্ছি, সে কথা জানাই না। লণ্ডনের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমে আমি শুধু একটি প্রাণীকেই দেখতে চাই, তাঁকে প্রণাম করতে চাই, তার বুকে আত্মসমর্পণ করতে চাই। লণ্ডনে পৌঁছে প্রথম কয়েকটি আনন্দ বেদনাতুর মুহূর্তে আমাদের দুজনের মাঝখানে হাইফেনের মত অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি কল্পনা করতে পারি না। তাইতো এবারে সবাইকে জানিয়েছিলাম কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিস্টার্স কনফারেন্স কভার করতে লণ্ডন আসছি। কিন্তু দাস ফার, নো ফারদার। শুধু নির্মলাবৌদিকে লিখেছিলাম—

'বৌদি'।

আমি আসছি। ১১ই জুন সুইস এয়ার ফ্লাইটে জুরিখ থেকে বিকেল চারটে কুড়িতে লণ্ডন পৌঁছব। ক'দিন আবার দুজনে কাঁদব, গাইব, বেড়াব। কেমন? প্রণাম নিও।

তোমার ঠাকুরপো।

চিঠি পাবার পরই নির্মলাবৌদি আমার জন্য ঘরদোর ঠিক করতে লেগে পড়েছিলেন। আমি ঠিক যা যা চাই, যা কিছু ভালবাসি, তার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন আমি আসার ক'দিন আগেই। এগারোই জুন বারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনটে বাজতে না বাজতেই নির্মলাবৌদি এয়ারপোর্টে হাজির হয়েছিলেন। আমি কাস্টমস এনক্লোজারে ঢুকতেই দেখলাম বেরুবার রাস্তায় দেওয়ালে মাথাটা ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার নির্মলাবৌদি। আমি হাত তুলে ইশারা করলে উনি একটু হেসে হাত তুলে প্রত্যুত্তর দিলেন আমাকে। তারপর কয়েক মিনিট পরে কাস্টমস্ চেক্ শেষ করে বেরিয়ে আসতেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলাম নির্মলাবৌদিকে। বৌদিও দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। দু এক মিনিট পরে ক'ফোঁটা চোখের জল আমার গালে গড়িয়ে পড়তে খেয়াল হল বৌদি নিশ্চয়ই কাঁদছেন। হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে বৌদির চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'ছিঃ বৌদি, তুমি কাঁদছ? এত দূর থেকে এলাম তোমার কাছে সে কি তোমার চোখের জল দেখাবার জন্য?'

ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফোটাবার চেষ্টা করে বৌদি বললেন, 'না না, ঠাকুরপো কাঁদছি কোথায়?'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না বৌদি।'

চোখের জল বন্ধ হল, কিন্তু চোখের মণিদুটো স্থির করে এমন উদাস দৃষ্টিতে বৌদি চাইলেন যে, আমার বুকের মধ্যে জ্বালা করে উঠল। নীচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে খুব ধীর-স্থির আস্তে বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো, তুমিও যেমন আমাকে পেয়ে আনন্দ পাও, আমিও তেমনি তোমাকে কাছে পেয়ে অনেক শান্তি পাই। আজ তুমি ছাড়া আমার ঘর আলো করার আর কে আছে বলতে পার?'

'ঠিক বলেছ বৌদি। তোমার ঘরে, তোমার মনে, তোমার জীবনে আর কোনদিন সূর্যের আলো পড়বে না বলে তুমি আমার মত একটা মাটির প্রদীপকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ?'

'তুমি মাটির প্রদীপ হলেও আমার এই জমাট বাঁধা অন্ধকার জীবনে তার অনেক প্রয়োজন, অনেক দাম। তাই না ঠাকুরপো?'

আর বেশি কথা না বলে এয়ারপোর্ট থেকে বৌদির বাসায় গিয়েছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ডানদিকের ঘরে ঢুকতেই টেবিলের ওপর নির্মলদার কলম, পেন্সিল, টাইপ-রাইটার, নোটবই হাতঘড়ি আর একটা ছবি দেখতে পেলাম। বছর পাঁচেক আগে যেদিন সন্ধ্যায় এই বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করি, সেদিনও ঠিক এমনি করেই সাজানো ছিল। ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রও ঠিক এমনিই ছিল। আজকের সঙ্গে সেদিনের বিশেষ কোন পার্থক্যই ছিল না। তবে হ্যাঁ, সেদিন এই ঘরের মালিক নির্মলদা ছিলেন, আজ তিনি নেই। আর শুধু একটা পরিবর্তন নজরে পড়ল। সেদিন নির্মলদার ফটোটায় ফুল চন্দন ছিল না, আজ ছিল। পাঁচ বছর আগে নির্মলা-বৌদি নির্মলদাকে পূজো করতেন, আজ পূজো করেন তাঁর ঐ ফটোটাকে। নির্মলদার টাইপ রাইটার একটু খুললাম। ফটোটাকে হাতে তুলে নিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই চোখের দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে অজস্র ধারায় নেমে এল চোখের জল। আমাকে সান্ত্বনা জানাবার শক্তি বৌদির ছিল না। তিনিও আমারই মতন অতীত স্মৃতির ঝড়ে পথ হারিয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো।'

'কি বৌদি।'

'প্রথম যেদিন এ বাড়িতে তুমি এসেছিলে সেদিনের কথা মনে পড়ে?'

নির্মলদার স্মৃতিতে আমার মানসিক অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। মুখে কোন উত্তর দিতে পারিনি, শুধু মাথা নেড়ে জানিয়েছিলাম, হ্যাঁ মনে পড়ে। বৌদির পাশে দাঁড়িয়ে নির্মলদার ফটোটার মুখোমুখি হয়ে শুধু পাঁচ বছর আগের কথাই নয়, আরো অনেক কথা, অনেক স্মৃতি আমার মনে সেদিন ভীড় করে এসেছিল।

আমি ঠিক নির্মলদার সহকর্মী না হলেও আমাদের মধ্যে বেশ একটা হৃদ্যতা, ভ্রাতৃত্বের ভাব ছিল। বহু ট্যুরে আমরা দুজনে একসঙ্গে থেকেছি, বহু ঐতিহাসিক খবর দুজনে একসঙ্গে কভারও করেছি। দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা বয়সের পার্থক্য থাকায় খুব গভীরভাবে নির্মলদাকে কাছে টানতে পারিনি। আমি কলকাতা ছাড়ার পর শুনলাম নির্মলদা হঠাৎ অন্য একটা কাগজের ফরেন করেসপনডেন্ট হয়ে কায়রো গেছেন।

বছর দুই পরে বেইরুটে এক বন্ধু-গৃহে নির্মলদার সঙ্গে আমার দেখা। তারপর দুজনের দেখা হয় যুগোশ্লোভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে। দুজনেই নন্ অ্যালাইনমেণ্ট কনফারেন্স কভার করতে গিয়েছিলাম। একই হোটেলে প্রায় পাশাপাশি ঘরে ছিলাম।

নির্মলদাকে নানাভাবে নানা জায়গায় দেখেছি। দেখেছি কাছ থেকে, দেখেছি দূর থেকে। বেশ লাগত নির্মলদাকে। ওর হাসি খুশী ভরা মুখখানা আমাকে অনেক সময়ে অনুপ্রেরণা দিত। বহু বিষয়ে নির্মলদার আগ্রহ ছিল, কিন্তু কোনদিন কোন অবস্থাতেই মেয়েদের বিষয় তাঁর কোন আগ্রহ দেখতে পাইনি। তাছাড়া নির্মলদার আর একটা বৈশিষ্ট্য আমার কাছে একবার নয়, দুবার নয়, বহুবার ধরা পড়েছিল। মাঝে মাঝেই উনি যেন কোথায় তলিয়ে যেতেন, অনেক চেষ্টা করেও ওঁকে খুঁজে পেতাম না। সন্দেহ হত হযতো কোন রহস্য আছে, কিন্তু চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি।

খবরের কাগজের রিপোর্টাররা বিভিন্ন কাগজে কাজ করলেও নিজেদের মধ্যে পারিবারিক হৃদ্যতার মত মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুখে দুঃখে পাশাপাশি না চললে আমাদের বেঁচে থাকাই মুশকিল। এই বিজয়দার বোন উমার বিয়েতে ওদের ব্যারাকপুরের বাড়িতে তমাল বা পূর্ণেন্দু যা করল, তা দেখে কেউ ভাবতে পারল ওরা ঐ পরিবারের কেউ নয়? কেউ কি জানতে পারল ওদের কাগজের মধ্যে দারুণ লড়াই? রিপোর্টারদের লেখার সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। এইত মান্নার বাবা মারা গেলে বলাইদা যা করলেন বা অধীরদার মেয়ের বিয়ের জন্য ছেলে দেখা থেকে শুরু করে সবকিছুই তো রমেশদা করলেন কিন্তু কেউ বুঝতে পারবে না, কেউ জানতে পারবে না ওরা সহকর্মী পর্য্যন্ত নন। রিপোর্টারদের মধ্যে এমন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন থাকা সত্ত্বেও কোন প্রবীণ রিপোর্টারকেও নির্মলদার বিয়ের জন্য অনুরোধ করতে দেখিনি। আমার বেশ একটু আশ্চর্য লাগত। নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করতাম, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পেতাম না। দীর্ঘদিন পরে স্বয়ং নির্মলদার কাছ থেকেই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম।

বেলগ্রেডে যখন নির্মলদার সঙ্গে দেখা হল, তখন উনি লণ্ডনে পোস্টেড। তাই লণ্ডন যাবার পথে আমি নির্মলদার সহযাত্রী হলাম। পথে ক'দিনের জন্য দুজনেই বার্লিন গেলাম। কেম্পিনস্কি হোটেলে দুজনে একই ঘরে ছিলাম। দীর্ঘদিনের পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুজনের একত্রে বার্লিন বাস এক বিচিত্র গাঁটছড়া বেঁধে দিল আমাদের মধ্যে। দুটি মানুষের মধ্যে পরমাত্মীয়ের সম্পর্ক গড়বার জন্য সতেরো দিন মোটেই দীর্ঘ সময় নয়, কিন্তু অত্যন্ত নিবিড় করে মেশবার জন্য আমার আর নির্মলদার মধ্যে এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। তাই তো বার্লিন ত্যাগের আগের দিন নির্মলদা হঠাৎ আমাকে বললেন, 'বাচ্চু, তুই তোর লণ্ডনের হোটেল রিজার্ভেশন ক্যানসেল করে একটা টেলিগ্রাম করে দে।'

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন নির্মলদা?'

'কেন আবার ? তুই আমার কাছেই থাকবি।'

হোটেলের রিসেপশন কাউণ্টারে টেলিগ্রামটা দেবার সময় নির্মলদাও একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন। কাকে, কোথায়, কিজন্য পাঠালেন, তা বুঝতে পারলাম না। ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে লণ্ডন পৌছবার পর জেনেছিলাম ঐ টেলিগ্রামটা নির্মলা-বৌদিকে পাঠিয়েছিলেন।

লণ্ডন এয়ারপোর্ট কাস্টমস থেকে বেরিয়ে আসতেই একজন সুদর্শনা মহিলা ধীর পদক্ষেপে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে নির্মলদার হাত থেকে টাইপ-রাইটার আর কেবিন-ব্যাগটা নিয়ে নিলেন। তারপর কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে টানা চোখ দুটোকে একটু কুঁচকে নির্মলদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কি কোনদিন আমাকে শান্তি দেবে না ?'

সামনের দিকে এগোতে এগোতে একটু হেসে, একটু অবাক হয়ে নির্মলদা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কেন বল তো ?'

'আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন ? আজকে তোমার ফেরার কথা ?'

'কেন, টেলিগ্রাম পাওনি ?'

'নিশ্চয়ই একশোবার পেয়েছি, কিন্তু তোমার না সোমবার আসার কথা ?'

একগাল হাসি হেসে নির্মলদা বললেন, 'ওঃ, এই কথা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই কথা।'

আমি বেশ বুঝতে পারলাম সোমবার নির্মলদার লণ্ডনে ফেরার কথা ছিল এবং কদিন যে দেরী করে আসছেন, সে খবরও জানাননি। স্বাভাবিক ভাবেই বৌদির সেজন্য চিন্তা হয়েছে। ট্যাক্সির কাছে এসে নির্মলদার খেয়াল হল আমার সঙ্গে বৌদির পরিচয় করিয়ে দেননি। বৌদির ডান হাতটা টেনে ধরে বললেন, 'রাধা তোমার সঙ্গে বাচ্চুর পরিচয় করিয়ে দিইনি।'

নির্মলদার দিকে ফিরে বৌদি বললেন, 'সেসব কাণ্ডজ্ঞান কি তোমার আছে ?' এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এস ভাই ট্যাক্সিতে ওঠ।'

তিনজনে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। ট্যাক্সির মধ্যে আমাদের অনেক কথা হয়েছিল, সে সব আজ আর মনে নেই। তবে মনে আছে বৌদি একবার বাঁকা চোখে নির্মলদার দিকে তাকিয়ে পরে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বিয়ে করেছ ?'

'না বৌদি।'

'বিয়ে কোর না।'

'কেন বলুন তো ?'

'কেন আবার ? বিয়ে করলে তো আমারই মত তাঁকেও যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।'

উত্তর-পশ্চিম লণ্ডনের হেণ্ডন সেণ্ট্রালে নির্মলদার ফ্ল্যাটে আমার দিনগুলো বেশ কাটছিল। এত ভাল আমি কাটাতে চাইনি, কিন্তু অদৃষ্টের যোগাযোগে এড়াতে পারি নি। হিসাব-নিকাশে ভগবানের ভুল নেই। সেদিনের সব আনন্দের জের সুদে-

আসলে তিনি আজ আদায় করছেন। কিন্তু আমি অসহায়।

নির্মলদা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যেতেন। আমি তিনবার বেড-টি খেয়েও উঠতে চাইতাম না। বৌদি, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এক-একবার হাঁক মারতেন, 'ঠাকুরপো, উঠুন ভাই। অনেক বেলা হয়ে গেল।' আমি কোন জবাব না দিয়ে বালিশটাকে আরো একটু আদর করে জড়িয়ে পাশ ফিরে শুতাম। শেষকালে অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর আমি পাশ ফিরে জিজ্ঞাসা করতাম, 'কিছু বলছেন?'

চোখের কোণে হাসি ফুটিয়ে মুখের চারপাশে গাম্ভীর্যের ভাব এনে বৌদি বলতেন, বাপরে বাপ, তোমরা এত ঘুমোতেও পার।'

'সকালবেলায় উঠতে না উঠতেই বহুবচন দিয়ে গালাগালি দিতে শুরু করলেন।' তারপর বৌদির মুখটা কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলতাম, 'কেন, নির্মলদারও বুঝি খুব বেশি ঘুম?'

চট করে বৌদি মুখটা টান দিয়ে বলতেন, 'বাচ্চু। কানটি মলে দেব।'

'উইথ প্লেজার। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেবেন।'

বৌদি আমার কথায় কান না দিয়ে উঠে যেতে গেলেই আমি তাঁর শাড়ির আঁচল ধরে টান দিয়ে কাছে টেনে নিতাম।

'জানেন তো বৌদি, প্রাইম মিনিস্টারকেও রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।'

বৌদি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে বলতেন, 'রেখে দাও তোমাদের রিপোর্টারী চালিয়াতি। মাঝে দু'বছর ছাড়া আজ আঠারো বছর ধরে রিপোর্টার দেখছি। ওসব ভয় আমাকে দেখিও না।'

শেষপর্যন্ত দুজনেই মিটমাট করে নিতাম। বৌদি একটা গান শোনালেই আমি উঠে পড়তাম।

কাজকর্ম সেরে আমার ফিরতে রাত হত। কিন্তু নির্মলদা সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসতেন। খুব জরুরী কাজ না থাকলে সন্ধ্যার পর কোনদিন তিনি বেরোতেন না।

আমি ফিরলে তিনজনে একসঙ্গে ডিনার খেতে বসতাম। খেতে বসে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনা শেষ করে উঠতে অনেক রাত হত। কিন্তু তখনও আমাদের আসর ভাঙত না। ফায়ার প্লেসের ধারে আমরা দুজনে সিগারেট টানতাম, আর বৌদি শোনাতেন গান। একটা দুটো নয়, ডজন ডজন গান শোনাতেন বৌদি। এত গান শোনার পরও হয়তো নির্মলদা বলতেন, 'রাধা, সেই গানটা শোনাবে?'

'কোন গান?'

'সেই যে—নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।'

বৌদি কোন উত্তর দিতেন না, শুধু-ভাব-ভরা চোখে একবার চাইতেন নির্মলদার

দিকে। তারপর গাইতেন গান।

কবে, কখন ও কেন বৌদিকে 'তুমি' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিলাম, তা আজ মনে নেই। মনে আছে শুধু সেই কটা দিনের স্নেহভরা মধুর স্মৃতি। নির্মলদার ঔদার্য ও বৌদির স্নেহে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ওদের দুটি জীবনের মাঝে আমিও আমার একটা ঠাঁই খুঁজে পেলাম।

ক'দিন থাকার পরই জানতে পারলাম বৌদির নাম কৃষ্ণা। একদিন রাত্তিরে কথায় কথায় হঠাৎ নির্মলদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বৌদিকে রাধা বলে ডাকেন কেন?'

'কেন আবার?' পরস্ত্রীকে তো এর চাইতে ভাল নামে ডাকা যায় না।'

মুহূর্তের মধ্যে বৌদির মুখটা লাল হয়ে উঠল, দুজনের দৃষ্টি বিনিময়ও হল। আমি এ-সব নজর করেছিলাম, কিন্তু গুরুত্ব দিইনি। বৌদির সিঁথিতে সিঁদুর দেখিনি। তবে আশ্চর্য্য হইনি কারণ লণ্ডন প্রবাসী কোন মেয়েই সিঁদুর পরে না বললেই চলে।

বছর দেড়েক পর রাষ্ট্রপতির ব্রিটেন সফর কভার করার জন্য আমি লণ্ডন গেলাম রাষ্ট্রপতির সফর শেষে ক'দিন নিরিবিলি লণ্ডনবাস করার জন্য আমি আবার হেণ্ডন সেণ্ট্রালে নির্মলদার ফ্ল্যাটে বৌদির সংসারে আশ্রয় নিলাম। সেবার একটু ভাল করে দেখলাম। ড্রইং-রুমে রাত্তিরের গানের আসর ভাঙার পর দুজনকে দুটি ঘরে চলে যেতে দেখলাম। গভীর রাতে চুরি করেও দেখেছি, দেখেছি দুজনকে দু'ঘরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতে। মনে একটু খটকা লেগেছিল। কিন্তু সেটা নিতান্তই খটকা, তার বেশী নয়। ইতিমধ্যে বৌদি নির্মলদার স্ত্রী বলে আমি তার নাম দিলাম নির্মলা। ডিনার-টেবিলে। এই নামকরণ উৎসবের সময় দুজনেই একটু মুচকি হেসেছিলেন। বোধকরি এই নামকরণ উৎসবের পরই নির্মলদা ও নির্মলা-বৌদি স্থির করেছিলেন, আর দেরি করা ঠিক নয়. তাই সেই রাত্তিরে আমার প্রেসের বারে বসে নির্মলদা ওঁদের দুজনের অতীত জীবন-কাহিনী শুনিয়েছিলেন।

হাওড়া মধুসূদন পালচৌধুরী লেনের নির্মলদা ও নির্মলা-বৌদিদের বাড়ি প্রায় পাশাপাশি। দুটি পরিবারের মধ্যে গভীর হৃদ্যতাও ছিল। শৈশবে নির্মলদার মা মারা গেলে কিছুকাল বড়পিসীর তদারকেই ছিলেন। বড়পিসির বিয়ে হবার পর নির্মলদার জন্য তাঁর বাবা বড়ই চিন্তায় পড়লেন। তখন নির্মলা-বৌদির ঠাকুমা বললেন, 'আরে এরজন্য আবার চিন্তা কি? ও আমার কাছেই থাকবে।'

তখন নির্মলদার বয়স বছর আট কি নয় হবে। পরে নির্মলদাদের সংসারে তাঁর কাকিমা এসেছিলেন, কিন্তু এই মাতৃহীন শিশুটি সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। নির্মলদা ঐ ঠাকুমার স্নেহচ্ছায়ায় থেকে গেলেন। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলে নির্মলদা নিজেদের বাড়িতে থাকলেও আত্মার যোগাযোগটা কমল না। দুনিয়ার সবাই শুধু এইটুকুই জানত, কিন্তু কেউ জানত না ঐ অতগুলো মানুষের ভীড়ের মধ্যেও দুটি আত্মা সবার কল-কোলাহল থেকে বহুদূরে নিজেদের একটা ছোট্ট দুনিয়া রচনা করেছে।

বপন কলেজ থেকে ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে পাশ করার পর নির্মলদা ইকনমিক্সে এম্.-এ পড়বার জন্য ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলেন। মাস ছয়েক পরে হাওড়া ব্রীজের কোণায় এক দুর্ঘটনায় বাবা মারা গেলেন। ঠাকুমার স্নেহের স্পর্শে ও শুভাকাঙ্ক্ষাদের ভালবাসায় সে-দুঃখও নির্মলদা ভুলেছিলেন। কিন্তু রেজাল্ট খুব ভাল হল না, সেকেণ্ড ক্লাস পেলেন।

এদিকে রেজাল্ট বেরোবার আগে থেকেই নির্মলদা পাড়ার দত্তদার সূত্রে ডেইলি টাইমস্ পত্রিকায় যাতায়াত শুরু করেছিলেন। রেজাল্ট বেরোবার পর পাকাপাকি ভাবে রিপোর্টারের কাজে লেগে পড়লেন।

তিন বছর পরে নির্মলাবৌদিও বি. এ. পাস করলেন, কিন্তু বাড়ির কেউ এম. এ. পড়াতে চাইলেন না। সবাই বললেন, মারে পড়ালে ভাল পাত্র পাওয়া মুশকিল হবে। পাত্র-নির্বাচন-পর্ব প্রায় চড়ান্ত পর্যায়ে এলে নির্মলদা আর দেরি করলেন না। একদিন একটু আড়ালে ঠাকুমাকে বললেন, 'আম্মা, এ বিয়ে দিও না। কিন্তু সুখী হবে না।'

ঠাকুমা একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন রে?' [illegible] বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু নির্মলাবৌদির মা কিছুতেই রাজি হলেন না। [illegible] চাপে পড়ে নির্মলা-বৌদির বাবাও আপত্তি করলেন। নির্মলাবৌদি অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন কিন্তু কিছু ফল হয়নি। বন্ধু বান্ধব নির্মলদাকে পরামর্শ দিয়ে ছিল নির্মলাবৌদিকে নিয়ে বোম্বে বা দিল্লী মেলে চেপে পড়তে, কিন্তু নির্মলদা রাজী হন নি। শুধু বলেছিলেন, '[illegible] হয় না রে'। যাঁদের দয়ায় আজ আমি এতদূর এসে পৌঁছেছি, তাঁদের এ সর্বনাশ করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

পরবর্তী [illegible] শ্রাবণ মাঝরাতের এক লগ্নে এঞ্জিনীয়ার সুকুমারবাবুর সঙ্গে নির্মলাবৌদির বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে বাড়ির রোশনাই আলোর চেকনাইতে কেউ জানল না দুটি আত্মা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

নির্মলাবৌদি সুকুমারবাবুর হাত ধরে হাজারিবাগে রওনা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই নির্মলদা ছুটি নিয়ে বম্বে রওনা হয়ে গেলেন। বম্বের ডেইলি এক্সপ্রেসের এডিটর মিঃ রঙ্গস্বামীর সঙ্গে একবার একটা প্লেনের উদ্বোধনী যাত্রায় একত্রে জাপান গিয়েছিলেন।

নির্মলদাকে তাঁর বেশ ভাল লেগেছিল এবং ভাল অফার দিয়েছিলেন। তখন সে অফার নেওয়া নির্মলদার পক্ষে সম্ভব হয়নি কিন্তু অত তের ঐ সূত্র ধরেই আজ উনি বম্বে গেলেন। সপ্তাহখানেক বসে থাকার পর মিঃ রঙ্গস্বামী জানালেন, দিল্লী বা বম্বেতে কোন ওপেনিং নেই, তবে কায়রোতে স্পেশাল করেসপনডেন্টের পোস্টটা খালি আছে। নির্মলদা হাসিমুখে সে অফার গ্রহণ করে দিন পনেরোর জন্য কলকাতা ফিরে এলেন।

পনেরো দিন বাদে আম্মাকে প্রণাম করে নির্মলদা বি. ও এ. সির প্লেনে কায়রো রওনা হলেন। তিন বছর বাদে মস্কো বদলি হওয়ার সময় একমাসের জন্য হোম লিভ পেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণা বিহীন হাওড়ার কোন টান না থাকায় দেশে আসেন নি। আবার তিন বছর মস্কোয় কাটালেন নির্মলদা। তারপর বদলি হলেন লণ্ডনে।

'…জানিস বাচ্চু, তখন সবে লণ্ডন এসেছি। একদিন ইণ্ডিয়া হাউসের এক রিসেপশন থেকে ফেরার সময় অকস্মাৎ চ্যারিংক্রশ টিউব স্টেশনে রাধার সঙ্গে দেখা। ওর বিয়ের আট বছর পরে ওকে লণ্ডনে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তোর বৌদি সে রাত্তিরে আর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরল না, আমার সঙ্গে এল। আট বছরের জমাট বাঁধা ইতিহাস দুজনে দুজনের কাছে তুলে ধরলাম। হাওড়ার সঙ্গে কোন যোগাযোগ না থাকায় আমি কিছুই জানতাম না। জানতাম না বিয়ের দেড় বছর বাদে জীপ দুর্ঘটনায় সুকুমারবাবু মারা গেছেন। বিধবা হবার পর তোর বৌদির কোন ইচ্ছায় কোন প্রতিবন্ধক এল না। বাবা, মা, আম্মা সবাই মত দিলেন। থাক্, বিলেতে গিয়েই পড়াশোনা করুক। তারপর একদিন ও লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে পাশ করে বেরুল। তারপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দুজনে মিলে অনেক ভেবেছি, অনেক আলোচনা করেছি, শুধু কি তাই? দুজনে মিলে অনেক চোখের জল ফেলেছি। রিজেণ্ট পার্কের বেঞ্চগুলো হয়তো আজও সে চোখের জলে ভিজে আছে। ভাবতে ভাবতে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দুজনে ঘর বেঁধেছি, আর এই তিনটি বছর স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে চলেছি দুজনে।

নির্মলদা একটা পাঁজর কাঁপানো দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বৌদিও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। হয়তো আমারও একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল কিন্তু ঠিক মনে নেই।

…'যাকে সারা জীবন ধরে নিজের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছি, যার রক্তের সঙ্গে নিজের রক্ত মিশিয়ে সন্তানের হাসিমুখ দেখবার ছবি এঁকেছি মনে মনে তাকে নিয়ে এই অভিনয় করা সে কি অসহ্য, সে কথা তুই বুঝবি না বাচ্চু।'

উত্তেজনায় আমার হাতটা চেপে ধরলেন নির্মলদা। বললেন, বিশ্বাস কর বাচ্চু, আজ আর তোর কাছে মিথ্যা কথা বলব না। মাঝে মাঝে সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের কথা ভুলে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তোর বৌদির ঘরে ঢুকে পড়েছি। দু-একদিন হয়তো হিংস্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কিন্তু তারপর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছি নিজের ঘরে। কখনও কখনও আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তোর বৌদি চুরি করে আমার পাশে শুয়ে থেকেছে, আমাকে আদর করেছে, আমার মুখে মুখ রেখে কেঁদেছে, কিন্তু তবুও আজ পর্যন্ত তার বেশী এগুতে পারিনি।

নির্মলদা হাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আর কিছু বলতে পারলেন না, থেমে গেলেন। চোখের জলটা মুছতে মুছতে বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো একটা কথা বলত?'

আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। মাথা নেড়ে বললাম, 'বলুন।'

'তোমার দাদাকে আর আমাকে খুব খারাপ মনে হচ্ছে তাই না?'

'তুমি কি ভেবেছ বৌদি, আমি ভাটপাড়ায় পণ্ডিত, না কি পাষাণ?' একটু থেমে

মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বললাম, 'আমাকে আরো একটু দুঃখ না দিলে তুমি বুঝি তৃপ্তি পাচ্ছ না বৌদি ?'

বৌদি নির্মলদার ওপাশ থেকে এসে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। বললেন, 'লক্ষীটি ঠাকুরপো, দুঃখ করো না। তুমি যে আমাদের জন্য চোখের জল ফেলেছ, তাতেই আমাদের অনেক দুঃখ কমে গেছে। আর তাছাড়া তুমি ভিন্ন আর কেউ তো আমাকে এমন করে বৌদি ডাকেনি, এমন মর্যাদা তো আর কেউ দেয়নি। আমি তো আর কাউকে এমনভাবে ঠাকুরপো ডাকবার অধিকার পাব না।'

পরের দিন নির্মলদা আর কাজে বেরোলেন না, আমিও আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বাতিল করে দিলাম। লাঞ্চের পর তিনজনে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে মার্কেটিং করে কাটালাম সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা। রাত্রে পিকাডেলির ধারে একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার খেয়ে হাইড পার্ক কর্ণারে খানিকটা আড্ডা দিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম।

রাত্রে ফিরে এসে নির্মলদা দেখলেন বিকেলের ডাকে একটা প্লেন কোম্পানির লণ্ডন-মন্ট্রিলের উদ্বোধনী যাত্রায় অতিথি হবার আমন্ত্রণ এসেছে। নির্মলদা বলেন, 'বাচ্চু, তুই কটা দিন থেকে যা, আমি ঘুরে এলে দিল্লী যাস।'

পরের দিন আমি আমার এডিটরকে একটা টেলিগ্রাম করে জানালাম, লণ্ডন ডিপারচার ডিলেড স্টপ রিচিং ডেলহি নেক্সট উইক।

তিনদিন পর রাত দশটার সময় আমি আর নির্মলাবৌদি নির্মলদাকে লণ্ডন এয়ারপোর্টে বিদায় জানিয়ে এলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। দুজনেই বেশ ক্লান্ত ছিলাম। টেলিভিশনের সামনে বসে গল্প না করে দুজনেই শুয়ে পড়লাম। লেট নাইট নিউজটাও শুনলাম না।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে খবরের কাগজটা খুলে ধরার সঙ্গে বৌদির একটা বিকট চীৎকার করে চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। আমি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলাম। বৌদির মাথা কোলে তুলে নিয়ে দেখি জ্ঞান নেই। তাড়াতাড়ি ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল এনে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে খবরের কাগজের ওপর নজর পড়তেই দেখলাম, যে প্লেনে নির্মলদা রওনা হয়েছিলেন, সে প্লেন লণ্ডন থেকে টেকঅফ্ করার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে অতলান্তিকের গভীর গর্তে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্লেনের কয়েকটা টুকরো পাওয়া গেছে, কিন্তু যাত্রীদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

অনেক ঔষধ-পত্র ডাক্তার নার্স করার পরও বৌদি ষোল ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য জ্ঞান হবার পর এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেননি বৌদি। শোকে-দুঃখে বৌদি পাথর হয়ে গিয়ে ছিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি একবিন্দু জল পর্যন্ত স্পর্শ করলেন না। সপ্তাহখানেক পর বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো, তোমার বুকিংটা এবার করে নাও। আর কতদিন তোমাকে আটকাবো।'

আমি আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু বৌদি কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, 'না ভাই তুমি আর আমার সংস্পর্শে থেকো না। হয়তো আমার সংস্পর্শে থেকে তোমারও কোন সর্ব্বনাশ হবে।'

দু'দিন পর আমি দিল্লী রওনা হলাম। অনেক আপত্তি করা সত্ত্বেও বৌদি এয়ারপোর্টে এসে আমাকে বিদায় জানিয়ে গেলেন। প্রণাম করে বৌদির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বৌদি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার দাদার স্মৃতি নিয়ে এই লণ্ডনেই থাকব। আর কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না। তুমি তাই আমাকে ভুলো না। মনে রেখো এই ঝড়ের রাতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। যন্ত্রচালিতের মত প্লেনে উঠে পড়লাম বোয়িং ৭০৭ এর তীব্র গর্জন আমার কানে এল না, বার বার শুধু মনে পড়ল বিকা চীৎকার করে ব্রেকফাস্ট দিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

পালামের মাটিতে পা দিয়েই বৌদিকে আমার পৌছানো সংবাদ দিলাম। ক'দিন পর বৌদির একটা উত্তর পেলাম।

'ভাই ঠাকুরপো,

তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে দেবার পর জীবনের সব চাইতে প্রথম অনুভব করলাম, আমি নিঃসঙ্গ, আমি একা, আমি বন্ধুহীন, প্রিয়হীন। অনুভব করলাম আমার অন্তরের শূন্যতা। আজ মনে হচ্ছে স্বার্থপরের মত তোমাকে ধরে রাখলেই ভাল হত, মনে হয়, তোমার নির্মলদার জন্য যদি আর একজনকে চোখের জল সঙ্গী পেতাম, তবে মনে শান্তি পেতাম।

আজ বেশ বুঝতে পারছি কে যেন অলক্ষ্যে বসে আমার জীবনটাকে নিয়ে খুশীমত খেলা করছে। বেশ বুঝতে পারছি তারই ইচ্ছা আমার মনের রং বদলায়। কখনো মেঘে মেঘে ছেয়ে যায়, কখনো সোনালী রোদে ঝলমল করে ওঠে। আবার কখনো গোধূলির বিষন্ন রাঙা আলোয় ভরে যায়। আমি আর কিছুই ঠেকাবার চেষ্টা করি না কিছুরই বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। আমার জন্য তুমি একটুও চিন্তা করো না জীবন দেবতা যখন যেদিকে নিয়ে যাবেন, আমি নিঃশব্দে সেদিকেই যাব। তবে আমার সংস্পর্শে দুটি নিরপরাধ মানুষের সর্ব্বনাশ হওয়ায়, আজ তোমার জন্য বড ভয় হয়।

বাচ্চু, একদিন তারকার দীপ্তি আমারও ছিল, কিন্তু তবুও বিশাল আকাশের কোণে কেন ঠাঁই হলো না বলতে পার? বলতে পার কেন কক্ষচ্যুত তারকার মত উল্কার জ্বালা বুকে নিয়ে ছুটে বেড়ালুম পৃথিবীময়? বলতে পার কোন প্রায়শ্চিত্ত করলে এ জন্মে না হোক, অন্ততঃ আগামী জন্মে তোমার নির্মলদাকে পেতে পারি? ভালবাসা নিও।

তোমার অভাগা বৌদি'।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১৯১১ সালে কোলকাতায় প্রখ্যাত কথাকার, সুপরিচিত ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। দাদাভাই, বাণভট্ট প্রভৃতি ছদ্মনামেও অনেক লিখেছেন নীহাররঞ্জন। রহস্যধর্মী রচনায় তিনি যেমন জনপ্রিয়, নাট্যকার হিসেবেও সিদ্ধহস্ত।

নিজের প্রথম গল্প প্রসঙ্গে / নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বোধ করি ১৯৩৪/৩৫ সালে—এই 'অশরীরী' গল্পটি লিখেছিলাম। পরে সেটি শারদীয়া দেশে প্রকাশিত হয়। গল্পটির মধ্যে একটা রহস্য ও রোমাঞ্চকর স্বাদ আছে যেন—পরবর্তী কালে যে রহস্য আসল কাহিনীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিবাহের পর এ বাড়ীতে আসিয়া মাধবী দেখিল, ঘটক ঠাকুর তাঁহার পিতার কাছে তাহার ভাবী শ্বশুর গৃহের যে বিবৃতি দিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যাও নহে।

আজিকার এই বিশাল ভগ্নস্তূপের মাঝে অতীত ঐশ্বর্যের শেষটা একেবারে সবটুকুই নিঃশেষে চাপা পড়িলেও তাহার সেই ভগ্নাবশেষের তল হইতে যেন আজিও কোন এক বিরাট কিছুরই চাপা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বড় বড় খিলান, ভগ্নশিল্পকলা, শ্বেত মর্মরের সোপান শ্রেণী এবং তাহাদের গায়ে গায়ে অদ্ভুত শিল্পকারুতা, প্রশস্ত চত্বর, নাটমন্দির, থরে থরে কাচের সঙ্গে দোলায়মান ভাঙ্গা ঝাড়—সব কিছুই আজ যেন তাহাদের সেই অতীত গৌরবের বেদনাবহ বুঝি বা ভাঙ্গিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে।

দেওয়ালের গায়ে গায়ে বট অশ্বত্থ তাহাদের শাখা প্রশাখা দিকে দিকে বিলুপ্তভাবে ছড়াইয়া দিয়াছে।

বড় বড় ঘরগুলি সব অন্ধকার, ভিতরে পা দিতেও ভয় করে। দোতলার বড় বড় কপাট খসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপের চারিপার্শ্বে যেন কি এক মৌন অশরীরী ভয়াবহ আশঙ্কা দিবারাত্র ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া ফিরে প্রতি পদ বিক্ষেপে চরণ বাঁধিয়া যায়। আশঙ্কায় সারা দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

দিনের আলো এখনও ভাল করিয়া বেলা-শেষের আকাশ হইতে মুছিয়া যায় নাই।

প্রশস্ত, সু-উচ্চ খিলানের গায়ে গায়ে ম্লান বিদায়মান সূর্য-রশ্মি বিদায় চুম্বন আঁকিয়া দিতেছিল।

আলিসার আড়ালে থাকিয়া এক ঝাঁক বুনো কবুতর গম্ভীর স্বরে কূজন করিতেছিল।

বাহকেরা পাল্কী বহিয়া আনিয়া প্রশস্ত পাষাণ চত্বরের উপর নামাইয়া রাখিল।

সুরজিৎ পাল্কীর কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাড়াইল। বৃদ্ধ রণলাল চত্বরের এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ধীরে ধীরে পাল্কীর কাছে আগাইয়া আসিলেন। কহিলেন, 'ওরে দরজাটা খুলে দে, বৌমা নেমে আসুন—'

পাশ হইতেই একজন আগাইয়া আসিয়া পাল্কীর দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বিনম্র, কুণ্ঠানত চরণ-বিক্ষেপে মাধবী পাল্কীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

—'এস মা এস, আমার ঘরের লক্ষ্মী—'

বেলা শেষের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া বিরাট এক শঙ্খের আওয়াজ জাগিয়া উঠিল এবং সেই আওয়াজ খিলানে খিলানে, দেওয়ালে দেওয়ালে ঘা খাইয়া…সেই শঙ্খের মাঙ্গলিক ধ্বনি যেন সহসা কি এক ভয়াবহ দীর্ণতায় রূপান্বিত হইয়া গেল। মাধবীর সমগ্র শরীর সহসা না জানি কেন কাঁপিয়া উঠিল।

'এই আমার দাদু মাধবী, ঘোমটা তোল, এর কাছে কিছু লজ্জার নেই!—'

লোকজন প্রায় তখন সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, একজন ভৃত্য ব্যতীত।

'ওরে, ঘোমটা খোল দিদি!…আমি যে তোর দাদুরে।…' বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

দিবসের ম্লান আলোকে মাধবী চাহিয়া দেখিল, এক বৃদ্ধ ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে।

এই উঁচু, লম্বা দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, পেশল আজানুলম্বিত লোলচর্ম্মাবৃত বাহু। গলায় শাদা ধবধবে একগাছি উপবীত, দুধের মত শাদা কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরী চুল, দু'পাশের স্কন্ধের উপর আসিয়া লুটিয়া পড়িয়াছে। সৌম্য মুখখানি ভরিয়া শিশুর ন্যায় এক টুকরো সরল হাসি।

গভীর রাত্রে স্বামীর বক্ষলীন হইয়াও মাধবীর কেন না জানি সারা দেহ ছম ছম করিতে লাগিল।

এতবড় বাড়ীতে মাত্র চারিজন লোক।

বৃদ্ধ রণল্লাল, সুরজিৎ, মাধবী ও ভৃত্য শম্বুক।

…গল্প করিতে করিতে সুরজিৎ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু মাধবীর চোখের কোলে যেন কিছুতেই ঘুম আসে না। নিশীথের অন্ধকারে যেন কাহাদের নিঃশব্দ চলা-ফেরার ক্ষীণ অস্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া যায়।

চাপা কথায় টুকরা টুকরা ভাসা ভাসা আওয়াজ।

কোথায় যেন চুড়ীর আওয়াজ পাওয়া যায়।—

ঘরের পাশ দিয়া যেন কে এইমাত্র হাঁটিয়া গেল।

মাধবী সারাটা রাতই একপ্রকার জাগিয়া জাগিয়া কাটাইয়া গেল।

মাধবীর বাবা পশ্চিমে রেলওয়েতে সামান্য ১৭০ টাকা মাইনার এক চাকুরে।

পত্নী সারদাসুন্দরী একাদিক্রমে পাঁচ পাঁচটা কন্যার জন্মদান করিয়া একদিন চক্ষু মুদিল।

পত্নী-বিয়োগের পর অনেকেই তাঁকে পুনরায় দার পরিগ্রহণের হিতোপদেশ দিলেও মৃত-পত্নী তাঁহাকে যে হিতোপদেশ দিয়া গিয়াছিল—তাহাই স্মরণ করিয়া তিনি আর

-পথে পা বাড়াইলেন না। জানি না তাঁহার এই কাজটা বুদ্ধিমানের মত হইয়াছিল কি-না! তবে লোকে তাঁহাকে এ বিষয়ে—যে যাহাই বলুক না কেন, মনে মনে তিনি নিজের কাছে খুবই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

মাধবী যখন পনেরর কোঠা ছাড়াইয়া ষোলয় পা দিল, অথচ পাত্র তাহার আজিও জুটিল না, পিতা তখন সত্যই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় সিধু ঘটক সুদূর বাঙ্গলা মুলুকের এক বহু পুরাতন জমিদার বাটী হইতে এই সম্বন্ধে লইয়া আসিল। সুরজিৎ কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকিয়া বি. এ. পড়িতেছিল। দুইদিনের ছুটী লইয়া তিনি সুরজিৎকে গিয়া দেখিয়া আসিলেন এবং সেই সঙ্গে পছন্দও করিয়া আসিলেন। তারপর ফাল্গুনের এক অপরাহ্নে চার হাত এক হইয়া গেল। কি একটা জরুরী কাজে আটকা পড়ায় বৃদ্ধ রণলাল বিবাহের সময় আসিতে পারিলেন না।

তারপর বিবাহের চারমাস বাদে গ্রীষ্মাবকাশে মাধবী স্বামীর সহিত শ্বশুরের ভিটায় আসিয়া পা দিল।

॥ দুই ॥

পরের দিন প্রাতে রণলাল মাধবীকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই বিশাল অট্টালিকার রপাশ দেখাইয়া আনিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে মাধবীর পা ব্যথা হইয়া গেল।

এ যেন অতীতের জনশূন্য ভগ্নাবশেষ বিশাল এক প্রেতপুরী!

প্রকাণ্ড এবং প্রশস্ত আঙিনা দেখাইয়া রণলাল কহিলেন, 'আজও আমার মনে আছে দিদি, সেই আমার বিয়ের সময় এই আঙিনায় প্রায় ৮০ জন মেছুনী বসে মাছ কুটছিল, স দৃশ্য আজও আমি ভুলতে পারিনি,...আজও অনেক রাত্রে চাঁদের আলোয় মনে হয়, যেন তারা সামিয়ানার তলে বসে মাছ কুটছে। শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন ভারি হইয়া আসিল।'

...'সেই মাছ-কোটা বড বড় বঁটীগুলো আজও পশ্চিমের কোঠায় কাঠের সিন্ধুকে তালা আছে—'

...'এই যে উঠানটা...এখানে প্রতিদিন বিকালে বাবার সুশিক্ষিত একশতজন লাঠিয়াল তাদের লাঠির কসরৎ দেখিয়ে যেত...এইখানে প্রতি বৎসর দোলের সময় ও দুর্গোৎসবে যাত্রা-গান হ'ত।'

...মাত্র চারজন লোকের রান্না—মাধবী বলিয়াছিল সে নিজেই করিবে, কিন্তু রণলাল তাহা শুনেন নাই, একজন বামুন জোগাড় করিয়া আনা হইয়াছিল।

রাত্রি তখন বেশী হয় নাই, মাধবী নূতন ঠাকুরকে রান্না দেখাইতে দিতেছিল, হঠাৎ কি একটা কাজে তাহাকে শোবার ঘরে যাইতে হইল। শুইবার ঘরে যাইতে হইলে একটা

প্রকাণ্ড দালান পার হইয়া তবে যাইতে হয়।

দালান দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ সম্মুখের আঙিনার দিকে নজর পড়ায় তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল,...মনে হইল যেন, অন্ধকারে রণলাল চাপা স্বরে কাহাদের সহিত কথা কহিতেছেন, তাঁহার ঠিক সম্মুখেই চার পাঁচটা ছায়ামূর্ত্তি।

ইয়া বিশাল তাহাদের দেহ!—হাতে প্রত্যেকের প্রকাণ্ড এক একটি বাঁশের লাঠি! অন্ধকারেও তাহাদের রক্তবর্ণ চক্ষু শিকারী বেড়ালের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

অন্ধকারে উঠানের ঠিক উপর দিয়া শূন্যে একটা বাদুড় ডানা ঝটপট করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া মাধবী ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বালাইয়া সুরজিৎ কি একটা বই পড়িতেছিল।

মাধবী হুড়মুড় করিয়া আসিয়া সুরজিতের ঘাড়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল; এবং বিষম হাঁপাইতে লাগিল।

চকিতে উঠিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাধবীকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে সুরজিৎ শুধাইল, 'কি, কি হ'ল মাধু।'

মাধবী ততক্ষণে স্বামীকে দু'হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, এবং সর্ব্বশরীর তাহার তখনও কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, গভীর স্নেহে মাধবীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুরজিৎ কহিল, 'কেন এমন হঠাৎ ভয় পেলে মাধবী?'

'আমার এখানে বড্ড ভয় করে।' কান্নায় মাধবীর স্বর বন্ধ হইয়া আসিল।

'কেন ভয় কি!'

ভয় যে কি? তাহা সে বলিতে পারিল না, শুধু স্বামীর বক্ষে মুখ গুঁজিয়া চোখ বুজিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল।

এমন সময় বাহিরের দালানে রণলালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দিদিমণি, ভাত হ'ল?'

'ওই যে দাদু ডাকছেন, যাও!'

এবারে মাধবী যেন আরও জোরে স্বামীকে আঁকড়াইয়া ধরিল। বাহিরে কোথায় যেন অন্ধকারে একটা প্যাঁচা বিশ্রী স্বরে ডাকিয়া উঠিল।

সারাটা দিন বেশ কাটে।

কিন্তু রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কোথা হইতে একটা অজানিত অহেতুক ভয় মাধবীকে চারি পাশ হইতে চাপিয়া ধরিতে চায়।

সব চাইতে ওর বেশী ভয় করে ওই বৃদ্ধ রণলালকে!

দিনের আলোয় যাঁহাকে এত সৌম্য এত প্রশান্ত প্রাণখোলা এক শিশুর মতই ম হয়, রাত্রির অন্ধকারে তাঁহাকে এত ভয় করে কেন?

তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেও বুকের মাঝে শির শির করিয়া উঠে কেন?

ভাবিতে গেলে মাধবীর নিজেরই ভারি লজ্জা পায়।

সে ভাবিয়াই পায় না তাহার এ কল্পিত ভয়ের উৎস কোথায়। কিন্তু তথাপি তাহার ভয় হয়।

দ্বিপ্রহরে খাইতে বসিয়া রণলাল গল্প করিতে ছিলেন তাহাদেরই সেই অতীত গৌরবের ছোটখাট সব ঘটনা।

মাধবীরও সে সব শুনিতে ভারি ভাল লাগে।

কতদিন আগেকারই বা কথা।

মাত্র পঞ্চাশ বৎসর আগেও—এই বাটীর রন্ধে রন্ধে ঐশ্বর্য্যের সমারোহের হয়ত অন্তও ছিল না।

রণলাল ভাত মাখিতে মাখিতে কহিতে ছিলেন, 'বুঝলি দিদি, আমি নিজে পৈতের সময় ভিখিরিকে স্বর্ণ মুষ্টি ভিক্ষে দিয়েছি…'

'আমারই পিতামহ একশ আটটা নরবলি দিয়ে মা কালীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে সব আজ গল্প হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমি ত জানি, সে গল্পের কথা কতখানি খাঁটি সত্য।'

…'আজ তোর ঘরে কেরোসিনের সেজবাতি জ্বলে। একদিন এ বাড়িতে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলত।'

প্রশস্ত চত্বরে খড়মের খট খট শব্দ করিতে করিতে রণলাল বহিবাটিতে চলিয়া গেলেন।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে আঙিনার একধারে একটা কুকুর পেটের তলে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া ছিল।

খড়মের শব্দে একবার মুখ তুলিয়া তাকাইল।

ওই দূরে নীল আকাশের গায়ে একটা চিল পাক খাইয়া ফিরিতেছিল।

'সেদিনও সবে তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যা-দীপটা দিয়া মাধবী দরদালানের উপর আসিয়া উঠিয়াছে। সহসা ঐ দিক্‌কার রোয়াকের উপর তাহার নজর পড়িল।

রোয়াকের উপর রণলাল দাঁড়াইয়া, হাতে তাঁর একখানি প্রকাণ্ড খড়্গ। খড়্গের গা বাহিয়া রক্ত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। রোয়াকের ঠিক নীচের উঠানে একটা মুণ্ডহীন মৃতদেহ রক্তে লুটাপুটি যাইতেছে।…রণলালের পায়ের ঠিক তলায়ই একটা ছিন্নমুণ্ড… সহসা দুদিন আগেকার রণলালের একটা কথা মাধবীর চকিতে মনে পড়িয়া গেল।

'বুঝলি দিদি, এই হাতেই কত বেটার কাঁচা মাথা খড়্গের এক ঘায়ে দেহ হতে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছি।'

'উঃ মাগো!'…একটা দীর্ঘ চীৎকার করিয়া মাধবী রান্না ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

বামুনঠাকুর ভাতের হাড় কাৎ করিয়া মাড় গালিতেছিল, মাধবীকে হাঁসফাঁস করিয়া এই ভাবে ঘরের মধ্যে ছুটিয়া প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঘাড় ফিরাইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে শুধাইল,

'কি মা ?—'

ছুটিয়া আসিয়া মাধবী তখনও হাঁপাইতেছিল…সে কোন জবাব দিল না।…মাধবীর সমগ্র কপাল দিয়া তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে।

এমন সময় বাহিরে রঙ্গলালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'দিদিমণি।—'

মাধবী অল্প একটু আগাইয়া দুয়ারের কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

'দিদি!'—বৃদ্ধ আবার ডাকিলেন।

ঠাকুর কহিল, 'মা, বুড়ো বাবু আপনাকে ডাকছেন!—'

বৃদ্ধ ততক্ষণে একেবারে কপাটের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কহিলেন—'অমন ছুটে এলে কেন মা?…ভয় পেয়েছ বুঝি?…'

মাধবী জবাব দিবে কি…?

মাথার মধ্যে তখনও তাহার ঝিম ঝিম করিতেছে।

রঙ্গলাল কহিলেন, 'এ বাড়ীতে ভয়ের কিছু নেই মা? এ বাড়ীর পূর্বপুরুষেরা তো তোমার পর ছিলেন না, তাদের যে তুমি বড় স্নেহের সামগ্রী।…আজ যদি তাঁরা থাকতেন—' শেষের দিকে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন ভাঙ্গিয়া আসিল।

সে রাত্রে শুইতে আসিয়া মাধবী একসময় সুরজিৎকে কহিল, 'এ বাড়ীতে আমার বড্ড ভয় করে—'

'সে কি!'

'হাঁ, আমার বড্ড ভয় করে, মনে হয়—'

মাধবীর কথায় সুরজিৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, 'কি মনে হয়?—'

'যাও, তুমি হাসছ, তবে বলব না।' মাধবী কহিল।

'তোমার বুঝি খুব বেশী ভূতের ভয় মাধু?' সুরজিৎ শুধাইল।

'না, ভূতের ভয় তেমন আমার নেই;—'

'ভূতের ভয় নেই, তবে কিসের ভয়?—'

'বাঃ, ভূত ছাড়া কি আর কিছুর ভয় থাকতে পারে না?—'

'তবে কিসের ভয়, মানুষের…'

মাধবী স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বক্ষে মুখ গুঁজিয়া কহিল, 'যাও, তোমার সবতাতেই খালি ঠাট্টা।—'

॥ তিন ॥

কিন্তু দিন যত যাইতে লাগিল, মাধবীর ভয়ও যেন ক্রমেই তত বাড়িতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটিবারের জন্যও সে চোখের পাতা দুটি এক করিতে পারিত না।

অনেকদিন পরে সেদিন বহু কষ্টে মাধবী একটু ঘুমাইয়াছিল, সহসা কাহার ব্যাকুল মর্ম্মভেদী এক করুণ কান্নার শব্দে তাহাব ঘুম টুটিয়া গেল।

সে তাডাতাডি দুই হাতে ঠেলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া তুলিল, 'ওগো শুনেছ!...ওঠ! ওঠ!...ওগো!...'

এত রাত্রে এমন করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া তোলায় সুরজিৎ রীতিমত বিরক্ত হইয়া কহিল, 'ভাল আপদ, রাত্রে একটু ঘুমুতেও কি দেবে না নাকি?...'

মাধবী ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, 'কিন্তু পাশের ঘরে কে যেন কাঁদছে, শোন।'

'কাঁদছে? কই, কে?..' উভয়েই কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তখন আর কোন কান্নার শব্দই পাওয়া গেল না।

বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে সুরজিৎ কহিল, 'তোমার যত বাতিক। কই কে কাঁদছে?...'

কান্নার শব্দ আর না শুনিতে পাওয়ায় স্বামীকে এরূপভাবে জাগাইয়া তুলিয়া সে নিজেই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ম্রিয়মান কণ্ঠে ধীরে ধীরে মুখখানি নীচু করিয়া কহিল, 'বোধহয় স্বপ্ন দেখেছি।—'

'আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হ'ক, নিজে ত ঘুমাবেই না, পরকেও ঘুমাতে দেবে না—'

সুরজিৎ আবার শুইয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ বাদেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু মাধবী ঘুমাইতে পারিল না।

তাহার দুই কান ভরিয়া তখনও যেন সেই অশরীরী কান্নার ধ্বনি বাজিতেছিল...

বাকী রাতটুকু তাহার একভাবে বসিয়া বসিয়াই কাটিয়া গেল।

ভোরের সোনালী আলো এক সময় বাহিরের অন্ধকারকে তরল ও স্বচ্ছ করিয়া জাগিয়া উঠিল।

ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়া মাধবী ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিয়া, শয়ন ঘরের কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দর-দালানে রণলালের সহিত দেখা হইয়া গেল।

স্মিতমুখে তিনি কহিলেন, 'কিগো দিদি, এত ভোরে।'

হঠাৎ মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, 'মুখখানি এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন দিদি, রাতে কি ভাল ঘুম হয়নি ভাই?—'

একটা প্রশ্ন মাধবীর গলার কাছে আসিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল,·· সে জোর করিয়া মুখে একটুকরো হাসি টানিয়া আনিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, 'হয়েছিল।—'

এমন করিয়া বুঝি দিন আর চলে না। মাধবী ক্রমে যেন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ঝিমাইয়া আসিতেছিল। কি এক ক্লিষ্ট অবসাদ যেন তাহার অন্তরের তলদেশ হইতে এক বিষাক্ত কীটের ন্যায় তাহাকে নিরন্তর কুরাইয়া কুরাইয়া দিনের পর দিন আরও মৌন এবং আরও রুগ্ন করিয়া ফেলিতেছিল।

এ বাড়ীতে রাত্রি যেন ক্রমে তাহার কাছে এক দারুণ বিভীষিকার মতই মনে হইতে লাগিল।

সে রাত্রে সুরজিৎ মাধবীর একখানি হাত নিজের হাতের মাঝে টানিয়া লইয়া কহিল, 'ছুটি ত আমার ফুরিয়ে এল মাধু।···এবার ত তোমায় একাই এখানে থাকতে হবে।'

ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে স্বামীর বুকের কাছে আরও একটু ঘন হইয়া আসিয়া মাধবী কহিল, 'যাওয়ার সময় কিন্তু আমায় বাবার কাছে রেখে যেতে হবে।'

'সে কি করে হবে মাধবী। এই তো সেদিন এলে, এখন ত যাওয়া হতে পারে না। আর দাদুই বা যেতে দেবেন কেন? ঘরের বৌ!'

'না না, আমি একা একা এ বাড়ীতে কিছুতেই থাকতে পারব না, মরে গেলেও না।' কি এক গম্ভীর উত্তেজনায় যেন তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

'পাগল! একা কেন হবে? দাদুই ত থাকবেন!'

'না না, সে আমি পারব না।···আমায় এখানে একলা ফেলে যেও না, আমি তাহলে একটা দিনও বাঁচব না।'

মাধবী ব্যাকুলভাবে স্বামীর দুই হাত আঁকড়াইয়া ধরিল তাহার সর্ব্বশরীর উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে মাধবী।···আর আজই ত যাচ্ছি না।···ঘুমোও, রাত অনেক হ'ল।'

সুরজিৎ পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া শুইল।

···ঘুমাইয়া মাধবী স্বপ্ন দেখিল, এ বাড়ীতে সে যেন একা···রণলাল, হাতে একখানা রক্তাক্ত খড়্গ লইয়া যেন তাহার পিছু পিছু তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে।···

ওই! ওই বুঝি খড়্গ তাহার মাথার উপর নামিয়া আসিল···

'ওগো কে আছ রক্ষা কর!· মেরে ফেললে!

…'মাধবী !… মাধবী !'…স্বামীর ডাকে মাধবীর ঘুম টুটিয়া গেল, সে চোখ মেলিয়া দেখিল, তাহার মুখের দিকে ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি তুলিয়া সুরজিৎ তাকাইয়া আছে…ঘামে তাহার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গিয়াছে—'ওকি, চীৎকার করছিলে কেন ?…স্বপ্ন দেখেছ বুঝি ?…'

মাধবী কোন উত্তর দিল না। শুধু ক্লান্তিভাবে পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া শুইল।

'কোন ভয় নেই, তুমি ঘুমও, আমি জেগে রইলাম।'

মাধবীর চোখ দুটি আপনা হইতেই মুদিয়া আসিল।

সুরজিতের যাওয়ার দিন যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল, মাধবীও যেন দেহ মনে ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

…সেই রাত হইতে তাহার যে কি হইয়াছে, আগে যদিও বা দুই এক রাত্রে তাহার ঘুম হইত—এখন আর তাও হয় না। যদি বা চোখ বোজে অমনি যেন তাহার দুই বোজা চোখের পাতায় সব ভয়াবহ অশরীরী মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। যেন সবলে তাহাকে তাঁহারা চাপিয়া ধরে।…

এক জোড়া রক্তচক্ষু, মস্ত বড একটা বাবরী-চুলো মাথা, প্রকাণ্ড একখানা রক্তমাখা খড়্গ হাতে যেন তাহাকে তাডা করিয়া ফিরে।

সে সভয়ে চক্ষু মেলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসে।

ঘুমে দুই চক্ষু জডাইয়া আসিলেও সে জোর করিয়া ঘুমকে চোখের কোল হইতে তাডাইয়া দেয়।

এমনি করিয়াই শয্যায় বসিয়া বসিয়া তাহার রাত্রি এক সময় কাটিয়া যায়।

রাতের আকাশ ভোরের আলোয় তরল ও ফিকা হইয়া আসে।

রাতের পর রাত এইভাবে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে এক রাত্রে মাধবী শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাহার সারা দেহ ব্যাপিয়া গভীর ঘুমের ঢুল নামিয়া আসে।

শরীর শিথিল হইয়া শয্যাব উপব এলাইয়া পডে।

মাধবী ঘুমাইয়া পড়ে !…

…সমগ্র বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন অসংখ্য অশরীরী কি এক ব্যাকুল বেদনায় কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

তাহাদের করুণ কান্নার বিলাপ ধ্বনি বাটির খিলানে খিলানে, দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া খাইয়া হাহাকার করিয়া ফেরে।

…মাধবীদের শোয়ার ঘরের বন্ধ কপাটের দরজাটা যেন হঠাৎ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠে—ধীরে ধীরে ফাঁক হইয়া যায়।

'…ওকে, ওকে !…ওযে রণলাল।…'

হাতে তার সেই রক্তাক্ত খড়্গ !···

ধীরে ধীরে সে যে এদিকেই আগাইয়া আসিতেছে !

খড়্গের গা বাহিয়া তাজা লাল রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।···

ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে সে মাধবীর শয্যার দিকে আগাইয়া আসিতেছে, ক্র কাছে, আরও কাছে, একেবারে শয্যায় পাশটিতে। রণলাল এক হাতে মাধবীর চাপিয়া ধরিল, অন্য হাতে সেই খড়্গ তুলিয়া ধরিল।

ধীরে ধীরে খড়্গ নামিয়া আসিতেছে···নিকটে, আরও নিকটে নামিয়া আসিতেছে

খড়্গ নামিয়া আসিতেছে !···

আর বুঝি তাহার রক্ষা নাই !···

মাধবী ঘুমের মধ্যেই সেইদিকে তাকাইয়া আছে—খড়্গটা তাহার গলদেশ করিল বুঝি সে একা, বড় একা—সুরজিৎ নাই—

কে কাহাকে রক্ষা করিবে, কে !

———